# গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বেস্টবুক্‌স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯

## সূচিপত্র

# গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব

## ॥ ১ ॥
## তত্ত্বের নির্মাণ ভূমি

### প্রস্তাবনা

পন্ডিতরা অনুমান করেন কয়েকটি ধর্মবিশ্বাস শিকড়রূপে একযোগে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম মহীরুহের বৃহৎ কান্ড রচনা করেছে, পুষ্ট করেছে। বেদের বিষ্ণু, মহাভারতের শান্তি পর্বের নারায়ণীয় অধ্যায়ের নরায়ণ বা হরি, এবং সাত্বত ও পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বাসুদেব কৃষ্ণ, এই সকল দেবতা ক্রমে সর্বকর্তৃত্বময় এক দেবতার বিভিন্ন নামরূপে পরিগণিত হ'য়ে ভাগবত ধর্মের উপাসিত দেবতায় পরিণত হ'লেন; উপাসনা বিধি নেওয়া হ'ল প্রধানতঃ পঞ্চরাত্র সংহিতাগুলি থেকে। আর একটি কান্ড এর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে বর্তমানের সমন্বিত বৈষ্ণবধর্মের যমলার্জুন বৃক্ষ রচনা করেছে সেটি গোপকৃষ্ণের আরাধনা, এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণ। একই রসে পুষ্ট হয়েও যেমন বৃহৎ বৃক্ষে ভিন্ন আকারের শাখাপল্লব থাকে বৈষ্ণবধর্মে তেমনিই বহুমতের উদ্ভব হয়েছে কালক্রমে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এমনই একটি শাখা, উদ্ভবের কাল গণনায় অন্য কয়েকটি শাখার তুলনায় অর্বাচীন। বৈষ্ণবধর্মের দীর্ঘ ইতিহাসের এটি একটি মনোরম অধ্যায়, ভক্তি-প্লাবিত উপত্যকার একটি কুসুমিত অংশ। এর প্রবর্তক একজন অসাধারণ মানুষ যিনি রাধাভাবের ভিত্তিতে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি প্রচার ক'রে বৈষ্ণবধর্মে নূতনত্বের আস্বাদ আনলেন; নিঃসংশয় একাগ্রতায় ভগবদন্বেষণে জীবন অতিবাহনের অতিমানবিক আগ্রহের কারণে ইনি জীবৎকালেই দেবপদবাচ্য হয়েছিলেন। সেকারণে এই ধর্মে

কৃষ্ণলীলার সমানুপাতে চৈতন্যলীলা ধ্যেয়, কৃষ্ণতত্ত্বের সমান্তরালে চৈতন্যতত্ত্ব জ্ঞেয়।

কিছু আদর্শবাদী মানুষ পারিপার্শ্বিক সমাজচরিত্রে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে, অথবা দুঃখমুক্তির কামনায় অথবা নূতন উপলব্ধির উল্লাসে কোনও উদ্বোধিত জনের নেতৃত্বে কিংবা কোনও ক্ষীণশ্রুত কাহিনী কিম্বদন্তী অবলম্বন করে' যখন একত্র হ'য়ে একটা মনোমত লক্ষ্য ও সাধ্যমত উপায় দেখতে পায় তখন জন-উন্মাদনার স্ফুরণে সৃষ্ট হয় নূতন ধর্ম বা সম্প্রদায়। সত্য এবং অলৌকিকতার মিশ্রণে উদ্ভূত স্থির বিশ্বাস এমন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক-মনের মূল সম্পদ্, যে বিশ্বাস হৃদয়ের প্রয়োজনে স্ব-নির্ভর, যুক্তির ধার সে ধারে না। এই বিশ্বাস-জনিত সমগ্র কল্পনাকে তারা আধ্যাত্মিক ও লোকোত্তর বিষয় বলে মনে করে এবং গোষ্ঠীমধ্যে সমান অংশে ভাগ করে' ভোগ করে, সম্পূর্ণ আবেগজাত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানবমিলনের সৌধ তখন সহজেই নির্মিত হয়। এই অবস্থায় হৃদয়বৃত্তিই সর্বপ্রধান, যে মতবাদ বা ঘটনাবলী বা চারিত্র্যের উপর নির্ভর করে' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, তাদের অস্তিত্বই তখন মনের যথেষ্ট পূরক, অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের আবশ্যক তখন হয় না। সমস্ত শক্তি যখন অপূর্ব বস্তু লাভ করার উৎসাহে ব্যয়িত তখন তার প্রকৃতি প্রকরণ বিচার করে' দেখবার শক্তি অবশিষ্ট থাকে না।

এই প্রাথমিক বিশ্বাসের ফলে গড়ে ওঠে সাধন ভজন পদ্ধতি, ধর্মমাহাত্ম্য, প্রবর্তক ও অনুবর্তকদের চরিতকথা এবং রচিত হয় নানাবিধ লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী, ভক্তি-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-সহযোগে শ্রুত ও কীর্তিত হ'য়ে যা গাঢ় অনুরাগের প্রবল আবেগে যুক্তি-অযুক্তি, সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যের নির্ধারন সীমা মানে না, আবেগের প্রবলতায় বয়ে যায় সব বাধা অতিক্রম ক'রে।

ধর্মের এই আদিম অবস্থায় বা প্রথম পর্বে সৃষ্ট হয় myth বা পুরাকাহিনী—সরল বিশ্বাসপ্রবণ মনে ভাব ও রূপের রেখাঙ্কণ। এতদিন একে আমল দেওয়া হ'ত শুধু আমোদের খোরাক বলে, এখন মনোবিকাশের আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিকের এটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মানুষের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা কোন্ কাঁচা গ্রাম্যপথ অতিক্রম ক'রে সভ্যতার রাজপথে এসে পৌঁছেছে myth-এর জগৎ তারই সন্ধান দেয়।

কিন্তু সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের ফলে গোষ্ঠী বৃহত্তর হ'লে তার অন্তর্গত কিছু লোকের মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগে, ভিন্নবিশ্বাসীর সঙ্গে বিরোধ বাধে, নিজ মতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে এবং লোকমতকে স্বপক্ষে আনতে তখন যুক্তির অবতারণা করতে হয়, যে বিশ্বাস অন্ধ ছিল তার চোখ ফোটাবার দরকার হয়। অবশ্য বিরোধের নিষ্পত্তি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবলের সাহায্যে নির্ণীত হয় তা

হ'লে তত্ত্ব বিকাশের কোনও সুযোগ থাকে না, ইসলাম ধর্মের প্রচার তরবারির সাহায্যে ঘটেছিল বলে কোনও দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে নি, যুক্তি প্রতিষ্ঠা করবার কোনও চেষ্টা সেখানে দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে ধর্মের বা মতবাদের প্রসার শান্ত উপায়ে, বাহুবলে নয় মনোবলে সম্পন্ন হয়, সেখানে তর্কের মাধ্যমে যুঝতে হয়, পরমত খন্ডন করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে হয় যুক্তিবলে। ভারতবর্ষে ধর্মের প্রসারণ বা মতবাদের দিগ্বিজয় অস্ত্রের সাহায্যে হয় নি, হয়েছে শাণিত তর্কের বলে, নিয়ম ছিল এই যে তর্কে হেরে গেলে পরাজিতকে জেতার ধর্ম গ্রহণ করতে হ'তো। খৃষ্টধর্মের আদিমরূপের অনেক কিছু অসামঞ্জস্যকে যুক্তিসিদ্ধ সুঠাম রূপ দিতে যাঁরা গ্রীক লজিকের ভিত্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অসাধ্যসাধন করেছেন তাঁদের Schoolmen বলা হয়। দেখা যাচ্ছে ধর্মবিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বে এক শ্রেণীর তত্ত্ববাদ গড়ে ওঠে এবং বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, মনের ব্যাপারকে মস্তিষ্কের কোঠায় তুলে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয় যে এ দুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু যথার্থ বিরোধ আছে বলেই বিস্তর কূটতর্কের প্রয়োজন হয়, যাকে সম্প্রদায়ের লোক মনে করেন যুক্তিভিত্তিক পরমতত্ত্ব, বিরুদ্ধবাদী বলেন গোঁড়ামির অপযুক্তি, অন্ধবিশ্বাসের নিদর্শন।

সরল সাবলীল অনপেক্ষ বিশ্বাস এবং জটিল তর্কভূমিক গ্রহণ-সাপেক্ষ তত্ত্ববাদ আসে একের পরে অন্যটি, আগে হৃদয় গ্রহণ করে নিঃসন্দেহে, পরে সন্দেহকে দূর করে তর্কবলে। ধর্মের যেটি তৃতীয় অঙ্গ তার পৌর্বাপর্য নাই, প্রথম দুটি পর্বকে ব্যেপেই সেটি যুগপৎ আবির্ভূত হ'তে পারে, সেটি শিল্প-সাহিত্য—সঙ্গীত, fine arts। এই পর্বে বিশ্বাস অবিশ্বাসকে অবহেলা বা উল্লঙ্ঘন করে' বিকশিত হয় শিল্প-সাহিত্য যা ধর্মভিত্তিক হ'লেও হয়ে ওঠে ধর্ম-অতিক্রান্ত বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর আস্বাদিতব্য সম্পদ, যা শিল্পের স্বরাট্ মানদন্ড ছাড়া অন্য কোনও ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মানদন্ডে বিচারণীয় নয়। খৃষ্টানদের চার্চ স্থাপত্য বা দান্তের মহাকাব্য, বৌদ্ধদের স্তূপ-চৈত্য-বিহার বা ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা, হিন্দুর ধর্ম-মন্দির, ইসলামের মসজিদের কারুকার্য—ধর্মকে অবলম্বন করে' ললিতকলার অবিনশ্বর কীর্তি। তারা পল্লবিত পরিব্যাপ্ত হয়েছে তর্ক বা স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে, আত্মগত আনন্দের প্রেরণায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মত ধর্মবিশ্বাস এবং mythology-ও কবিশিল্পির প্রেরণার একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং তাকে অবলম্বন করে রূপায়িত হয়েছে মানুষের রসজ্ঞানের সারভাগ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেলায় এই তিনটি অঙ্কের মধ্যে সময়ের অন্তর কি ছিল আজ দূরদর্শনে তা নির্ণয় করা কঠিন, কালান্তর আদৌ ছিল কিনা তাও বলা যায় না। চৈতন্য যে ভগবান সে বিশ্বাস তাঁর

জীবদ্দশাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাব্য নাটক পদাবলী রচনা তাঁর জীবৎকালেই শুরু হয়েছে, চৈতন্য সকল তত্ত্বের উদ্ভাবক চরিতকারের এই প্রণিধান না মানলেও এটা অনস্বীকার্য যে বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রমুখ তত্ত্বদর্শীরা অনেকেই তাঁর সমসাময়িক, তত্ত্বের স্থিরীকরণ তাঁর জীবৎকালেই অনেকখানি এগিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তত্ত্ব ও কাব্যের আরম্ভিক পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তার আবশ্যকও নাই কারণ এ দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব কম। দুটিই অনেক পরিমাণে কৃষ্ণ-সম্পর্কিত কৃষ্ণকথার ঐতিহ্যবাহী, বিষয়ক তত্ত্ব যেমন কালে কালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন মনীষীর ব্যাখায় ভাষ্যে বিধৃত হয়ে পৃথক স্বকীয়তা অর্জন করেছে কৃষ্ণ কাব্যধারাও তেমনিই বহু বাঁক ঘুরে বহু খাতে প্রবাহিত হয়ে বহু রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আলোচ্য শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এদের পরিণতি এবং স্থানীয় রূপ। এই ধর্মে তত্ত্বের উপরে কাব্যের বা কাব্যের উপরে তত্ত্বের বিশেষ প্রভাব নাই, দুটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা যায়। তত্ত্বের প্রসঙ্গ দিয়েই যে এ আলোচনা সুরু হয়েছে তার কোনও বিশেষ কারণ নাই।

## মূলতত্ত্ব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৃহৎ পরিধির সমপরিমাণে আছে সে বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগান্তর্গত তত্ত্বের অসন্দিগ্ধ নির্ণয়ের দুরূহতা, অনুমানের প্রয়োগ-প্রয়োজন, তর্কের অবকাশ, মতানৈক্যের সম্ভাবন, পৌর্বাপর্য-নির্ধারণের প্রয়াস, গ্রন্থিমোচনের আবশ্যকতা; এই সবের ক্ষেত্র বৃহৎ এবং জটিল, যদিও মন চায় তত্ত্বের প্রধান ক্ষেত্রভূমিকে প্রথম-চিহ্নিত করে অধিকারের একটা সহজ স্থিরত্বে পৌছাতে। মন চায় নিশ্চয়ভাবে জানতে যে মূলতত্ত্বগুলি কি, তাদের উৎস কি, তাদের প্রবর্তক বা প্রচারক বা উদ্ভাবক কে, এবং এগুলির অনুক্রম কি অনুসারে। কিন্তু তত্ত্বের নির্মাণভূমি অসমতল, কোথাও মনন-অনুসন্ধানের জরিপ দৈর্ঘ্য-প্রসার অব্যাহত ভাবে চালানো যায়, কোথাও বা বন্ধুর ভূমিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তবু জিজ্ঞাসার একটা আশ্রয় চাই, একটা কাঠামো খাড়া না করলেই নয়, যতই কেন না সেটা হাল্‌কা হোক। প্রধান তত্ত্বগুলি মনে হয় এই—

(১) ঈশ্বর সবিশেষ সশক্তিক। তাঁর শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি, এই শক্তিত্রয়ের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে যথাক্রমে তাঁর নিজের অন্তরঙ্গ লীলায়, জীবের সহিত সম্বন্ধে এবং জড় জগৎ সৃষ্টিতে। তত্ত্ব হিসাবে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা স্বীকৃত কিন্তু এঁরা সবিশেষ ব্রহ্ম বা ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ নয়, অংশমাত্র।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের শক্তির কথা আছে, বিষ্ণু পুরাণে বিভিন্ন শক্তির নামকরণ করা হয়েছে, পঞ্চরাত্র সংহিতায় বিষ্ণুর বিভিন্ন শক্তির উল্লেখ আছে। ভাগবতে শক্তির কথা নাই। শক্তিতত্ত্ব চৈতন্যের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন রামানন্দ রায়[১], গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে শক্তিতত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবক তিনি। এবং বোধ হয় সেই সূত্রে রূপ-ও-জীব-গোস্বামী-পরম্পরায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সেই তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গদেশে তন্ত্রের প্রভাব বহুকাল থেকে বিদ্যমান, সুতরাং শক্তি-সমন্বিত ঈশ্বর-কল্পনা বাঙ্গালীর প্রিয়। ভাগবতে[২] নির্গুণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও সবিশেষ ভগবান—এই তিন তত্ত্বের উল্লেখ আছে। প্রথম দুটি যে ভগবানের অসম্পূর্ণ রূপ তার ইঙ্গিত আছে গীতায়,[৩] যেখানে বলা হয়েছে যিনি ব্রহ্মোপলব্ধি ক'রে শোক ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ করেছেন তিনি কৃষ্ণের পরাভক্তি লাভের যোগ্য। অদ্বৈত মতে ব্রহ্মোপলব্ধিই চরম মুক্তি কিন্তু গীতায় এটি একটি সাধনার স্তর, যে স্তরের পরে ভক্তির উদ্‌গমে যথার্থ পুরুষার্থ লাভ সম্ভব।

(২) ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ, উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই আছে, সে কারণে এমন সম্বন্ধ অচিন্ত্য। এই তত্ত্বের প্রতিপাদক এবং প্রবর্তক জীব গোস্বামী। কয়েকটি ব্রহ্মসূত্রের[৪] সাহায্যে অহিকুণ্ডল ন্যায়, সূর্য ও সূর্যের প্রকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাহায্যে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ প্রতিপন্ন করেছেন জীব গোস্বামী। বলেছেন বিশেষ্যরূপ স্বয়ং ভগবান শক্তিমৎ, বিশেষণরূপ কার্যোন্মুখত্বই শক্তি। পরাশর বলেছেন সকল প্রকার শক্তিসমূহ অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্তৃত্বাদি শক্তিসমূহ। জীব গোস্বামী সংযোজন করেছেন ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁর শক্তিসমূহ অভিন্ন[৫]।

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনাবলী বঙ্গদেশে প্রচার করেন শ্রীনিবাস্, নরোত্তম, ও শ্যামানন্দ, জীব গোস্বামীর জীবৎ কালেই। না হলে হয়ত বৃন্দাবনেই এ সব রচনার অজ্ঞাতবাস ঘটত।

রামানন্দ রায় বলেছেন হ্লাদিনী শক্তির সার অংশের নাম প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব এবং রাধা মহাভাবরূপ। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধ রূপান্তরিত হ'ল হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়মানতার পরিভাষায়[৬]। শক্তিতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি বলিষ্ঠ ধারক-স্তম্ভ।

ঈশ্বর জীব ও জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে হিন্দুধর্মে যতটা মতানৈক্য আছে অন্য ধর্মে তত নাই। সৃষ্টিতত্ত্ব সব ধর্মেই আছে কিন্তু অন্য ধর্মে তত্ত্ব এত জটিল ও বহুমুখ নয় যতটা হিন্দুধর্মে। ইহুদি খৃষ্টান ইসলাম প্রভৃতি ধর্মে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, এর উপাদান কি এবং কোথা থেকে পেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন

জাগে নি কারণ সর্বশক্তিমান ভগবানের কোন শক্তির অভাব নাই। জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে, তার কারণ উপকরণ আদিম অবস্থা এবং ক্রম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা আজও কোনও সংশয়াতীত তত্ত্বে উপনীত হতে পারেন নি, পুরাকালে বিজ্ঞানের হাতিয়ার না থাকায় সৃষ্টিতত্ত্ব যে একাধিক হবে এইটাই স্বাভাবিক এবং কাম্য।

Deussen মনে করেন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে চারটি মতবাদ পাওয়া যায়।

(ক) যে বস্তুতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে সে বস্তু চিরকাল আছে, তা ঈশ্বরের বা কারও সৃষ্ট নয়, হয়ত বা ঈশ্বর তাকে গড়েছেন কিন্তু সৃষ্টি করেন নি।

(খ) প্রথমে কিছুই ছিলনা, এক পরমপুরুষ জগৎ-সৃষ্টি করেছেন শূন্যতা বা নির্বস্তু থেকে, জগৎ পরমপুরুষের সৃষ্টি হলেও তাঁর থেকে পৃথক।

(গ) পরমপুরুষ জগৎ সৃষ্টি করেছেন নিজেকে বস্তুতে পরিণত ক'রে বা সৃষ্টি করে তন্মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

(ঘ) পরমপুরুষ একমাত্র সত্য, সৃষ্টি মিথ্যা।

প্রমাণস্বরূপ উপনিষদ-আদি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

(ক) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।"[৯] হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে (বিদ্যমান) ছিল। উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎ-স্বরূপ ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ জাত হইল। উপনিষদে সৎ এবং অসৎ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অসৎ অর্থে অব্যাকৃত-নামরূপ অর্থাৎ যাহা নাম ও রূপে ব্যক্ত হয় নি, একেবারে অস্তিত্ববিহীন নয়, unmanifested। সৎ অর্থে নাম ও রূপে অভিব্যক্ত।

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্য কারিকার তৃতীয় শ্লোকে ("মূল প্রকৃতির-বিকৃতি……ন প্রকৃতির্ন্ বিকৃতিঃ পুরুষঃ) বলা হয়েছে প্রকৃতি এবং পুরুষ কারও সৃষ্ট বস্তু নয়।

"সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে এক বস্তু জন্মিলেন। ……কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মিল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হল?…এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হ'তে হ'ল কার থেকে হ'ল, কেউ সৃষ্টি করেছেন কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানতে পারেন।—ঋগ্বেদ ১০/১৩০, নাসদীয় সূক্ত।

সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হ'লেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন এ সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নরকলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করেছেন...

(ঋগ্বেদ ১০/১২১)

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ"[১১], এই জগৎ পূর্বে অসৎ ছিল, পরে সৎ-বাচ্য হল, সম্ভূত হ'ল।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে।"[১০] গোড়ায় অসৎ ছিল, তা থেকে সৎ-এর সৃষ্টি হ'ল। তিনি স্বয়ং নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত বা উত্তম স্রষ্টা বলা হয়।

(খ) "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"[৯] ( উক্ত সৎ ) ঈক্ষণ ( চিন্তা ) করিলেন আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।

"আত্মা বা ইদমেব এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ইক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।" ঐতরেয়োপনিষৎ ১/১। ( সৃষ্টির পূর্বে ) এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি অন্য কিছুই ছিলনা। সেই ( আত্মা ) এইরূপ ঈক্ষণ ( চিন্তা ) করিলেন "আমি লোক সমূহ সৃজন করিব।

"স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।...স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাইপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং...অয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।"[৮] তিনি দ্বিতীয়ের অভিলাষ করিলেন। তিনি এই নিজ ( দেহ ) কে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহা হইতে পতি ও পত্নী জাত হইলেন।...এই আকাশ পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। তিনি তাহাতে উপগত হইলেন, তাহার ফলে মনুষ্যগণ জাত হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণেও অনুরূপ উক্তি আছে তবে সেখানে ইক্ষণ বা ইচ্ছার পরিবর্তে তপস্যার কথা আছে ( শতপথ ব্রাহ্মণ ৬/১/১, ২/৫/১ )

(গ) "স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরান্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণ...ব্যুচ্চরন্তি...।"—বৃহদারণ্যক ২/১/২০। মাকড়সা যেমন ( নিজ দেহোৎপন্ন ) তন্তু অবলম্বনে বিচরণ করে কিংবা অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয় তেমনি এই আত্মা হইতে সকল প্রাণ...উৎপন্ন হয়।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ<br>
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি<br>
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি<br>
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ [১১ ক]

মাকড়সা যেরূপ ( নিজ দেহ হইতে তন্তু ও জাল ) উৎপাদন করে

ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যদ্রূপ ওষধিসমূহ জাত হয়, সজীব পুরুষ-শরীর হইতে যদ্রূপ কেশ ও লোমসমূহ ( নির্গত হয় ) তদ্রূপ অক্ষর হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়।

"সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিত কিঞ্চা তৎসৃষ্টা। তদেবানুপ্রবিশৎ"[৭] সেই ( ব্রহ্ম ) কামনা করিলেন "আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব", তিনি তপস্যা করিলেন উষ্মতা উৎপাদন করিলেন, যাহা কিছু সমুদয় সৃষ্টি করিলেন। উহা সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাতে প্রবেশ করিলেন।

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তৎ...নামরূপাভ্যামেব ব্যক্রিয়ত...স এষ ইহ আনখাগ্রেভ্যা প্রবিষ্ট" ( বৃহদা ১/৪/৭ ) সেই ( এই জগৎ ) তখন অব্যাকৃত ছিল উহা...কেবল নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হয়...এই আত্মা ( এই নিখিল দেহে ) নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

"স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম" ( বৃহদা ২/৫/১৮ ) এই পুরুষই নিখিল দেহপুরে পুরিশায়ী হইয়া পুরুষ নামধারী হইয়াছেন। এমন কিছুই নাই যাহা ইঁহার দ্বারা আবৃত নহে, এমন কিছুই নাই যাহাতে ইনি অনুপ্রবিষ্ট নহেন।

"যস্তন্তুনাভ ইব তন্তু ভিঃ প্রাধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ"

শেতাশ্ব ৬/১০)

যে এক ( অদ্বিতীয় ) দেব প্রধান অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি প্রসূত তন্তু দ্বারা মাকড়সার ন্যায় আপনাকে আচ্ছাদিত করেছেন।

(ঘ) জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা সেটা মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য

প্রথম মতে এই জগৎ পূর্বে অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ অব্যাকৃত "চিহ্নবিবর্জিত" ছিল, "অবিদ্যমান বস্তু" দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তা থেকে অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। একে বলা হয় সৎকার্যবাদ, উৎপত্তির পূর্বে এবং বিনাশের পরেও কার্যের সত্তা আছে; আরও বলা হয় পরিণামবাদ, কারণরূপে কার্য গোড়া থেকেই ছিল, নূতন কিছুর উদ্ভব হয় নি, পরিণত হয়েছে মাত্র। এই মতবাদ সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতকে বলা হয় আরম্ভবাদ, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন, তার পূর্বে তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি সৃষ্টির শুধুই নিমিত্ত কারণ নয় উপাদান কারণও, উপকরণ বহিরাগত নয় তিনি নিজেই, নিজেকে বহুধা বিভক্ত করলেন কিংবা মাকড়সার ন্যায় নিজ দেহ হ'তে নির্মাণ-বস্তু নিষ্কাশন করলেন; উপায় স্বরূপ কোথাও বা তপস্যার কথা বলা হয়েছে। এই মতবাদকে

অসৎকার্যবাদও বলা হয়, এই মতে সৃষ্টি ও সৃষ্টকর্তায় যা প্রভেদ আছে তা প্রকারে নয় ইয়ত্তায়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এই মতের সমর্থক।

তৃতীয় মতের বিশেষত্ব এই যে সৃষ্টিকর্তা শুধুই সৃষ্টি করেন নি, সৃষ্টিতে প্রবেশ করেছেন, সৃষ্টির মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে আছেন অথচ জগৎ সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। এই তত্ত্বকে বলা হয় panentheism, এর বিশেষত্ব এই যে ঈশ্বর আপন সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েও সৃষ্টিতে সীমান্বিত নয়, তার অতিরিক্ত বৃহত্তর সত্তা।

চতুর্থ মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মিথ্যার এ অর্থ নয় যে জগতের অস্তিত্ব নাই, জগৎকে আমরা যে ভাবে দেখি সেটা সত্যদৃষ্টি নয়। এটি অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের মত, এই মতে পরিণাম মানেই বিকার এবং যেহেতু ব্রহ্মের বিকার অকল্পনীয় অতএব পরিণাম সম্ভব নয়। এই তত্ত্বের নাম বিবর্তবাদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিণামবাদ মানেন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, কিন্তু এই পরিণামে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন, পরিবর্তন হয় শুধু তাঁর শক্তির।

অদ্বৈতবাদী বা অভেদবাদীর মতে ব্রহ্ম জীব জগৎ সব এক। ভেদবাদী—যার মধ্যে খৃষ্টান ইহুদি মুসলমানকেও মনে করা যায়—তাঁদের মতে জীব ও জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তিনি জগৎকারণ, তবে জগৎসৃষ্টির উপাদান নয়। খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্ম ভক্তিধর্ম কিন্তু এঁদের ঈশ্বর বিশ্বাতীত, বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের অংশ নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী, ঈশ্বর ও জীব একাত্ম নয়, উভয়ের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ মনে করা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক ঈশ্বর থেকে বহুবিধ সৃষ্টি হয়েছে অতএব সৃষ্টি ঈশ্বরের অংশ একথাও তাঁরা মানেন। অতএব তাঁরা উপরোক্ত অভেদবাদীও নয় ভেদবাদীও নয়, দুই কোটির বাইরে, তাঁদের মতের মান্যতা রক্ষার জন্য সৃষ্ট হ'ল ভেদাভেদবাদ।

অচিন্ত্য শক্তির কথা বিষ্ণু পুরাণে আছে।[১২] ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ হ'লেও অন্যান্য ভক্তিধর্মের মত এখানেও কৃপা-তত্ত্ব বা doctrine of grace প্রবল। উপনিষদের প্রসিদ্ধ শ্লোক "যমেবৈষ বৃণুতে" এর আকর।[১৩]

(৩) কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান, তিনি নরাকৃতি, তাঁর নরলীলাই ভক্তের অনুধাবনের বিষয়। ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মেনে নিয়েছেন।

(৪) বৃন্দাবন, মথুরা দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রকট লীলা, এ ছাড়া তাঁর নিত্য অপ্রকট লীলা আছে গোলোকে। ভাগবতে বলা হয়েছে মর্ত্যলীলা শেষ করে' কৃষ্ণ গোলোকে প্রবেশ করলেন। এই নিত্য অপ্রকট লীলাকে দৃঢ় রূপ দিলেন জীব গোস্বামী, গোপালচম্পূ অপ্রকট লীলা-বিষয়ক। গোলোকে পরকীয়া রস নাই, রসের বিচিত্রতার বিচারে এ লীলা প্রকারে সম্পূর্ণ নয়, পরকীয়া রস আস্বাদনের জন

কৃষ্ণকে প্রকট লীলায় অবতীর্ণ হ'তে হ'ল। এই ব্যাখ্যার উদ্ভাবক জীব গোস্বামী।

(৫) প্রকট লীলাতেও কৃষ্ণ, তাঁর পরিকরবৃন্দ, এবং বৃন্দাবনের গিরি নদী বন সকলই চিন্ময়, অপ্রাকৃত, স্বরূপ শক্তির অংশ। লীলা প্রকটন কালে কৃষ্ণের সঙ্গেই এঁরা সব আসেন, লীলাসংবরণ কালে কৃষ্ণের সঙ্গেই অন্তর্হিত হ'ন। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গে ভগবদ্ধাম ও ভগবৎ-পরিকর সম্বন্ধে আলোচনা সামান্যই আছে, তার চেয়ে অনেকগুণে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে।

কৃষ্ণপরিকররা যে স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ এমন কথা ভাগবতে নাই, সেখানে কৃষ্ণলীলার স্বাভাবিক সাবলীল বর্ণনা আছে তত্ত্বারোপ নাই। ভাগবতে আছে কৃষ্ণের সাহচর্য লাভ ব্রজবাসীগণের সৌভাগ্য।[১৪] অন্যত্র আছে "অহো নন্দগোপ ও ব্রজবাসীগণের কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য, পরমানন্দ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁদের মিত্র,"[১৫] তাঁরা যদি স্বরূপ শক্তির অংশ হ'ন তাহলে সৌভাগ্যের কথাই ওঠে না। অনেক গোপী গুণময় দেহ ত্যাগ করেছিলেন,[১৬] অতএব তাঁরা স্বরূপ শক্তির বৃত্তি হ'তে পারেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণলীলার সহিত জড়িত সকল ব্যক্তি কৃষ্ণের নিজ-স্বরূপের অংশ, তাঁর সহগামী এবং সহাবির্ভাবী; মাতা-পিতা-সখা প্রভৃতি অভিমান তাঁদের আছে এবং সেই সেই সখ্য-বাৎসল্যাদি রসে তাঁরা কৃষ্ণপ্রীতির সম্যক উদ্যোগ করেন অথচ সম্পর্কগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা; কৃষ্ণ মনে করেন না যে তিনি স্বয়ং ভগবান, পরিকররাও তা মনে করেন না, যোগমায়ার প্রভাবে তাঁরা স্ব স্ব রূপ বিস্মৃত। কৃষ্ণ অবতার নয় স্বয়ং ভগবান অথচ তাঁর লীলা নরলীলা, এ দুয়ের সমন্বয় করবার জন্য অপ্রকট লীলার উদ্ভাবন এবং বৃন্দাবনলীলাকে একটা অভিনয়ের রূপ দিতে হয়েছে।

(৬) কৃষ্ণলীলায় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় ভাব আছে। বৈধী ভক্তিতে ভক্ত তাঁকে দেখেন ঈশ্বর ভাবে এবং রাগানুগা ভক্তিতে মাধুর্যমণ্ডিত মদীয়তা ভাবে। সেবার শ্রেষ্ঠতর পন্থা রাগমার্গে মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমভিত্তিক সেবা।

হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়েরই সমতুল্য বিকাশ আছে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ঐশ্বর্যকে পরিহার করে' মাধুর্যের গৌরব-প্রীতি ঘোষিত হয়েছে।

ঐশ্বর্য পরিহার যে স্বয়ং কৃষ্ণের অভিপ্রেত তার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় হরিবংশে ও বিষ্ণু পুরাণে,[১৭] কৃষ্ণ গোকুলবাসীদের সম্বোধন ক'রে বলছেন যে তিনি দেবতা-গন্ধর্ব-যক্ষ নয় তিনি তাদের একান্ত বন্ধু, গোপরা যেন অন্যরূপ চিন্তা না করেন, যেন তাঁকে পরাক্রমশালী মনে করে অনাদর না করেন।

মমত্ববোধের উল্লেখ পাওয়া যায় নারদপঞ্চরাত্রে—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ।"[১৮]

বিষ্ণুতে প্রেমসংযুক্ত যে মমতা অন্য বিষয়ে মমত্বশূন্য, তা'কে ভীষ্ম প্রহ্লাদ উদ্ধব নারদ ভক্তি বলেন। এই মতে ভক্তি মানেই প্রেমভক্তি, সাধন ভক্তির স্থান নাই।

ভাগবতে দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ আছে, সগুণ এবং নির্গুণ,[১৯] সগুণ অর্থে গুণময় প্রকৃতিসঞ্জাত বা প্রাকৃতিক, নির্গুণ অর্থে অপ্রাকৃতিক। যা প্রাকৃতিক তা মানুষের আয়ত্ত, যা অপ্রাকৃতিক তা ঈশ্বর-লব্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই ভিত্তিতেই সাধন-ভক্তি ও সাধ্য-ভক্তি চিহ্নিত হয়েছে।

কথিত আছে মাধবেন্দ্র পুরী গৌড়দেশে প্রথম আবেগধর্মী প্রেমভক্তি প্রচার করেন, "ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার"[২০] তিনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর।[২১] কবিকর্ণপূর বলেছেন[২২]

"তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মোঽয়ং প্রবর্তিত
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিণঃ ॥

তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র যাঁহা হ'তে বৈষ্ণবধর্ম প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবনস্থ কল্পতরু, যিনি প্রীত প্রেয় বৎসল ও উজ্জ্বল নামক ফল ধারণ করেছেন, মাধবেন্দ্র তাঁরই অবতারস্বরূপ। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন "মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন/মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন[২২ক]।"

"সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকার নমস্ক্রীয়ায় বলিয়াছেন যে মাধবেন্দ্র পুরী দ্বরাই কৃষ্ণ-ভক্তিরূপ রসতরু অঙ্কুরিত হইয়াছিল[২২খ]।" দুঃখের বিষয় এরকম একজন পথিকৃৎ ও পূর্বসূরীর সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই।

কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'য়ে রাধা ও অন্য কৃষ্ণপ্রেয়সীদের সহিত মিলিত হয়েছিলেন ভাগবতে এমন কথা আছে।[২৩] কৃষ্ণের রাজৈশ্বর্য দেখে রাধা প্রীত হ'ন নি, তাঁর রাখালরূপই রাধার কাম্য ছিল। চৈতন্য এই ভাবে বিভাবিত হ'য়ে "যঃ কৌমারহর" শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন জগন্নাথের ঐশ্বর্য-প্রধান উপাসনা দেখে[২৪] এবং রূপ গোস্বামী এরই প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকে।[২৫] চৈতন্য নিজের জীবনে রাগানুগা মার্গে মধুর রসে কৃষ্ণ-উপাসনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কিন্তু এর সম্ভাব্যতা জেনেছিলেন রামানন্দ রায়ের কাছ থেকে। কৃষ্ণকে বলা হয়েছে "অপ্রাকৃত নবীন মদন", কামগায়ত্রী কামবীজে তাঁর উপাসনা, তাঁর লীলা "নিরন্তর কামক্রীড়া"[২৬] বৃন্দাবনের অন্য লীলার পর্যালোচনা পরিত্যক্ত। ঐশ্বর্য বর্জন ক'রে মাধুর্যকে সর্বস্ব ব'লে গ্রহণ করার সমর্থন চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে সর্বত্র পাওয়া যায়।

(৭) বৈধীমার্গে শ্রবণ, কীর্তন, বিগ্রহ পূজা প্রভৃতি উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ ভক্তের প্রতি প্রযোজ্য। রাগমার্গে এগুলি প্রথমাবস্থায় বাঞ্ছনীয় কিন্তু সেখানে শ্রেষ্ঠ সেবা মানসিক, জীবভক্ত কল্পনায় কোনও ব্রজপরিকরের আনুগত্যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভাবে কিম্বা নিজেকে স্ত্রীলোক কল্পনায় মঞ্জরীভাবে প্রেমলীলায় রাধাকৃষ্ণের সেবা করবেন। কল্পনাতেও অপরোক্ষ সেবা বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-কল্পনা নিষিদ্ধ।

বৈধীমার্গে নবধা ভক্তির উল্লেখ আছে ভাগবতে। তামিল আড়বাররা দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বৈধী ও রাগানুগা মার্গের সহিত বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মর্যদা মার্গ ও পুষ্টি মার্গের অসামান্য সাদৃশ্য আছে। এই মতে ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুষ্টিভক্তি যা সম্পূর্ণ ভগবৎ-অনুগ্রহ-নির্ভর। সর্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ ক'রে পত্নীভাবে নিত্য রসাবেশে বাস করা পুষ্টি মার্গের শ্রেষ্ঠ সাধনা। প্রয়াগের নিকটবর্তী আড়াইল গ্রামে বল্লভাচার্যের সহিত চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিন্তু আলোচনার কোনও বিবরণ চরিতকার লেখেন নি। পরে পুরীতে পুনর্বার সাক্ষাৎ হয়েছিল কিন্তু চৈতন্য আলোচনা করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। বল্লভাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল রামানন্দ রায়ের, সুতরাং রাগানুগা মার্গে দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে উপাসনার প্রথম কথক রামানন্দ। চৈতন্যের অনুরোধে তিনি এর সবিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন, এবং ক্রমিক উৎকর্ষ বর্ণনা করেছেন, যা ব্যঞ্জিত হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃতে।[২৭] রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সর্বসাধ্যসার বলেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন সখীভাবে সাধনার।[২৮] চৈতন্যের আর্তিকে রাধাভাব বলা হয় কারণ উদ্ধব-দর্শনে বিরহিণী রাধার যে মহাভাব লক্ষিত হয়েছিল সেটি শুধু চৈতন্যে দেখা গিয়েছিল[২৯] কিন্তু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যখন তিনি কৃষ্ণকে দেখেছেন তখন রাধিকাকেও দেখেছেন[৩০] স্বপ্নেও নিজেকে রাধার স্থানে দেখেন নি, অতএব সখীভাবে সাধনার উপদেশ তিনি মেনে নিয়েছেন। বোধ হয় এ কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে রাধাভাবে সাধনা নিষিদ্ধ এবং সখীদের এত প্রধান্য। রাধাভাব সাধ্যবস্তু, এ ভাবে সাধন করবার কোনও বিধান নাই, অতএব এটি অনুষ্ঠান বর্জিত।

রাগানুগা-মার্গে গোপীভাবে সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রেষ্ঠ-বিবেচিত, এবং এই নির্ধারণটি রামানন্দ রায়ের। রূপগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস সখীভাবে সাধনার বাসনা বহু শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। রামানন্দ বলেছেন রূপ গোস্বামীর রচনা তাঁর নিজের প্রেমভক্তি ব্যাখ্যানের অনুযায়ী।[৩১] বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মঞ্জরী কথাটির সৃষ্টি করেন নি, এ কথাটি উদ্ভাবন করেছেন বঙ্গদেশের

ভক্তরা। বৃন্দাবনে শিক্ষালাভ করে নরোত্তম দাস বঙ্গদেশে মঞ্জরীভাবে সাধনা প্রচার করেন।

(৮) বৈষ্ণবের পালনীয় আচার ও কর্তব্যের মধ্যে প্রধান নিরামিষ ভোজন, একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতপালন, তুলসী শালগ্রাম পূজন ইত্যাদি। বৈষ্ণবের আচরণের মধ্যে লক্ষণীয় এবং সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় নম্রতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, ভগবানের পূজার সমানুপাতে ভক্তের পূজা, প্রাণী মাত্রকেই মান্য দিয়ে নিজে অমানী হ'য়ে থাকা।

যিনি হরির পূজা করেন অথচ হরিভক্তের পূজা করেন না তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত, উত্তম ভক্ত নয়।[৩২]

(৯) ধর্মাচরণে কীর্তনের প্রাধান্য—নামকীর্তন, লীলাকীর্তন—বিশেষতঃ সমবেত কীর্তন বা সঙ্কীর্তন। নগর-সঙ্কীর্তন এই ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। সে কালে বোধ হয় উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করা হ'ত বিশেষ পর্বোপলক্ষ্যে, যেমন গ্রহণ সময়ে, অন্য সময়ে মনে মনে নাম-জপ করার প্রথা ছিল[৩৩], সতত উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তনের প্রথা প্রবর্তন করলেন হরিদাস[৩৪], কিন্তু এমন কীর্তন তিনি একাকিই করতেন, যদিও নিজের উপকারের জন্য শুধু নয় পরের উপকারের জন্যও।[৩৫] সমবেত কীর্তনের প্রবর্তক চৈতন্য[৩৬], তাঁকে সঙ্কীর্তন অবতার[৩৭], সঙ্কীর্তন-পিতা[৩৮] বলা হয়েছে, তিনি নিজেকে বলেছেন কীর্তনের প্রচারক।[৩৯] কীর্তনে পাপনাশ হয়, প্রথম দৃষ্টান্ত জগাই মাধাই।[৪০] চৈতন্য কীর্তনের সহিত নৃত্যের প্রবর্তন করেন।

(১০) কৃষ্ণ প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ তাঁর মাধুর্যলীলা ভাগবতে যেমন ফুটেছে অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে তেমন নয়, ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য মনে করা হয়েছে এবং তত্ত্বের নির্ণয় ও বিচার ভাগবৎ-প্রতিষ্ঠ, অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত প্রস্থান-ত্রয়-ভিত্তিক নয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন এটি চৈতন্যের অভিমত[৪১]; যাই হোক জীব গোস্বামী এরই ভিত্তিতে ষট্‌সন্দর্ভের যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।

(১১) প্রেমভক্তি ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নয় এইটাই পরম-পুরুষার্থ। অন্যদিকে ভুক্তি-মুক্তি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণসেবা শুধু ইহজগতেই পর্যবসিত নয়, পরলোকে অর্থাৎ গোলোকে দিব্যদেহ ধারণ ক'রে কৃষ্ণসেবাই কাম্য।

মানুষ "মুক্তি" অর্থে দুঃখ-মুক্তিই বোঝে, এবং যেহেতু সংসার সকল দুঃখের মূল অতএব সংসার-চক্র থেকে অব্যাহতিই মুক্তি। কিন্তু কোনও কোনও দর্শনতত্ত্বে মুক্তির উদ্দেশ্য সুখের উপলব্ধি বা আনন্দের অধিগম; অথবা আত্মোপলব্ধি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে জীবের প্রয়োজন আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এই উপলব্ধি। শ্রেষ্ঠ ভক্তের কাছে চরম প্রার্থনীয় এই উপলব্ধি-জনিত

সেবাবাসনা। এমন ভক্ত আত্মসুখ চান না, এবং যেখানে সুখবাসনা বা দুঃখ নিবৃত্তির কামনা সেবারূপ চরিতার্থতার পরিপন্থি হয় সেখানে সুখ-সম্বন্ধিত বা দুঃখ-নিবারক মুক্তিও চান না।

ভগবৎ সেবাই যে শ্রেষ্ঠ ভক্তের চরম কাম্য মুক্তি—এর বীজ আছে রামানুজের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে, যে মতে ভক্তের পরম কাম্য কৈঙ্কর্য, অর্থাৎ শরণাগতি বা প্রপত্তির সহায়ে ভগবৎ-দাসত্বের অধিকারী হওয়া।

ভাগবতে এই মর্মে কয়েকটি উক্তি আছে যে সালোক্যাদি মুক্তি ভক্ত চান না যদি না মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণসেবার সুযোগ থাকে। এখানে কৃষ্ণসেবাকে মুক্তির চেয়ে অধিক কাম্য রূপে দেখা হয়েছে কিন্তু এ দুটি যে পরস্পরবিরোধী এমন কথা বলা হয় নি। কোনও অবিজ্ঞাত কারণে মুক্তিকে সাযুজ্য-মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীনতার অর্থে নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মুক্তির প্রতি পরাঙ্মুখ এবং তার ধিক্কারে সোচ্চার। এর সূত্রপাত দেখা যায় বাসুদেব সার্বভৌমের আচরণে, তিনি ভাগবতের ১০/১৪/৮ শ্লোকের শেষ চরণে "মুক্তিপদে" পাঠের পরিবর্তে "ভক্তিপদে" পাঠ করেছিলেন।[৪২]

পরম ভক্ত যে পঞ্চবিধ মুক্তির কোনটাই চান না এ কথা চৈতন্যও বলেছেন।[৪৩]

রামানন্দ বলেছেন "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার" কিম্বা রাধার প্রেম "সাধ্য শিরোমণি"[৪৪] অর্থাৎ এটি সাধনার অঙ্গ নয় সাধনার দ্বারা লভ্য পরমবস্তু। এই মত সমর্থন ক'রে চৈতন্য বলেছেন—

"শ্রবণ-কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা
সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা।"[৪৫]

এই প্রেমভক্তি ভক্তের চেষ্টা-সাধ্য নয়, ভগবৎ-কৃপালব্ধ। এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় রূপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান কল্পে চৈতন্যের উক্তিতে।[৪৬]

(১২) রাধা এবং বৃন্দাবনের গোপীরা প্রেমভিত্তিক কৃষ্ণসেবা করেছেন মধুর রসের আনুগত্যে; মধুর রসের মধ্যে পরকীয়া প্রেমেরই গৌরব কারণ এতে সর্বত্যাগের মহিমা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে গোপী-প্রেম পরকীয়া-প্রেম এবং সেই হেতু গৌরবময়। অবশ্য কিছু তাত্ত্বিক একে সামাজিক-প্রথাগত দোষ থেকে মুক্ত করবার জন্য মনে করেছেন পরকীয়া-ভাব মায়িক, গোপীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া।

কৃষ্ণের সহিত গোপীদের প্রেম যে পরকীয়া-প্রেম সেটা আবৃত করবার কোনও প্রয়াস ভাগবতে নাই। চৈতন্যও "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকে[৪৭] পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের আকর্ষণকে বলা হয়েছে কাম, গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেছেন এটি হ্লাদিনী শক্তির পবিত্রতম স্ফুরণ, কাম নয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছারূপ প্রেম। ভাগবতে কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিকে

বলা হয়েছে অনঙ্গবর্ধন অর্থাৎ কামোদ্দীপক। জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যায় অনঙ্গ শব্দের অর্থ যা অঙ্গ নয়, যা অঙ্গী অর্থাৎ প্রেম; অনঙ্গবর্ধন অর্থে প্রেমভক্তিবর্ধন।[৪৮]

(১৩) মুখ্য রস শুধু একটি—ভক্তিরস, নাট্যশাস্ত্রের সব রসকে গৌণরস মনে করা হয়। রসাস্বাদন শুধু ভক্তরা এবং পরিকররা করেন না, করেন কৃষ্ণও, সে রস তিনি লাভ করেন পরিকরদের প্রেমভক্তির কারণে।

কৃষ্ণ যে সুখ আস্বাদন করেন এবং ভক্তজনে সুখ দেন এ কথা প্রথমে বলেছেন রামানন্দ রায়।[৪৯]

(১৪) যেহেতু কৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্তের প্রধান স্মরণীয় ও ভজনীয় বিষয়, স্বভাবতঃই এই লীলা-বর্ণনা নানা ভাবে পল্লবিত, দীর্ঘায়িত, সমৃদ্ধিমান হ'বার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছিল এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত নিয়মিত করতে অলঙ্কারশাস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে যে কাব্যগ্রন্থ ও অলঙ্কারগ্রন্থ সকল রচিত হয়েছে সে সব ধর্মীয় মর্যাদা পেয়েছে। ভক্তিরসকে আশ্রয় ক'রে বৃহৎ রসশাস্ত্র ও রসসাহিত্য প্রণয়ন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ অবদান।

রসতত্ত্বের কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা প্রথমে পাওয়া যায় রামানন্দ রায় কর্তৃক প্রদত্ত চৈতন্যের প্রশ্নের উত্তরগুলিতে।[৫০] পরে রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতিতে সবিস্তারে এ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। রসমঞ্জরিতেও রসশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কবিরা করেছেন কৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্যলীলা বর্ণনা!

নায়িকার মান সম্বন্ধে দীর্ঘ বিশ্লেষণ ও বিভাজন করেছেন স্বরূপ দামোদর[৫১]; বলেছেন প্রেমভাবের গাঢ়ত্বের জন্য রাধার স্বভাব বামা। এই প্রসঙ্গে স্বরূপ দামোদর অধিরূঢ় মহাভাব, কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত, বিলাস প্রভৃতিরও প্রকার নির্ধারণ ক'রে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

(১৫) তত্ত্বহিসাবে চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ; বোধ হয় এই কারণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণের একক উপাসনার চেয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা অধিক প্রচলিত। এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত রূপে প্রয়োজন হ'ল কৃষ্ণের একক আবির্ভাব না হয়ে এরূপ যুগল আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ।

হিন্দুধর্মে যুগলের পূজা অতি পুরাতন প্রথা, হরপার্বতী লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা বহু প্রচলিত। কিন্তু যুগনদ্ধ ভাব বা মিলিত-তনুর ক্ষেত্রে তন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়। ভাগবতে তন্ত্রের উল্লেখ সামান্য (৬/১৭/৬, ১১/২৭/৭) কিন্তু বঙ্গদেশে তন্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট। চৈতন্য যে একদেহে রাধাকৃষ্ণ উভয়ের সম্মিলিত রূপ এই কল্পনায় তন্ত্রের প্রভাব আছে বলে' মনে হয়।

এই তত্ত্বের প্রথম অবিসম্বাদিত প্রতিপাদনের গৌরব রামানন্দ

রায়ের প্রাপ্য। গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে চৈতন্যের সহিত প্রথম সাক্ষাতে রামানন্দ প্রেমধর্ম সাধন প্রভৃতি প্রসঙ্গে যে জ্ঞানরত্নরাজি সৃষ্টি করেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সেগুলি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আলোচন শেষ হ'লে তিনি চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন যে রাধার ভাবকান্তি অঙ্গিকার ক'রে কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু এই তত্ত্বই নয় অবতারিত্বের মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যও তিনি প্রকাশ করলেন।[৫২]

মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চায় এইজাতীয় কথা বলেছেন কিন্তু চৈতন্যের সঙ্গে রামানন্দের সাক্ষাতের সময়ে তাঁর কড়চা রচিত হয় নি। যে কারণে রাধার ভাব ও রূপ গ্রহণ ক'রে চৈতন্যরূপে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, স্বরূপ দামোদরের প্রসিদ্ধ শ্লোকে তার বিশদ স্থাপনা আছে; কিন্তু তার বহু পূর্বে রামানন্দ স্থির-নির্দেশক বাক্যে এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন এবং এর ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন[৫৩] যে তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে চৈতন্য—রামানন্দ—কথোপকথন প্রচার করেছেন, যে কড়চা আজ লুপ্ত। অতএব স্বরূপ-দামোদরের পূর্বেই যে রামানন্দের তত্ত্ব-প্রতিপাদন তা তিনি ( স্বরূপ দামোদর ) নিজেই স্বীকার করেছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কোথাও চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের ঐক্যাবতার বলে উল্লেখ করেন নি, যদিও সনাতন ও রূপ উভয়েই নীলাচলে গিয়েছিলেন এবং রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জীব গোস্বামী বলেছেন "অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর" এর অর্থ বোধ হয় এই যে চৈতন্য গৌরবর্ণ কিন্তু তাঁর অন্তর কৃষ্ণময়, এখানে রাধাতত্ত্বের কোনও সংস্রব আছে বলে মনে হয় না।

চৈতন্য-পূর্ব সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যে রাধা কৃষ্ণপ্রেয়সীদের মধ্যে একজন, অবশ্য সর্বপ্রধানা; কিন্তু তিনিও সময়ে সময়ে বঞ্চিতা, খণ্ডিতা, মানিনী। এই প্রেম সর্বাতিশায়িনী এই হিসাবে যে এমন একাগ্র উৎসর্গিত বাধাবন্ধ-অতিক্রমী সর্বত্যাগ-সম্ভব প্রেম অন্য নায়িকায় দুর্লভ। তিনি শ্রেষ্ঠা নায়িকাই থেকে গেছেন, স্বকীয়া বা পরকীয়া; যে মতে কৃষ্ণের স্বকীয়া সেখানেও একজন অনন্য-বৃত্তি বিশেষিত প্রেমিক ভক্তের বেশী উচ্চস্থান পান নি, কৃষ্ণের সঙ্গে সমাসন পাওয়া ত দূরের কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে রাধা কৃষ্ণের পরা প্রকৃতি; কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম, তার সার মহাভাব, রাধা মহাভাবরূপা।

রাধাকে এইপ্রকার গুরুত্ব দানের প্রধান কারণ চৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি যে কৃষ্ণ ও রাধার মিলিত বিগ্রহ এই তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হ'ল যে রাধা শুধুই কৃষ্ণের প্রেয়সী বা প্রধানা প্রেয়সী নয়, তিনি কৃষ্ণের সমতত্ত্ব, কৃষ্ণের সহিত যুগলে পূজার যোগ্য। এখানেও রামানন্দ রায়ের উক্তি নির্দেশক ব'লে গ্রাহ্য হ'তে পারে,

তিনি বলেছেন "শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।"[৫৪]

যদিও নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ে উপাসিত দেবতা গোপকৃষ্ণ, এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী বলে স্বীকৃত, তবুও নির্ধারণ অনিবার্য যে চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ মনে করায় রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা বঙ্গদেশে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রচলিত মতে যে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাত্য তার মধ্যে নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাদৃশ্য অধিক। কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কারও সঙ্গে যে চৈতন্যের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়েছিল এ কথা কোথাও লেখা নাই, চরিতকাররা বা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি। বল্লভাচার্যের সঙ্গে চৈতন্যের বারাণসীতে ও পুরীতে দেখা হয়েছিল কিন্তু প্রসঙ্গ কথার কোনও বিবরণ নাই।

## চৈতন্য-রামানন্দ সংবাদ

চৈতন্য যখন নীলাচল থেকে দক্ষিণদেশে ভ্রমণে যাচ্ছিলেন তখন গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রমানন্দ ছিলেন ওরিযার স্বাধীন হিন্দু নরপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসনকর্তা, বিষয়ী হ'লেও তিনি ছিলেন মহাপন্ডিত, কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ রামানন্দের সঙ্গে কয়েক রাত্রি ধ'রে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা হয়, রামানন্দ বক্তা চৈতন্য শ্রোতা। অন্য কারও সঙ্গে আলোচনায় এমন ভাবটি চরিতকার দেখান নি।

রামানন্দের উক্তি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে, গ্রন্থকার বলেছেন[৫৫] এই মিলন প্রসঙ্গ তিনি বর্ণনা করছেন স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে। স্বরূপ দামোদর বহুদিন রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের নিকট-সান্নিধ্যে বাস করেছিলেন সুতরাং এই কথোপকথন সঠিকভাবে তাঁর জানবার কথা; দুর্ভাগ্যক্রমে এই কড়চা আজ অপ্রাপ্তব্য, কিন্তু কৃষ্ণদাস যদি কড়চাকে সঠিক অনুবর্তন ক'রে থাকেন তা হলে তাঁর রচনাকে প্রামাণ্য মনে ক'রে এই সংলাপের উচিৎ মূল্য দেওয়া যেতে পারে।

ন্যায্যমূল্য এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কতকগুলি মূলতত্ত্ব প্রতিপাদনের কৃতিত্ব রামানন্দ রায়ের। এই মূল্য স্বয়ং চৈতন্য তাঁকে দিয়েছেন, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে আছে[৫৬] সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথোপকথন কালে চৈতন্য বলছেন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে অনেক তত্ত্ববাদীর সঙ্গে পরিচয় হল "কিন্তু ভট্টাচার্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্" একমাত্র রামানন্দের মতই আমার

রুচিসম্মত। এই মতবাদ শুধুই যে চৈতন্যের রুচিসম্মত তা নয়, এই সংলাপ চৈতন্যের জীবনের দ্বিতীয় বিবর্তন সন্ধিক্ষণ বা turning point, প্রথমটি ঘটেছিল গয়ায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন চৈতন্য রূপ গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেটি রামানন্দ রায়ের নিকটে প্রাপ্ত[৫৬]

"রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিলা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদের বন্দনা শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন গৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র ভক্ত-রামানন্দরূপ মেঘে স্ববিষয়ক ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃতবারি সঞ্চারিত করেছেন এবং রামানন্দরূপ মেঘ থেকে সেই বারি বর্ষিত হয়ে চৈতন্যের অন্তরে রত্ন সৃষ্টি করেছে। ভক্তি-অনুকূল সিদ্ধান্ত হ'লেও এটি চিরন্তন-কিম্বদন্তী-সম্মত নয়, সেটা এই যে মেঘের জল নয় স্বাতী নক্ষত্রের জল সমুদ্রস্থিত শুক্তির মধ্যে পড়লে মুক্তার সৃষ্টি হয়। চৈতন্য-হৃদয়ে মুক্তা-সৃষ্টির কৃতিত্ব যদি চৈতন্য নিজে রামানন্দকে দিয়েছেন তা হলে আমাদেরও দেওয়া উচিৎ। ভক্তিতত্ত্বের যে বিশদ ব্যাখ্যা, সাধনার যে ক্রমবিন্যস্ত প্রসঙ্গ, প্রেমভক্তির যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রামানন্দ দিয়েছেন, এর পূর্বে চৈতন্য এরকম কথা শুনেছেন বা বলেছেন ব'লে কোনও চরিতগ্রন্থে উল্লেখ নাই। অতএব এই প্রসঙ্গে রামানন্দ ব্যাখ্যাতা এবং চৈতন্য মর্মগ্রহীতা এই সাধারণ নির্ধারণকে বিকৃত করবার কোনও প্রয়োজন নাই, এবং এরকম সিদ্ধান্তে চৈতন্যের মহত্ত্ব কোনও অংশে খর্ব হয় না।

চরিতকার এবং পরবর্তী ব্যাখ্যাকাররা এই মত পোষণ করেন যে সর্বজ্ঞ চৈতন্যকে শিক্ষা দেওয়ার কিছু নাই, তিনিই অন্যদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে মেধা স্ফুরিত ক'রে তাদের মুখে বাণী দিয়েছেন। একজন বিজ্ঞ লেখক যে প্রাচীন অভিমত উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। "মনু অনুমোদন করেন যে যেখানে শিষ্য তাঁর চেয়ে নিম্নবর্ণের গুরুর কাছে অধ্যয়ন করছেন, শিষ্য সাধারণতঃ এমন গুরুকে অনুবর্তন এবং তাঁর আজ্ঞাপালন করবেন কিন্তু কল্লুকভট্ট ব্যাখ্যা করেছেন যে উচ্চবর্ণের শিষ্য নিম্নবর্ণের গুরুর পাদপ্রক্ষালন বা গুরুর ভোজনের পরে উচ্ছিষ্ট পরিমার্জনা করবেন না। কুল্লুক ব্যাসের একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন যে ক্ষত্রিয় গুরুর কাছে বিদ্যালাভ-পারদর্শী হ'লে পরে ব্রাহ্মণ শিষ্য পুনরায় সেই ক্ষত্রিয়েরই গুরুস্থানীয় হন। চৈতন্য এবং রামানন্দের মধ্যে এই সম্পর্কই ছিল।"[৫৭]

চৈতন্য সাধ্যের নির্ণয় জানতে চাইলে রামানন্দ রুচিভেদে এবং প্রকৃতিভেদে পোষণীয় বিভিন্ন সাধ্যবস্তুর ক্রমোন্নতিক্রমে উল্লেখ করলেন—স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বললেন, এগুলি সাধ্যবস্তু নয় সাধনপ্রক্রিয়া, উপরন্তু

অপবর্গ প্রভৃতি সাধকের স্বার্থও জড়িত আছে, সুতরাং চৈতন্য "এহো বাহ্য" বলে স্বভাবতঃই সবগুলিকে পরিত্যাগ করলেন। তিনি সর্বধর্মত্যাগরূপ শরণাগতিকেও অনুমোদিত করলেন না কারণ মানুষ দুঃখনিবৃত্তির জন্য শরণাপন্ন হয় সুতরাং এও শুদ্ধাভক্তি নয়, স্বার্থজড়িত। তখন রামানন্দ নাম করলেন জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি, দাস্য-প্রেম, সখ্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম, এগুলিকে চৈতন্য গ্রহণ করলেন "এহো হয়" বা "এহো উত্তম" ব'লে, এগুলি সাধ্য-ভক্তি ব'লে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে স্বীকৃত। যতক্ষণ কৃষ্ণসেবা-বাসনার সম্যক বিকাশ হয় নি ততক্ষণ চৈতন্য বলেছেন "এহো বাহ্য", এর বিকাশের সূত্রপাতে অর্থাৎ প্রেমভক্তির কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন "এহো হয়", এবং বিকাশের চরমত্বে বলেছেন "এহোত্তম"। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে আগে তত্ত্ব জেনে বস্তুবিচার করে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলব্ধ সব ধারণার ফলে ভক্তির উদ্ভব হয়, কিন্তু যেখানে ভক্তি অহেতুক, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াস নাই, সখ্য-বাৎসল্য ইত্যাদি কোনও একটা সম্বন্ধকে অবলম্বন ক'রে উদিত হয়, তেমন ভক্তিকে জ্ঞানশূন্যা বা শুদ্ধাভক্তি বলা হয়।

তখন রামানন্দ কান্তাপ্রেমকেই বললেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাৎসল্য প্রেমের সেবা সম্বন্ধানুগ কিন্তু কান্তাপ্রেমের সেবা প্রেমানুগ। কিন্তু তখনও চৈতন্য জানতে চাইলেন এর আগে কিছু আছে কিনা। রামানন্দ তখন বললেন "ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।"[৫৮] কিন্তু চৈতন্য সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না, ভাগবতের আখ্যান স্মরণ ক'রে তিনি সংশয়িত। কৃষ্ণ রাসস্থলী থেকে একজন প্রধানা গোপীকে গোপনে নিয়ে গেলেন, পরে তাকেও পরিত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হ'লেন। এই প্রধানা গোপী যদি রাধা হ'ন তা হলে তাঁকে চুরি করে নিয়ে পলায়ন চৈতন্যের মনঃপূত হ'ল না, রাধা যদি কৃষ্ণের সর্বস্ব হ'ন তা হলে তাঁর জন্য কৃষ্ণ অন্যদের ত্যাগ করতে পারতেন বিনা সঙ্কোচে লজ্জায়। রাধার যে চিত্র এখন চৈতন্যের মনে ফুটে উঠছে, সে রাধা কৃষ্ণকে একান্ত ক'রে পেতে চান মদীয়তা ভাবের প্রবলতায়। কিন্তু তাঁর সর্বাতিশায়ী প্রেমের যথেষ্ট মান্যতা কৃষ্ণ দেন নি। রামানন্দকে তখন ভাগবত ছেড়ে গীতগোবিন্দের নজির দেখাতে হ'ল, ক্রুদ্ধ রাধা রাসস্থলী ছেড়ে গেলেন কৃষ্ণ গেলেন তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করতে।

সাধ্য-তত্ত্বের আলোচনা শেষ হ'লে চৈতন্য সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন রামানন্দ সখী দ্বারা লীলাবিস্তার ও সখী-আনুগত্যে সাধনার কথা বললেন।[৫৯] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে সব মূলতত্ত্বের উপাদান রামানন্দ রায় যোগালেন তা'র মধ্যে একটি হ'ল সখী-মর্যাদা। সখীরা শুধুই যে লীলায় অংশ গ্রহণ করেন তা-ই নয়, তাঁদের সাহায্যেই লীলার বিস্তার হয়, সখী ভিন্ন লীলা পুষ্ট হ'তে

পারে না। আর কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাসলীলাকে এতখানি প্রাধান্য দিয়ে প্রধানা গোপীকে রাধা এবং অন্য গোপীকে সখীত্বের মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে সর্বক্ষণ লীলাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবার কল্পনা করে নি। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমমিলন নিভৃতে হওয়াই রীতি, বিশ্বসাহিত্যের অনুরূপ ভারতীয় সাহিত্যেও পূর্বাপর সেই প্রথাই প্রচলিত, কিন্তু যেহেতু রাসে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে কৃষ্ণ বহু রমণীর সহিত মিলিত হয়েছিলেন, সেই ঐতিহ্যের অবশেষ থেকে গেছে রাধাকৃষ্ণের মিলনকালে বহু সখীর উপস্থিতির অনুমোদনে।

রামানন্দ রাধার প্রেমকে "সাধ্যশিরোমণি" বলেছেন, অথচ সখীভাবে সাধনাকে ভক্তের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবাকেই সাধ্য বলেছেন।[৬০] এর কতকগুলি কারণ হ'তে পারে। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ রাধা, তাঁর পক্ষে যা সম্ভব সামান্য জীবের পক্ষে তা সম্ভব নয়, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। দ্বিতীয়তঃ ভক্তের চক্ষে চৈতন্যে রাধাভাব স্ফুরিত হয়েছিল, তিনি যখন ভগবৎ-বাচ্য হ'লেন তখন সাধারণ ভক্তের তাঁর সমান অধিকার লাভের যোগ্যতা রইল না। তৃতীয়তঃ সহজিয়া মতে নিজেদেরকে রাধা ও কৃষ্ণভাবে বিভাবিত করাতে ধর্মে যে অনাচার প্রবেশ করেছে তার নিরসন হেতু রাধাভাবে সাধন নিরুদ্ধ হ'ল, সখীভাবে কৃষ্ণসেবাই বিহিত হ'ল। সখীর কৃষ্ণমিলনে বাসনা নাই[৬১], ভক্তের পক্ষেও নিষিদ্ধ।

## প্রেমবিলাসবিবর্ত

রাধার প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার পরেও চৈতন্যের প্রশ্ন শেষ হয় নি, তিনি তখনও বলছেন "আগে কহ আর"।[৬২]

রামানন্দ রায় সখ্য বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের কথা যখন বলেছেন তখন কোনও নির্ধারণ দেন নি যে এ সকল সম্বন্ধ শুধুই কি কৃষ্ণপরিকরদের প্রতি প্রযোজ্য না জীবভক্তেরও সাধনার উপায় হ'তে পারে। যদি এ সব উপায় বা পদ্ধতি পার্থিব ভক্ত গ্রহণ করতে পারেন তা হলে কান্তাভাবের সাধনায় কি শুধুই স্ত্রীলোকের অধিকার না পুরুষ ভক্তও তা অর্জন করতে পারেন? মনে হয় এইটি জানবার জন্যই চৈতন্যের অধীর আগ্রহ এখনও নির্বাপিত হয় নি।

দেবতা এবং উপাসকের সম্বন্ধকে পতি-পত্নী সম্বন্ধরূপে দেখবার চেষ্টা আছে ঋগ্বেদে[৬৩]; অবশ্য সেটা উপমাতেই পর্যবসিত, স্ত্রীভাবে ভগবৎ-সাধনার কথা নাই।

স্ত্রীভাবে সাধনার উল্লেখ আছে পুরাণে।[৬৪] রামচন্দ্রকে দর্শন করবার পরে গোপীভাবে ভজন করার নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিদের ইচ্ছা হয়েছিল এবং তাঁরা পরজন্মে গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত

হয়ে কৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। শ্রুতিগণও গোপীভাবের আনুগত্যে সাধনা করেছিলেন। কিন্তু এঁরা ভাবানুকূল চিন্তা দ্বারা পরজন্মে গোপীত্ব লাভ করেছিলেন, ইহজন্মে স্ত্রীভাবে সাধনা করেন নি।

পদ্মপুরাণে[৬৫] কয়েকজন মুনির কাহিনী আছে যাঁরা কৃষ্ণমন্ত্র জপ করতেন এবং রমণীপরিবৃত কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি অনুক্ষণ ধ্যান করতেন। তাঁরা পরজন্মে কৃষ্ণবল্লভা গোপী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কেউই পুরুষদেহে নিজেকে সখী কল্পনা ক'রে মানস চিন্তায় কৃষ্ণের সেবা করেন নি, অবশ্য একজন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি সখীভাবে কৃষ্ণসেবা করছেন।

স্ত্রীভাবে আরাধনার তত্ত্ব আরও একটু অগ্রসর হয়েছে ৪৩ অধ্যায়ে, অর্জুন যখন কৃষ্ণের সহিত গোপীদের লীলার গোপন তত্ত্ব জানতে চাইলেন তখন অর্জুনের দেহকে রমণীদেহে পরিবর্তিত করা হ'ল এবং রমণীরূপে তিনি কৃষ্ণের অন্তরতম বিলাসলীলা দর্শনের অধিকারী হ'লেন। এমন কি স্ত্রীরূপী অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ বিহার করলেন। ৪৪ অধ্যায়ে নারদেরও এইরূপ পরিবর্তন হ'ল।

গৌড়দেশের ভক্তিধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় চৈতন্যের কিছু পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরি রাগ-প্রচুর ভক্তির প্রচার করেছিলেন।[৬৬] চৈতন্য-ভাগবত বলেন[৬৭] তিনি বঙ্গদেশে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার, কবিকর্ণপূর বলেন[৬৮] তিনি প্রীত-আদি নানাভাব-সম্বলিত বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু তিনিও স্ত্রীভাবে আরাধনার কথা বলেছেন ব'লে জানা নাই। বৈষ্ণব গোপীনাম উচ্চারণ করছে শুনে নগরের লোকের অদ্ভুত লেগেছিল[৬৯], গোপীভাবে সাধনা ত দূরের কথা। অতএব মনে করা যেতে পারে চৈতন্যের পূর্বে পুরুষের কান্তাভাবে কৃষ্ণ সাধনা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না।

দক্ষিণদেশের আড়ওয়াররা ছিলেন বেশ কয়েক শতাব্দী আগে, তাঁদের মধ্যে পুরুষদের স্ত্রীভাবে বিষ্ণু-আরাধনার কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পরে চৈতন্য দক্ষিণে গিয়েছিলেন, আগে নয়। উত্তরপ্রদেশে কবীর স্ত্রীভাবে নির্গুণ রামের সাধনা করেছেন, কিন্তু আলোচ্য সময়ের পূর্বে চৈতন্য পশ্চিমে যান নি। বল্লভাচার্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে পুরুষের স্ত্রীভাবে উপাসনা সম্মত কিন্তু তখনও বল্লভাচার্যের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয় নি।

কান্তাভাবে রাধাভাবে সাধনার জন্য চৈতন্যের মনপ্রাণ আকুল অথচ তিনি কোনও সমর্থন পাচ্ছেন না, গুরু তাঁকে এ বিষয়ে কোনও উপদেশ দেন নি। তাই তাঁর প্রশ্নের নিবৃত্তি নাই।

এতক্ষণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নানাবিধ গ্রন্থ থেকে প্রমাণোক্তি ক'রে রামানন্দের বক্তব্য দৃঢ় করেছেন, যেগুলি রামানন্দের পূর্বেকার রচনা সেগুলি হয়ত রামানন্দ নিজেই আবৃত্তি ক'রে থাকবেন, কিন্তু এখন তিনি স্বরচিত একটি পদ গাইলেন যা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত-

সূচক। পদটি এই—

পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥
এ সখি, সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জানি (জনি?)॥
না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজনু আন্।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥৬৯ক

পূর্বরাগের উদয় হ'ল প্রথম নয়নভঙ্গীতে বা চক্ষের চাহনি বিলাসে, সেই (রাগ) দিনে দিনে বাড়ল, তার শেষ পাওয়া গেল না। না সে রতিনায়ক পুরুষ না আমি রমণী, (তবুও) মনে হ'ল যেন দুজনের মন কন্দর্প-পিষ্ট। হে সখি, সেই সব প্রেমকাহিনী কানুকে বল্‌বে, যেন ভুলো না। (কোনও) দূতীকে খুঁজি নি, আর কা'কেও খুঁজি নি, আমাদের দুজনের মিলনে মধ্যস্থ কন্দর্প। এখন সে অনুরাগশূন্য (সে কারণে) তোমাকে দূতী হ'তে হয়েছে, সুপুরুষের প্রেমের এই রীতিই (বটে)। প্রতাপরুদ্র মহারাজ কর্তৃক বর্ধিতমান কবি রামানন্দ রায় বর্ণনা করছেন।

বিবর্তের সাধারণ অর্থ ভ্রম কিন্তু প্রেমবিলাসবিবর্তের ব্যাখ্যায় টীকাকাররা আরও দুটি অর্থের আশ্রয় নিয়েছেন, "বৈপরীত্য" এবং "পরিপক্কতা", এবং এই সব দূরান্বিত উদ্ভাবিত অর্থের প্রয়োগে বিষয়টিকে দুরূহ করেছেন। তাঁদের অবধারণা এই যে বিলাসের চরম অবস্থায় নায়ক-নায়িকার যে তন্ময়তা জন্মায় তা'তে বিলাস সুখ ব্যতীত আর কোনও অনুভূতি আর কোনও স্মৃতি তাঁদের মনে থাকে না, তখন আত্মবিস্মৃতির কারণে ভ্রান্তিবশতঃ তাঁদের মধ্যে ব্যবহার বৈপরীত্য দেখা যায়। তাঁরা বলেন এই বিপরীত-চেষ্টাই "না সো রমণ না হাম রমণী"র গূঢ় অর্থ এবং এইটাই প্রেমের চরম পরিপক্ক অবস্থা। শুধু সম্ভোগকালেই নয় অন্য সময়েও দেখা যায় দূতী প্রেরণ বিষয়ে, অভিসারে বা স্বাধীন ভর্তৃকার আচরণে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে নারী, তখন পুরুষ-রমণীর ভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই গীত শুনে "প্রভু কহে সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়/তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়।"৭০ রাধাকৃষ্ণের বিপরীত বিহার বা বিপরীত আচরণ চৈতন্যের মতে চরম সাধ্যবস্তু মনে করলে চৈতন্যের অপ্রতিম কৃষ্ণভক্তিকে অবমাননা করা হয়।

রামানন্দ রায়ের কবিতার ভাবদ্যোতনা কবিকর্ণপূর প্রকাশ করেছেন সংস্কৃত শ্লোকে। মথুরায় রাজসিংহাসনে আসীন কৃষ্ণকে রাধার দূতী বলছেন—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি-
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রংকিমপরম্।"[৭১]

সেদিন (অর্থাৎ ব্রজে মিলন সময়ে) আমি কান্তা তুমি কান্ত এরূপ ধারণা (আমাদের মধ্যে) ছিল না, তুমি-আমি এইরূপ (ভেদজ্ঞান-সূচক) মনোবৃত্তি তখন বিলুপ্ত ছিল, আজ তুমি ভর্তা আমি ভার্যা (এই মনেভাব) উদিত হয়েছে, তবুও যে আমার প্রাণ আছে এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে। এই উক্তিকে মনে করা হয়েছে রামানন্দ রায়ের পদের সমান্তরাল সুব্যক্তি। এখানে যে পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা এই যে এখন যেমন কৃষ্ণ রাজা রাধা গোয়ালিনী, কৃষ্ণ ভর্তা পালক পোষক আর রাধা ভৃত পালিত, বৃন্দাবনে সেরকম পার্থক্য ছিল না। পুরুষ রমণীর প্রভেদ বিলুপ্তির কোনও ইঙ্গিত এখানে নাই। এই ভাবটি ব্যঞ্জিত হয়েছে আর একটি শ্লোকে যেটি সম্পূর্ণ প্রাকৃত, কোনও ধর্মমতের সঙ্গে সংশিষ্ট নয়—

"তথাঽভূদস্মাকং প্রথমমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততো নু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্।[৭১ক]

প্রথমদিকে আমাদের দুজনের দেহ অভিন্ন ছিল, তারপরে তুমি হ'লে প্রিয় আর আমি হ'লাম তোমার আশাহতা প্রিয়তমা, এখন তুমি হয়েছ নাথ আমি তোমার স্ত্রী, না জানি পরে কি আছে। আমার প্রাণ কুলিশ কঠোর বলেই এই ফললাভ করলাম। এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে দুজনের সম্বন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা, তৃতীয় পংক্তিতে স্বামী-স্ত্রী। তা হলে তারও আগে প্রথম পংক্তিতে বর্ণিত সময়ে দুজনের কি সম্বন্ধ ছিল? যখন তারা প্রেমিক-প্রেমিকা এবং স্বামী-স্ত্রী তখন দুজনের সহবাস হয়েছে, তা হলে মনে করতে হয় তার আগেকার সেই অবস্থাই বর্ণনা করা হয়েছে যখন দুজনে প্রেম-বিগলিত অথচ সঙ্গম হয় নি। শুধু এমন অবস্থাতেই অর্থাৎ বিচ্ছেদ অবস্থাতেই ভেদের প্রশ্ন ওঠে না সুতরাং অভিন্ন বা একপ্রকৃতির বলা চলে।

বিশিষ্ট ভারতীয় কল্পনায় জ্ঞানের চরম স্তরে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদলুপ্তি হয়ে যায়, জ্ঞান শুদ্ধরূপে অদ্বিতীয়-তত্ত্বে অবস্থান করে। একটা সম্ভাবনা এই যে এরই অনুকরণে প্রেমবিলাসবিবর্তের উদ্ভাবন, যেখানে প্রেমিক প্রেমাস্পদ ও প্রেম এই তিনের ভেদবিলুপ্তি,

হ'য়ে একমাত্র প্রেমভাবের একত্বে পেষিত হয়। বোধ হয় এই থেকেই রূপ গোস্বামী রূঢ়-মহাভাবের লক্ষণ নিয়েছেন "মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি সর্ববিস্মরণম"[৭২] মূর্ছাদির অভাবেও সমস্ত ভুলে যাওয়া, সকল পার্থক্য-জ্ঞানের লোপ হওয়া।

এই প্রসিদ্ধ পদের গঠনশৈলী অনুশীলন করলে রচয়িতার অভিপ্রায়ের সামান্য আঁচ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা সম্যক হবে না। তা হলে একমাত্র সাধিত্র যা আমদের আয়ত্তে রইল সেটা ফলাফল অনুধাবন করা এবং ফলতঃ কি পরিবর্তন এল তার বিচার করলে কারণ-স্বরূপ পদটির প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটন সম্ভব হ'তে পারে।

এই পদের প্রথম সাতটি পংক্তিকে পূর্বরাগের অবস্থা-বর্ণনা ব'লে মনে করা যেতে পারে, কারণ দূতীর উপযোগিতা মিলনের পূর্বেই হ'য়ে থাকে, পরে ক্বচিৎ। মানের পরে বা অন্য অভিযোগ জানাতে দূতী প্রেরণ করা হয় বটে যেমন এখন নায়িকা করছেন কিন্তু এখানে সপ্তম পংক্তির দূতী প্রসঙ্গ স্পষ্টতঃই মিলন-পূর্ব পর্বের। এই পংক্তিতে দূতীর কথা আছে অতএব এ পর্যন্ত পূর্বরাগের কথা। অষ্টম পংক্তিতে "মিলন"-এর উল্লেখ আছে অতএব মনে করা যেতে পারে যে মিলন হয়েছিল, অবশ্য দৈহিক মিলন কিনা তা বিশদ নয়। উপান্ত দুটি পংক্তি আক্ষেপানুরাগের। এটা মাথুর বিরহের পদ নয়, সে রকম কোনও ইঙ্গিত নাই, ইশারা আছে অবহেলার, নিঃসন্দেহ এটি নায়ক-উপেক্ষিত বিরহিণীর উক্তি হয়ত সাময়িক বা অনতিদীর্ঘ বিরহের। সুতরাং "না সো রমণ না হাম রমণী" পূর্বরাগের সময়ের কথা, নতুবা একদিকে নিমেষের মধ্যে অনুরাগ-সৃষ্টি এবং অন্যদিকে দূতী প্রেরণের কথা—এই দুটি পূর্বরাগের ভাবগঠিত পংক্তির মাঝখানে মিলনাবস্থার কথা অসঙ্গত মনে হয়। অতএব ব্যঞ্জনা এই যে পূর্বরাগের অবস্থায় যখন রমণ-রমণী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি, মিলন হয় নি, তখনই আমাদের দুজনের মন কন্দর্প-পিষ্ট হ'য়ে এক হয়েছিল।

রাধামোহন ঠাকুর ব্যাখ্যায় বলেছেন নায়িকার উক্তির মর্ম এই যে তিনি পতি ন'ন আমিও তাঁর পত্নী নই তথাপি আমাদের উভয়ের মন কন্দর্প পেষণ ক'রে দিয়েছেন; ভাবার্থ এই যে বিবাহ-বন্ধন না থাকা সত্ত্বেও আমরা দুজনে প্রেমের আকর্ষণে নিবিড় হ'য়ে এক হয়ে ছিলাম। কিন্তু রমণ ও রমণী পতি-পত্নীর বিবাহিত সম্বন্ধ বোঝায় না, স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ বোঝায়, সুতরাং উক্তিটিকে এই অর্থে নিতে হবে যে আমাদের দুজনের মধ্যে দেহ-সম্বন্ধ না থাকলেও আমরা মানসে একীভূত হয়েছিলাম।

কিন্তু এমন হ'তে পারে যে কবি পূর্বরাগ-মিলন-বিরহের ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন নি, তৃতীয়-চতুর্থ পংক্তি মিলন-অবস্থার দ্যোতক। এই কবি-স্বাধীনতা মেনে নিলে এই দুটি পদের অর্থ-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত বিচার করতে হয়। "না সো রমণ

না হাম রমণী"—এতে কোনও ক্রিয়াপদ নাই, যদিও স্থানাভাব নাই, এই পংক্তিতে মোট ১১ অক্ষর, অন্য পংক্তিগুলিতে ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত অক্ষর আছে। পরের পংক্তিতে "পেশল"র অর্থ পেষণ করিলও হয়, আবার বিশেষণার্থে পিষ্টও হয়, শেষের অর্থে মনোভব-পেষল বা মনোভব-পিষ্ট নিলে এ পংক্তিতেও কোনও ক্রিয়াপদ নাই। অতএব ক্রিয়াপদের অভাবে এ দুটি পংক্তির ভাব-প্রয়োগ-কাল হয় বর্তমান কাল অর্থাৎ রাধিকা যে সময়ে বলছেন সেই বিরহ-কাল, আর নয় চিরকাল অর্থাৎ সর্বকালে প্রযোজ্য। মিলন-কালে সম্ভোগ কালে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না, কারণ এটা দৈহিক-মানসিক ব্যাপার, দেহগত ক্রিয়াগত প্রভেদ স্ত্রী-পুরুষে চির বর্তমান, তা'কে বিলোপ করবার উপায় নাই, বলা চলে না "সে রমণ নয় আমি রমণী নই।" বিপরীত বিহারের অর্থগ্রহে টীকাকাররা যে ভেদবিলুপ্তির ব্যাখ্যা করেছেন সেটা তৃণখন্ড অবলম্বনে স্রোতস্বতী পার হওয়ার চেষ্টা, এক রজনীর স্বল্পকালের চিত্র-বৃত্তি-ব্যাবহারে জীবজগতের মৌলিক পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যাবে এ ধারণা দুর্গ্রাহ্য।

অক্ষরচ্যুতির কারণে তৃতীয় পংক্তি পঙ্গু, কিন্তু লুপ্ত অক্ষরগুলি যে কি ছিল তা নির্ধারণ করবার উপায় নাই, আপন সুবিধামত কল্পনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক পদটি ছিল "না সো রমণ ( রহু ) না হাম রমণী" কিম্বা "না সো রমণ (হোয়ত) না হাম রমণী" তখন সাধারণ অর্থ এই হবে যে অনুরাগের চিরবৃদ্ধিমান অবস্থায় যখন আমাদের দুজনার মন কন্দর্প পিষে এক ক'রে দিলেন তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে পুরুষ নারী ভেদ আর রইল না। অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে আমরা এক হয়ে গেলাম দেহে নয় মনে। যেহেতু এটা মিলনের পূর্বেকার অবস্থা অতএব পুরুষ-নারী প্রভেদের কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয় নি, নিছক নিষ্কলুষ কাব্যালঙ্কার ব'লে আমরা একে গ্রহণ করতে পারি, বিপরীত বিহারের দুর্জ্ঞেয় অশ্লীল ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে।

অন্যদিকে বিপ্রলম্ভ অবস্থায়—পূর্বরাগে বা বিরহে—পুরুষের বা স্ত্রীর আকর্ষণ বা মনোভাব বা বিলাস সম্পূর্ণ মানসিক, মনের গঠনে স্ত্রী-পুরুষের যেটুকু প্রভেদ তা লুপ্ত হয়ে যায়, প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষা পুরুষের যেমন স্ত্রীরও তেমনই, সুতরাং বিচ্ছেদের অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের ভেদ-অপনয়ন অকল্পনীয় নয়। বিলাসের অর্থ শুধু কেলি নয়, যে কোনও সুখের আতিশয্য ও তা'তে নিমজ্জন। কল্পনা বিলাস বলে একটি কথা আছে, এ শুধু মনের বিলাস, কেলির সঙ্গে অর্থান্বিত নয়, তাম্বুল-বিলাস প্রভৃতি বিবিধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। পদকর্তারা এক শ্রেণীর পদরচনা করেছেন যাকে বলা হয় ভাবসম্মেলন, বিরহাবস্থায় নায়িকা কল্পনা করছেন যে মিলন হয়েছে, এবং মিলনানন্দে আত্মহারা, মিলনের এই বিভ্রমকেও প্রেমবিলাসবিবর্ত

বলা যেতে পারে। যেখানে অপরের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বস্তুবিষয় নয় কল্পনার বিষয় সেখানে তিনি পরুষ কি নারী এ প্রশ্ন অবান্তর, প্রেমবিলাসবিবর্তের মজ্জাবস্তু প্রেমের চরমোৎকর্ষ অবস্থায় ভ্রান্তি। যখন আকর্ষণ উভয়তঃই প্রবল এবং মনোবাসনা এমন তীব্র যে এইটাই তাঁদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয়, এবং এহ তন্ময়তার আত্মবিস্মৃতির কারণে উভয়েই ভাবমাত্রৈক-পর্যবসিত তখন পুরুষ-নারী ভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত। এটা ঘটতে পারে যেখানে প্রেম-সম্পর্কটা শারীরিক নয় শুধুই মানসিক, যেখানে মানস-উল্লাসে কোনও শরীর-কার্য অংশীদার নয়, অথাৎ একমাত্র বিচ্ছেদের অবস্থায়। দুটি হৃদয় এক করতে হ'লে—দুখন্ড লোহার সঙ্গেহ উপমিত হোক বা দুখন্ড লাক্ষার সঙ্গে—তাপের প্রয়োজন হয় এবং এ তাপ আসে বিচ্ছেদ থেকে। যক্ষ তার সঙ্গে তাঁর প্রেয়সীর অবস্থা তুলনা ক'রে বলেছে যে কোনও প্রভেদ নাই, দুজনেই সমস্বভাব, "অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা"৭৩—এও বিরহাবস্থার কথা। যখন দেহমিলনের কোও প্রশ্ন নাই তখন দেহের দিক থেকে সত্যই বলা যায় "না সো রমণ না হাম রমণী", মনের দিক থেকেও এমন কথা বলা যায় কারণ তীব্র আকর্ষণ স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে সম্ভব, প্রকারে বা পরিমাণে কোনও প্রভেদ নাই, আলঙ্কারিকরা বিরহের দশ দশা বর্ণনায় স্ত্রীপুরুষে কোনও প্রভেদ করেন নি। কৃষ্ণের অবর্তমানে গোপীরা কৃষ্ণের কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন৭৪ নিজেদেরকে পুরুষ কল্পনা ক'রে, কৃষ্ণের সাক্ষাতে এমনটি করেন নি। যেখানে সবটাই কাল্পনিক সবটাই দূরের সেখানে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের সার্থকতা কোথায় ? আমাদের পুরাণে চাঁদ পুরুষ, পাশ্চাত্য-কল্পনায় স্ত্রীলোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না চাঁদ সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও স্ত্রী বা পুরুষ চাঁদের প্রেমে পড়তে পারেন। বৌদ্ধ দেবতা মঞ্জুশ্রীর আগে নারী কল্পনা ছিল পরে পুরুষ কল্পনা হ'ল। কোনও পুরুষ গৃহ-পরিবারে স্ত্রীবেশে থাকেন না, স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার করেন না, কিন্তু স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় স্ত্রী বেশে অভিনয় করতে পারেন, রতিবিলাপজাতীয় কিছু লিখবার সময়ে কল্পনা করেন যে স্বামীহারা হয়েছেন।

চৈতন্য তরুণ বয়সে নারী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, হয়ত তখনই তাঁর গোপন মনে রাধাভাবে সাধনার বাসনা প্রচ্ছন্ন ছিল কিন্তু প্রকাশ পায় নি। ঈশ্বর-আবেশ যখনই এসেছে তখন অধিকাংশই দেবের আবেশ, দেবীর ভূমিকা খুব কম। চৈতন্যের কালে স্ত্রীভাবে উপাসনা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল ব'লে জানা নাই, চৈতন্যের দ্বিধা ছিল তিনি পুরুষ হ'য়ে স্ত্রীভাবে সাধনা করতে পারেন কিনা। তিনি জানতেন কৃষ্ণের সহিত মিলন এ জীবনে সম্ভব নয়, রামানন্দের পদে বিরহিণী রাধার প্রতিকৃতিতে নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব পেলেন।

তিনি জানলেন বিরহাবস্থায় কন্দর্পের পেষণে পুরুষ-রমণীর ভেদ ঘুচে যায়, "না সো রমণ না হাম রমণী" রামানন্দের এই উক্তি আশ্বাস বহন ক'রে আনল চৈতন্যের কাছে তিনিও তা হলে রাধাভাবে উপাসনা করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ চৈতন্য জানলেন যেখানে প্রেম একাগ্র অপ্রতিরোধ্য সেখানে দূতীর আবশ্যক নাই, মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই, তিনি যদি রাধাভাবে সাধনা করতে চান তারজন্য গুরুর আনুগত্যের বা দীক্ষার বা কারও কোনও নির্দেশ সহায়তার প্রয়োজন নাই, তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে দায়িত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। দীক্ষাগুরু, মন্ত্রগুরু কারও কাছেই এ বিষয়ে কোন নির্দেশ পান নি বলেই বোধ হয় চৈতন্যের দ্বিধা ছিল, এখন প্রত্যয়িত হ'লেন যে এ বিষয়ে তাঁর নিজের মনোগতিই যথেষ্ট, অপর কারও নির্দেশের আবশ্যক নাই। সত্য উৎসাহ দিয়ে সঙ্কটমোচন ক'রে চৈতন্যের অভীপ্সিত পথে প্রতিষ্ঠিত করলেন কেশব ভারতী নয়, ঈশ্বর পুরী নয়, রামানন্দ রায়।

## চৈতন্যের নিষেধ

রামানন্দের পদটি শুনে চৈতন্য রামানন্দের মুখ আবৃত করলেন।[৭৫] এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারে, একটি এই যে রামানন্দের গীত এমন কোন গর্হিত বিষয়ের ইঙ্গিত করেছিল যা চৈতন্যের কাছে বিকর্ষী। এ সিদ্ধান্ত অচল কারণ চৈতন্য অন্যত্র স্পষ্টই বলেছেন তিনি রামানন্দের মতবাদের অনুমোদক। লক্ষ্য করবার বিষয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পদের কোনও ভণিতা দেন নি, ভণিতা পাওয়া যায় কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ভণিতাটি এইরূপ—

"বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান
রামানন্দ রায় কবি ভাণ।"

রাজনামাঙ্কিত পদ চৈতন্যের সামনে আবৃত্তি করা অশোভন, হয়ত কৃষ্ণদাস এই মনে করেছেন, যাই হোক, কৃষ্ণদাসের অভিপ্রেত নয় এই ভণিতা উদ্ধৃত করা, তাই মুখোমুখী সময়ে তিনি চৈতন্যের হাত দিয়ে রামানন্দের মুখ রোধ করালেন। এটি একটি কবি-কৌশল।

কিন্তু তত্ত্ববাদীরা অন্য যুক্তি দেন। তাঁদের মতানুকূল তত্ত্ব এই যে রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করলেন চৈতন্য, যাতে চৈতন্যের নিজের স্বরূপ তত্ত্বটি প্রকাশিত হ'য়ে না পড়ে। চৈতন্য রাধা ও কৃষ্ণের নিবিড়তম-মিলিত-রূপ, যুগল-বিগ্রহ, এবং রামানন্দের গীতে পুরুষ-রমণীর প্রভেদহীন এক-মনোভাবের কথা আছে, অতএব রামানন্দের গীতব্যাখ্যানে চৈতন্যের তত্ত্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে পড়ে এই তাঁর ভয়,

কারণ তখনও তার সময় আসে নি। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক এ কারণে যে চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা অনুযায়ী[৭৬] চৈতন্য নিজেই এই যুগলরূপ রামানন্দকে দেখিয়েছিলেন। অতএব এ যুক্তি অগ্রাহ্য।

আর একটি সম্ভাবিত ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে রামানন্দ এমন এক রহস্যের ইঙ্গিত করলেন যা চৈতন্যের সংগুপ্ত ঈপ্সায় ছিল অথচ দ্বিধান্বিত মনের সঙ্কোচ হেতু প্রকাশ করতে পারছিলেন না, এখন রামানন্দের গীতে তার আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে বিহ্বল হ'লেন, আর পিছু শুনবার তাঁর প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য রইল না। চৈতন্যের পরমকাম্য রাধাভাব যে শুধুই নীতিসঙ্গত ও নির্দোষ নয় সাধনার সার, রামানন্দ উৎকর্ষ-ক্রমে সেই কথাই বললেন, চৈতন্যের আর কিছু জ্ঞাতব্য রইল না। একজন তত্ত্ববেত্তা ও রসজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে চৈতন্য এই প্রথম শুনলেন যে বিপ্রলম্ভ অবস্থায় পুরুষ-নারী নির্বিশেষে দুজনের মন বিরহের সন্তাপে এক ক'রে দেওয়া যায়, যদি প্রেম সে জাতীয় হৃদয়-প্রবাহিণী হয়। তিনি নিজে পুরুষ হ'য়ে রমণীভাবে সাধনার সমর্থন পেলেন এবং হর্ষের উত্তেজনার প্রাবল্যে রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন। এই বাক্যালাপ হচ্ছিল "রহঃস্থানে"[৭৭], বোধহয় অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না সুতরাং রামানন্দের মুখ আবৃত করার এ উদ্দেশ্য ছিল না পাছে অন্য কেউ শুনে ফেলে, শুধু আনন্দের আতিশয্যেই চৈতন্য এমনটি করেছিলেন।

## বিবর্তন-সন্ধিক্ষণ

চৈতন্যের জীবনে অভাবিত পরিবর্তন এল গয়ায় গিয়ে। সেখানে তিনি ঈশ্বর পুরীর নিকটে গোপীজনবল্লভোপাসনার মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেন। যাবার আগে ছিলেন উদ্ধত, পাণ্ডিত্যাভিমানী, পরিহাস-প্রিয়, চপল স্বভাব, ক্ষতিকর-রসিকতায় অভ্যস্ত; ফিরে এলেন তখন কৃষ্ণদর্শনাতুর করুণ চিত্ত, দৈন্যের প্রকট বিগ্রহ, কৃষ্ণভক্তের সঙ্গকামী, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-ত্যাগী, সংসারে বীতস্পৃহ। গয়া থেকে বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন দৈববাণী শুনলেন ফিরে যাও, তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ, তুমি জীব উদ্ধারার্থে অবতীর্ণ হয়েছ।[৭৮]

নবদ্বীপে এসে ভক্তির আবেশে চৈতন্যের নানারূপ ভাবের উদয় হ'তে লাগলো, কখনও কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাব[৭৯], কখনও ভক্তের প্রতি দীনভাব[৮০], কিন্তু যে ভাবটি ছিল প্রবল ও বিস্তারিত সেটা ঈশ্বরভাব। বিষ্ণু খট্টায় নিজেই বসলেন কারও অনুরোধে নয়, এবং ভক্তদের বললেন তাঁর অভিষেক করতে, বললেন তিনি অদ্বৈতের আহ্বানে বৈকুণ্ঠ থেকে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন[৮১], অদ্বৈতের পূজা পেয়ে তাঁর মাথায় পা রাখলেন[৮২] এ সবে বৈষ্ণবোচিত দীনতার

কোনও প্রকাশ নাই। নবদ্বীপলীলায় ঈশ্বরভাবে বিভাবিত হওয়াই ছিল চৈতন্যের বিলাস, ভক্তভাবে গোপীভাবে রাধাভাবে আত্মপ্রকাশ নাই, নিজের মাহাত্ম্য প্রচারে কোনও কুণ্ঠা নাই।

নবদ্বীপলীলার শেষ দিকে—
"একদিন গোপীভাবে জগৎ ঈশ্বর
'বৃন্দাবন' 'গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর।"[৮৩]

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেছেন। মনে হয় এটিও ঈশ্বরভাব, গোপীভাবে সাধনার স্পৃহা নয়, চৈতন্য এখানে গোপীজনবল্লভ রূপে ঈশ্বরভাবে বিভাবিত হ'য়ে গোপীদের সঙ্গ কামনা করছেন এবং কৃষ্ণের নাগরভাবের সাফল্যে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছেন।

যেখানে অন্য নায়িকার প্রতি অনুরাগ হেতু রাধাকে বা অন্য গোপীকে কৃষ্ণ অবহেলা বা বঞ্চনা করেছেন সেখানে উপেক্ষিতার ভাষা অন্য রূপ, হয় নিজের ভাগ্যের জন্য বিলাপ করেছেন নয় লম্পট প্রভৃতি শব্দে কটুকাটব্য করেছেন। কিন্তু এখানে চৈতন্যের ভাষা ভিন্ন, তিনি বলেছেন কৃষ্ণ বলির প্রতি অবিচার করেছেন, স্ত্রীলোকের (শূর্পনখার) নাক কান কেটেছেন, বঞ্চিতা রমণী এমন ভাষা ব্যবহার বা এমন দোষারোপ করেন না। এ দয়িতের প্রতি ক্রোধ নয়, অন্য নাগরের প্রতি ঈর্ষা।

নবদ্বীপবাসের প্রবল ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গে নীলাচল যুগে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ এবং তার বিপরীতে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার তুলনা করলে দেখা যায় চৈতন্যের সার্বিক পরিবর্তন। নবদ্বীপে থাকতেই নিজের নামে কীর্তন গাওয়ায় ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন[৮৪] সেটা প্রবলভাবে প্রকাশ পেল নীলাচলে[৮৫], কোনও ভক্ত তাঁকে কৃষ্ণজ্ঞান করলে তিনি বিষ্ণুনাম স্মরণ করে ক্ষমাপ্রর্থনা করতেন এবং নিষেধ করতেন[৮৬], নিজের স্তুতি শুনে আপত্তি করতেন।[৮৭] রামানন্দ রায় এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী যখন চৈতন্যের আকৃতিতে কৃষ্ণরূপ দেখলেন তখন চৈতন্য বললেন প্রকৃত ভক্ত সর্বত্রই কৃষ্ণদর্শন করেন।[৮৮]

সারা জীবনে চৈতন্য ঈশ্বর, অবতার ও নানাজনের ভাবপ্রকাশ করেছেন, চরিতকাররা এমন কথা বলেন। কখনও বা বেশধারণ করেছেন যেমন রুক্মিণীর বা গোপবালকের, কখনও কারও আবেশ এসেছে। কিন্তু যখন চরিতকার বলেন নৃসিংহ মূর্তি বা চতুর্ভুজ মূর্তি প্রকাশ করেছেন তখন তাকে ভক্তের বিশ্বাস-দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনও প্রাকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যাই হোক চরিতকার যেমন লিখেছেন সেইমত বেশ-আবেশ-মূর্তির একটা যৌথ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

| | চৈতন্য-ভাগবত | চৈতন্য-চরিতামৃত |
|---|---|---|
| ঈশ্বরভাব | ১/১২/৭৬ | |
| কৃষ্ণে বাৎসল্য ভাব কিম্বা পিতৃসম্ভ্রম | ১/১৭/১১৬/ ১১৭, ১১৯, ১২৮ | |
| দাস্যভাব | ২/১/৯১ | |
| পাষন্ড সংহারী ঐশ্বর্য ভাব | ২/২/৮৬ | |
| বৈকুণ্ঠ-স্বামী ঈশ্বরভাব | ২/২/২৬৩, ২৬৪ | |
| বরাহ | ২/৩/২৩ | ১/১৭/১৯ |
| হলধর | ২/৩/৫১ | |
| | ২/৫/৩৮ | ১/১৭/১৬ |
| নিত্যানন্দকে ষড়ভুজ মূর্তি দর্শায়ন | ২/৫/৯২ | ১/১৭/১২ |
| বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন | ২/৬/৬২ | ১/১৭/১১ |
| মহাদেব | ২/৮/৯৯ | ১/১৭/১০০ |
| কৃষ্ণভাব | ২/৮/২৮৬ | |
| | ২/৯/১৯০, ১৯১ | |
| দাস্যভাব | ২/৮/৩১৪, ৩১৫ | |
| অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শায়ন | ২/২৪/৫০, ৫১ | ১/১৭/১০ |
| নিত্যানন্দকে চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ মূর্তি দর্শায়ন | | ১/১৭/১৪, ১৫ |
| অভিষেক ও সাত প্রহরিয়া ভাব | ২/৯/১৯ | ১/১৭/১৮ |
| রঘুনাথ | ২/১০/৭ | |
| নৃসিংহ | | ১/১৭/৯২ |
| চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি | ২/১৩/১৯৬ | |
| | ২/২০/৭৯ | |
| রুক্মিণী ও আদ্যাশক্তির বেশ | ২/১৮ | ১/১৭/২৪১ |
| পুনরায় বলরাম ভাব | ২/২১/৩২ | ১/১৭/১১৮ |
| | ২/২৬/৬৬ | |
| ঈশ্বরভাবে কৃষ্ণ বিদ্বেষ | ২/২৪/১৬-১৯ | ১/১৭/২৪৭ |
| | ২/২৬/৯১-৯৩ | |
| গোপ বেশ | | ২/১/১৪৬ |
| কৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাব, পিতৃসম্ভ্রম | ৩/১/৮০ | |
| সর্ব-অবতার ভাব | ৩/১/২৫১ | |
| সার্বভৌমকে ঈশ্বরমূর্তি, ষড়ভুজ চতুর্ভুজ মূর্তি, বংশীমুখ দর্শায়ন | ৩/৩/১০০ | ২/১/১০১<br>২/৬/২০২, ২০৩ |

| | চৈতন্য-ভাগবত | চৈতন্য-চরিতামৃত |
|---|---|---|
| রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ | | |
| রসরাজ-মহাভাব রূপ | | ২/৮/২৮২ |
| চতুর্ভুজ মূর্তি | | ২/১০/৩৩ |
| ঐশ্বর্য প্রকটন | | ২/১১/২২৯, ২৩০ |
| প্রতাপরুদ্রকে ঈশ্বর-মূর্তি দর্শায়ন | | ২/১৪/১৯ |
| শেষ-শায়ী লীলা | | ২/১৪/৮৯ |
| রাধামূর্তি | | ২/১৪/২৩৫ |
| গোপবেশ | | ২/১৫/১৭ |
| হনুমান-আবেশ | | ২/১৫/৩৩ |
| কৃষ্ণের আসনে উপবেশন | | ২/১৫/২৩৪, ২৩৬ |
| রাধাভাব | | ৩/১৪/১৪ |
| | | ৩/১৯/৩১, ৯০, ১০৭ |
| গোপীভাব | | ৩/১৫/৩১ |
| | | ৩/১৭/৩২ |

তালিকা থেকে দেখা যায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের আগে ঈশ্বর-ভাব প্রবল, চৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান এ বিশ্বাস তিনি নানারূপে ব্যক্ত করেছেন নির্দ্বিধায়। রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পরেও কয়েকবার ঈশ্বর-মূর্তি প্রকাশ করেছেন কিন্তু তার সঙ্গে কোনও আড়ম্বর হুঙ্কার আদেশ নাই, নিজেকে পূজা করবার আজ্ঞা নাই। শেষের দিকে ঈশ্বর-আবেশ সম্পূর্ণ তিরোহিত, রাধাভাব বা সখীভাবে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকতেন। যে চৈতন্য নবদ্বীপে স্বেচ্ছায় প্রবীণ ভক্তদের মাথায় পা দিতেন, নীলাচলে তিনি নিজের পাদোদক কা'কেও পান করতে দিতেন না।[৮৮ক] রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পরে চৈতন্য তাঁর মনোমত সাধনপন্থা খুঁজে পেলেন এবং রূপকথিত নিখিল গোপীদের প্রেমের বিনির্যাস[৮৯] হয়ে উঠলেন। রামানন্দের সহিত মিলন চৈতন্যের জীবনে দ্বিতীয় জীবন-সন্ধিক্ষণ।

রামানন্দের "না সো রমণ না হাম রমণী" থেকে স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি তাত্ত্বিক হয়ত প্রেরণা পেয়েছিলেন চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার রূপে সিদ্ধান্ত নেবার, কারণ এখানে স্ত্রী ও পুরুষ, রসরাজ ও মহাভাব, আস্বাদ্য ও আস্বাদক—এ সব ভেদ অবলুপ্ত। চৈতন্যের পুরুষ-দেহের অন্তরে যে প্রাণ-পুত্তলি আছে তার স্ত্রীরূপে পরিবর্তন এঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন।

চৈতন্যের অন্ত্যলীলায় কৃষ্ণ-কর্তৃক বঞ্চিতা নাগরীর মনোভাব

প্রবল, কৃষ্ণ যেন তাঁকে উপেক্ষা করছেন। রামানন্দের গীতির "সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি" হয়ত এই ভাবের উদ্রেকে কার্যকরী।

## ব্রহ্ম সংহিতা

চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়ে দুটি পুঁথি এনেছিলেন একটি ব্রহ্মসংহিতা অন্যটি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় তিনি এনেছিলেন। কথিত আছে ব্রহ্মসংহিতা একশত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, কিন্তু বাকি অধ্যায়গুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। জীব গোস্বামী পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা রচনা করেছেন, সটীক ব্রহ্মসংহিতা অন্যান্য গ্রন্থের সহিত বৃন্দাবন হ'তে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন শ্রীনিবাস আচার্য।

পঞ্চম অধ্যায় ৬২ শ্লোকের চটি বই (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনুদিত, বহরমপুর সংস্করণ)। এর প্রথমাংশে ২৮ শ্লোক পর্যন্ত কৃষ্ণ, তাঁর ধাম, অন্য দেবতা, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হয়েছে, তার পরে ৫৬ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের স্তব, ৫৭ থেকে ৬২ শ্লোক ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে ভগবানের উক্তি।

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তাঁর বাস গোকুলে, যা কামবীজে অধিষ্ঠিত। প্রথমে বলা হয়েছে কৃষ্ণের বাস গোকুলে পরে বলা হয়েছে গোলোকে। কৃষ্ণ আত্মারাম, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নাই, অথচ মায়ার সহিত তাঁর বিয়োগও নাই। কৃষ্ণ হ'তে ব্রহ্মা বিষ্ণু শম্ভুর উৎপত্তি হয়েছে। সকল পদার্থের যোজনা ক'রে জগৎ সৃষ্টি ক'রে ভগবান তাতেই প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণের বেণুবাদনই শব্দব্রহ্ম এবং গায়ত্রী। বিষ্ণুরামাদি অংশ বা কলা স্বরূপ, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরমপুরুষ (৩৯, ৪৮), কৃষ্ণ আনন্দচিন্ময়রস স্বরূপ এবং লীলা দ্বারা ত্রিভুবন জয় করেছেন (৪২), ভক্তিমানের কর্মফল দগ্ধ করেন (৫৪)।

কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ (২৪), শ্বেতদ্বীপপতি (২৬), শতসহস্র লক্ষ্মীসেবিত (২৯), বেণুবাদ্যকারী, ময়ূরপুচ্ছশোভিত (৩০), বনমালী, ত্রিভঙ্গ (৩১)—এ সব তাঁর মাধুর্যের বর্ণনা। এরই সঙ্গে আছে ঐশ্বর্য-জ্ঞাপক উক্তি—তিনি পালক পর্যবেক্ষক (৩২), পুরাণ পুরুষ (৩৩), কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনার শক্তি সম্পন্ন অথচ প্রতি পরমাণুতে বর্তমান (৩৫), তিনি অচিন্ত্যতত্ত্ব (৩৪)।

সঙ্কর্ষণের নাম আছে, পঞ্চরাত্রের প্রভাব আছে, বীজমন্ত্রের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনের নাম নাই কিন্তু টীকাকার বলেছেন গোলোক বৃন্দাবনের সহিত অভেদ। আরও বলেছেন অদৃশ্যমান অপ্রকট নিত্যলীলার স্থল গোলোক, দৃশ্যমান প্রকটলীলার স্থল বৃন্দাবন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের কতকগুলি উৎস-সন্ধান এখানে পাওয়া যায়।

"প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী
উদেত্যত্যুত্তমা ভক্তির্ভগবৎ প্রেমলক্ষণা।
প্রমাণৈস্তৎসদাচারৈঃ সদভ্যাসৈর্নিরন্তরং
বোধয়ন্নাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ ॥"(৫৮, ৫৯)

জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা আত্মা প্রবুদ্ধ হ'লে আনন্দময়ী ভগবৎ প্রেমলক্ষণা উত্তম ভক্তির উদয় হয়। (শাস্ত্র) প্রমাণানুসারে, সদাচার পালনে, এবং সদভ্যাস দ্বারা নিরন্তর আত্মতত্ত্ব বোধের দ্বারা (জীব) স্বয়ং উত্তম ভক্তি লাভ করে। এখানে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সাধন ভক্তি ও সাধ্যরূপ-প্রেমভক্তির পার্থক্য সুস্পষ্ট, এবং ভক্তিলাভ করতে হ'লে ভক্তের সাধনাই যথেষ্ট, ভগবানের বা সাধুর কৃপার প্রয়োজন নাই। অন্যত্র আছে (৫৫) সখ্য বাৎসল্য সেব্যভাবে, কামভাবে, মোহভাবে সেবার বিধি, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বনির্ধারণে মূল্যবান। গোবিন্দ বেদ সমুদয়ে দুর্লভ কিন্তু আত্মভক্তিতে সুলভ (৩৩); গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিলাভ করা দুরূহ ব্যাপার।

## শ্রী চৈতন্য

কিছু চরিতকার বলেছেন চৈতন্য অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন এবং সনাতন রূপ প্রভৃতি তত্ত্ববেত্তারা যা রচনা করেছেন সবই চৈতন্যের শিক্ষার ফলে। বর্তমানের কিছু বিশ্লেষক সমালোচক এর সমর্থন করেন না প্রমাণাভাবে।

চৈতন্যের মাতার গর্ভে আট কন্যা জন্মগ্রহণ করে, শৈশবেই তাদের মৃত্যু হয়। নবম সন্তান পুত্র বিশ্বরূপ ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হ'য়ে গৃহত্যাগ করেন। দশম সন্তান চৈতন্য। বালক বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, মৃতবৎসা মাতার একমাত্র পুত্ররূপেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এমন ছেলে পিতামাতার আদরাধিক্যে দুর্ললিত দুর্বিনীত উদ্ধত হবে তা আর বিচিত্র কি! বাপ আদুরে ছেলের পড়া বন্ধ ক'রে দিলেন পাছে অতিমাত্রায় জ্ঞানী হ'য়ে সে-ও সংসার ত্যাগ করে।[৯০] কিন্তু চৈতন্যের আগ্রহাতিশয্যে আবার তাঁকে টোলে ভর্তি করা হ'ল।[৯১] এমন অবস্থায় কোনও ছেলে সাধারণতঃ বিদ্যালাভে কৃতি হয় না। বাল্যে ও কৈশোরে তাঁর কৃষ্ণভজনে অনুরক্তি ছিল না। খুব কম বয়স থেকেই তাঁকে অধ্যাপনা করতে হয়[৯২], বোধ হয় অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে। গবেষকরা অনুমান করেন চৈতন্যের পাঠবস্তু সীমায়িত ছিল কলাপ ব্যাকরণে, হয়ত তার সঙ্গে সামান্য সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র ছিল।[৯৩]

নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল কিন্তু চৈতন্য ন্যায়শাস্ত্র পড়েছিলেন ব'লে মনে হয় না।[৯৪] চৈতন্য শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাদানের চেয়ে কূটতর্ক করতেই ভালবাসতেন, যাকে বলা হয়েছে "ফাঁকি

জিজ্ঞাসা"[৯৫]। সে যুগে নবদ্বীপে পড়া সাঙ্গ হ'লে উপাধি দেওয়ার নিয়ম ছিল, চৈতন্য কোনও উপাধি পান নি, "বাদি সিংহ" নামক ছদ্ম উপাধি দেবার কল্পনা ছিল।[৯৬] চৈতন্য অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়েন নি,[৯৭] বেদান্ত পড়েন নি।[৯৮]

চৈতন্যের মতন এমন বিশিষ্ট সাধক ও ধর্ম প্রবর্তক সাধারণতঃ আপন মন্ডলীর মধ্যে আলোচনা, উপদেশ, ইষ্টগোষ্ঠী, সাধন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি করেন, চৈতন্যের বেলায় তা শোনা যায় না। নীলাচলে তিনি চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের নাটক, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং গীতগোবিন্দ গান করতেন এবং শুনতেন স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়ের সঙ্গে।[৯৯] এগুলি রস-মন্ডিত কাব্য, আস্বাদনের বিষয়, তত্ত্বের বা আলোচনার বস্তু নয়। গদাধর ভাগবত প'ড়ে শোনাতেন[১০০], কিন্তু এর তত্ত্বালোচনা থেকে চৈতন্য বিরত থাকতেন।

রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী অনুসারে জানা যায় চৈতন্য আটটি শ্লোক রচনা করেছিলেন যাকে বলা হয় শিক্ষাষ্টক। এ ছাড়া তাঁর রচনা সম্বন্ধে আর কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায় না, সুতরাং এই আটটি শ্লোক ছাড়া চৈতন্য আর কিছু রচনা করেন নি মনে করা যেতে পারে। নিনি রূপ ও সনাতনকে দীর্ঘদিন ধ'রে শিক্ষা দিয়েছেন যার সপুঙ্খ বর্ণনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ করেছেন, তিনি পুরীতে বাস কালে রঘুনাথ দাসকে উপদেশ দিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস-চিত্রিত চৈতন্য শুধুই প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে তাত্ত্বিক সৌধ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা কৃতপ্রযত্ন হয়ে জ্ঞানার্জন ও অধ্যবসায়ের ফলে নির্মাণ করলেন চৈতন্য তারও আভিত্তিচূড় পরিকল্পক। রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা সম্বন্ধে আছে—

"কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিলা॥"[১০১]

যে যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন বলা হয়েছে তা অনুধাবন করলে উপরোক্তিকে যথার্থ ব'লে মনে হয়, আলোচনার ভক্তিমূলক বিষয় বিরাট গ্রন্থ ভাগবতে কোথাও না কোথাও পাওয়া যায়, প্রেমভক্তি সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচারণা রামানন্দের ব্যাখ্যানে মেলে। ভক্তিবিষয়ক সিদ্ধান্ত রূপ ভাগবত থেকেই নিয়েছেন নিশ্চয়, কারণ চৈতন্যের দ্বারা "শিক্ষিত" হওয়ার পূর্বেই এই দুই সুপন্ডিত ভাই ভাগবত আলোচনা করতেন এ কথা চরিতগ্রন্থে আছে।[১০২] নীলাচলে রূপ যখন গিয়েছিলেন তখন রামানন্দের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।[১০৩] সুতরাং তিনি এ সব বিষয়ে শুধু চৈতন্যের

উপরে নির্ভরশীল নয়, চৈতন্যের শিক্ষা তাঁর একমাত্র অবলম্বন না হ'তেও পারে। নূতন উদ্ভাবন ও বার্তিক বিশদীকরণ যা আছে তার কৃতিত্ব রূপ গোস্বামীকে অর্পণ না করবার হেতু নাই, কবিকর্ণপূর বলেছেন[১০৪] রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের লীলাবিলাস তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ, স্ববিলাসরূপে। যাকে চৈতন্যের শিক্ষা বলা হয়েছে, মনে হয় তার মধ্যে এই বিষয়গুলিতে নূতনত্ব আছে যার চর্চা রামানন্দ করেন নি —ভক্তিলাভ হয় কৃষ্ণপ্রসাদে বা মহাজন কৃপায়[১০৫], ভুক্তিমুক্তি পরিত্যাজ্য কৃষ্ণপ্রেমের পরিপন্থী ব'লে[১০৬], কৃষ্ণরতি-বৃদ্ধিক্রমে প্রেম স্নেহ মান প্রভৃতির ক্রম-নির্ণয়[১০৭], স্থায়ীভাবে বিভাবাদি রসশাস্ত্রের চর্চা[১০৮], মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরস[১০৯], কেবলাভক্তি[১১০]। এ সব বিষয়ের আলেচনা রূপ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থগুলিতে করেছেন এবং মনে হয় এ সমস্ত চৈতন্যের শিক্ষার ফল। আলোচিত বিষয়গুলি কৃষ্ণদাস সরাসরি রূপ গোস্বামীর রচনাবলী থেকে নিয়েছেন।

সনাতনকে চৈতন্য যে শিক্ষা দিয়েছেন চৈতন্যচরিতামৃতের পাঁচ পরিচ্ছেদ ব্যেপে তার বর্ণনা আছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই আলোচনা, তার মধ্যে আছে শক্তিতত্ত্ব, মায়ার প্রভাব, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব, ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান, চতুর্ব্যূহ, অবতার, সৃষ্টিতত্ত্ব, লীলার নিত্যত্ত্ব, কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, কৃষ্ণের বৈভব, গোলোক বিষ্ণুলোক, উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ভক্ত, ভক্তের গুণ, চৌষট্টি অঙ্গের সাধনভক্তি, বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিবর্জিত ভক্তি, সাধ্যভক্তি, ভক্তির সোপান, ভাব প্রেম প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর, রসতত্ত্ব, আত্মারামশ্চ মুনয়ো পদের ৬১ রকম ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব স্মৃতির সূত্র, বৈষ্ণবের গ্রহণীয় ও বর্জনীয় আচার, আলম্বন বিভাবাদির সংখ্যায়ন, মন্বন্তর কাল গণনা প্রভৃতি বহু বিষয়।

গোস্বামীরা বলেছেন তাঁরা নিজেদের রচনার জন্য চৈতন্যের কাছে প্রেরণা পেয়েছেন।[১১১] কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে যখন দেখি চৈতন্য বলছেন "প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন"[১১২] বা "যৈছে রস হয় তার শুনহ লক্ষণ"[১১৩] বা "অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ"[১১৪] বা "এবে সাধন ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন"[১১৫] এবং অব্যবহিত পরেই পাই চৈতন্যের উক্তি নয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোক। আর একটা কথা, চৈতন্য দীর্ঘদিন ধরে রসতত্ত্ব, সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি সম্বন্ধে সনাতনকে যে উপদেশ দিলেন, সে বিষয়ে লিখলেন রূপ!

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বাংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন, গোস্বামীদের প্রতিভার স্ফুরণ এবং রচনায় আগ্রহ হয়েছিল চৈতন্যের অভূতপূর্ব আদর্শ-জীবনের প্রেরণায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সবটাই যে চৈতন্যের উদ্ভাবন, গোস্বামীরা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন মাত্র, এ মতবাদে বিদ্বজ্জন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন[১১৬] কারণ

গোস্বামীরা ছিলেন পরম পণ্ডিত।

চরিতকাররা চৈতন্যকে তর্কে পারদর্শী রূপে চিত্রিত করেছেন। মনে হয় প্রথম জীবনে চৈতন্যের অধিক আগ্রহ ছিল বিতণ্ডায় অর্থাৎ অপরপক্ষের মতবাদকে বাগবিস্তারে লাঞ্ছিত করায়। নবদ্বীপে অধ্যাপনা কালে এক দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের চৈতন্যকর্তৃক পরাভবের কথা জীবনীতে আছে কিন্তু বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস তার নাম জানান নি। এই বচসায় চৈতন্য দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের রচনায় যে সব দোষ দেখিয়েছেন তার একটি ( "ভবানীভর্তা" ) সাহিত্যদর্পণ থেকে নেওয়া।[১১৭] মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপূর এই ঘটনার উল্লেখ করেন নি। মনে হয় এ বিষয়ে চরিতকাররা যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন নি।

"স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে"[১১৭ক]

মুকুল যদিও ভক্তির প্রভাবে কীর্তনাদি করতেন, তবুও যোগবাশিষ্ঠ পড়তেন ব'লে চৈতন্যের রোষভাজন হয়েছিলেন। চৈতন্য বলেছিলেন ভক্তির চেয়ে বড় কিছু আছে যে বলে সে আমাকে যন্ত্রণা দেয়। ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।[১১৮] এ থেকে মনে হয় চৈতন্য বেদান্ত-শাস্ত্র বা বৈষ্ণবধর্মের-অপ্রতিপাদক কোনও গ্রন্থ-পাঠ অনুমোদন করতেন না। অতএব ইনি যে ভক্তিবাদ-বিরোধী পন্ডিতদের পরাস্ত করেছিলেন সেটা ভক্তিশাস্ত্রের ভিত্তিতে এবং প্রসঙ্গেই ক'রে থাকবেন। এতে স্বমতের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে কিন্তু পরমত অর্থাৎ অদ্বৈতমত খন্ডন সম্ভব হয় না।

কাশীতে চৈতন্য অদ্বৈতবেদান্তী প্রকাশানন্দকে "উদ্ধার" করেছিলেন এ কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রকাশানন্দের সহিত সাক্ষাৎকালে চৈতন্য বলেন যে ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য এবং চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলেন। প্রকাশানন্দ এই যুক্তি খন্ডন করেছিলেন বা প্রতুত্ত্যরে কি বলেছিলেন তার উল্লেখ নাই।[১১৯] গ্রন্থকারের এই ত্রুটির জন্য সম্পূর্ণ আলোচনা আমাদের গোচরে এল না, কি যুক্তি প্রয়োগ হয়েছিল সে সব আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেল। প্রকাশানন্দ চৈতন্যের ভক্তি-ভাবাবিষ্ট চিত্তকে শ্রদ্ধা করেছিলেন, হয়ত তাঁর দেহলাবণ্য এবং ভক্তি-আরূঢ় দিব্যোন্মাদের ভাব দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু স্বমত জ্ঞানপথ ছেড়ে নির্জ্ঞান ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন এমন কথা বলা চলে না।

চৈতন্য-ভাগবতে চৈতন্যের সহিত বাসুদেব সার্বভৌমের কথোপকথন অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, চৈতন্য ভাগবতের নূতন ব্যাখ্যা তাঁকে শোনালেন। প্রসঙ্গটি অতি অল্পে সেরে গ্রন্থকার ষড়ভুজ মূর্তির দীর্ঘ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।[১২০] চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে অদ্বৈতবেদান্তী বাসুদেব সার্বভৌম জ্ঞানের বিচার-পথ ছেড়ে

ভক্তিমার্গের আত্মসমর্পণ-তুষ্টি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু মনে হয় না যে তিনি কোনও শ্লোকের ১৮ রকম বা ৬১ রকম ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হ'য়ে চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে চৈতন্যের আলেচনায় মুখ্যার্থ গৌণার্থের কথা এসেছে, ব্যাকরণ থেকে তিন কারকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, শক্তিগুলির নাম আছে, আছে কতকগুলি বাঁধাযুক্তির পুনরুচ্চারণ, "আত্মারামশ্চ" শ্লোকের ১৮ রকম সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ।[১২১] একে বেদান্তের সবিচার সম্যক আলোচনা বলা যায় না। সার্বভৌম অদ্বৈতমত ত্যাগ করেছিলেন ব'লে জানা নাই, তবে তিনি চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর স্তুতি করেছেন বহু শ্লোকে। শুধু সার্বভৌমকে নয় চৈতন্য বহু লোককে ভক্তিপথে আনয়ন করেছিলেন পাণ্ডিত্যের প্রভাবে নয়, তর্ক-প্রতিষ্ঠায় নয়, ভক্তি-শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের অসামান্য স্ফুরণে এবং ঐকান্তিক অকৃত্রিম প্রেমাবেগের সংক্রামক আতিশয্যে।[১২২]

"শ্রীচৈতন্য কিভাবে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন তাহারও ইঙ্গিত প্রবোধানন্দ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিমুখ জনকে ভক্তি পথে আনয়ন করিতেছেন এরূপ বর্ণনা কোথাও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে নাই।"[১২৩] কবিকর্ণপুর বলেছেন লোকরা বিনা উপদেশ লাভেই চৈতন্যের ভক্ত হয়েছেন।[১২৪]

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"[১২৫] ভক্তি দ্বারাই ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি করা যায়, বুদ্ধির দ্বারা বা টীকার দ্বারা নয়। চৈতন্য এই বাক্যে বিশ্বাসী ছিলেন তাই বলেছেন—

"প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী।"[১২৬]

বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা ভাগবতের অর্থ উদ্ধার তাঁর বুদ্ধির এবং আয়ত্তের বাইরে—এটা বলেছেন বিনয়বশতঃ। তাঁর অভিপ্রেত অর্থ এই যে ভক্তিলভ্য সাদা অর্থই তিনি অনুমোদন করেন, মনস্বিতা-মন্থনে লব্ধ অর্থ নয়। বল্লভাচার্যের প্রবুদ্ধ ভাগবত ব্যাখ্যা শুনতে তিনি উৎসুক ছিলেন না[১২৭], বল্লভাচার্যের অনুসন্ধায়ী দৃষ্টিকে চৈতন্য হয়ত ভক্তি ব'লে মনে করেন নি। যে সব পার্ষদদের পাণ্ডিত্য ছিল ভক্তি দ্বারা আপ্লুত এবং যাঁদের শাস্ত্রজ্ঞান নিয়োজিত ছিল অসম্প্রজ্ঞাত নির্বিচার ভক্তির প্রস্থাপনে, তাঁদের বিদ্যাকেই চৈতন্য যথার্থ মনে করেছিলেন।

কিন্তু চৈতন্যের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বিচারে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আলোচ্য সময়ে নবদ্বীপ উচ্চশিক্ষার একটি পীঠস্থান ছিল, বোধ হয় মিথিলা এবং ভট্টপল্লী ছাড়া সমগ্র পূর্বভারতে এমন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। এহেন নবদ্বীপে টোল চালাতে হ'লে প্রচুর পাণ্ডিত্যের দরকার নইলে ছাত্র জুটবে না, চৈতন্যের টোলে যে ছাত্রের অভাব ছিল না সেটা অবিসম্বাদিত। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও

চৈতন্যের আগ্রহে তাঁকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হয়, বালকের সাধারণ প্রবৃত্তি পাঠশালা পলায়ন, এরকম পাঠে আগ্রহ শুধু মেধাবী ছাত্রদেরই হ'য়ে থাকে। যদি মেনে নেওয়া যায় যে তিনি কূটতর্কেই সিদ্ধ ছিলেন তা হলে এও মানতে হবে যে এমন বিতণ্ডার জন্যও বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষা আবশ্যক হয়।

অধিকাংশ লোক পড়াশুনা করে জীবিকার্জ্জনের জন্য, জীবিকার প্রয়োজনাতিরেকে যাঁরা করেন তাঁরাই যথার্থ বিদ্যানুরাগী। মধ্যবয়সে বা বৃদ্ধ বয়সে পড়াশুনার চর্চা অনেকেই ছেড়ে দেন, কিন্তু শেষ বয়স পর্যন্ত চৈতন্য ধর্মগ্রন্থপাঠ নিয়মিত শুনতেন, বিদ্যানুরাগের এটি একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

চৈতন্যের শিক্ষা বা পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় যথেষ্ট নিদর্শনের অভাবে।

যে ঘট পূর্ণ তা'কে পূর্ণতর পূর্ণতম করবার চেষ্টা ব্যাকরণ সম্মত হ'তে পারে কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে কি ক'রে হয় তা আমাদের জানা নাই। কৃষ্ণের বেলায় পূর্ণতার এরকম তারতম্য তাত্ত্বিকরা করেছেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের নির্মলতায়, সকল জীবের সমান ধর্মাধিকারের মতবাদ-মাহাত্ম্যে, ভক্তির পরাকাষ্ঠার আশ্চর্যময়তায় চৈতন্যের জীবন পূর্ণ, তাকে পাণ্ডিত্যের ভারে পূর্ণতর করবার চেষ্টা নিরর্থক বলে মনে হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের কতখানি চৈতন্যের অবদান সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও দ্বিমত নাই যে বৈষ্ণব-কাব্যের সাক্ষাৎ প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। "সঙ্কীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"[১২৮] "চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সঙ্কীর্তন"[১২৯]; সঙ্কীর্তন বৈষ্ণব-কাব্যের প্রাণ, চৈতন্য কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন।

চৈতন্যের জন্ম হয় পূর্ণিমা তিথিতে, সে রাত্রিতে ছিল চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহণোপলক্ষে স্নানার্থীদের হরি-নামকীর্তনে নবদ্বীপ মুখরিত ছিল। অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গী বৈষ্ণব ভক্তগণ নামকীর্তন করতেন, যবন হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নামগান করতেন। অতএব নামকীর্ত্তন চৈতন্যের আগেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু ছিল হাততালি দিয়ে একক কণ্ঠে নামোচ্চারণ; একে বহুলোকের মিলিত কণ্ঠে পরিবর্তিত ক'রে, তাকে সাঙ্গীতিক রূপ দিয়ে, নৃত্য এবং বাদ্যের সঙ্গে যুক্ত ক'রে উচ্চৈঃস্বরে নামগান এবং স্তবগান সৃষ্টি করলেন চৈতন্য—যাকে বলা হয় সঙ্কীর্তন বা উচ্চসঙ্কীর্তন।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিন চারটি চরিত্রের গীতমালায় যে নাটিকার অঙ্গবদ্ধতা দেখা যায় তা'তে মনে হয় কোনও এক রূপে লীলাকীর্তন চৈতন্যের পূর্বে ছিল অর্থাৎ পালাবদ্ধভাবে কৃষ্ণযাত্রাগীত প্রচলিত ছিল। খেতরীর মহোৎসবে (আনুমানিক ১৫৮১খৃষ্টাব্দে) নরোত্তম কর্তৃক লীলাকীর্তন

বিধিবদ্ধ হয়। এর বেশী কিছু জানা নাই।

নবদ্বীপে চৈতন্য এবং তাঁর পার্ষদরা নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লীলাভিনয় করতেন, কৃষ্ণ বলরাম এবং গোপীদের চরিত্র রূপায়িত করতেন। একে ঠিক পালাকীর্তন বলা যায় কিনা সন্দেহ। এই কীর্তন প্রথমে হ'ত নিভৃত পরিবেশে, রাত্রিতে দ্বারে কপাট দিয়ে, অধিকাংশই শ্রীবাসের আঙিনায়। কিন্তু একান্তে এমন কীর্তনের ফলে লোকের মনে ধারণা হ'ল যে কীর্তন সম্মিলনে কোনও ব্যভিচার বা অসামাজিক কার্য সাধিত হয় যার কারণে গোপনতার প্রয়াস, তাঁরা বুঝলেন না যে বর্বর মুসলমানের বা অবিশ্বাসী হিন্দুদের উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্য এবং সঙ্কীর্তনকে উচ্চভক্তের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রাখবার জন্য এই সতর্কতা। ভক্তিবিরোধীজন সঙ্কীর্তনের অসূয়াপর হ'লেন এবং মুসলমান কাজি সঙ্কীর্তন নিষেধ করলেন। প্রতিক্রিয়ায় চৈতন্য প্রবল শক্তিমত্তা এবং কূটবিচারের পরিচয় দিলেন, আয়োজন করলেন প্রকাশ্য রাজপথে বিপুল জনসংখ্যায় খোল-করতাল-শঙ্খ-সহ নৈশ-কীর্তন, প্রচলিত করলেন নগর-সঙ্কীর্তন। সমবেত কীর্তনের প্রচার চৈতন্যের মহৎ কীর্তি, যেখানে সকলেই ভক্তির সমান অংশীদার, সমানাধিকারী।

সঙ্কীর্তনের উল্লেখ আছে ভাগবতে, কিন্তু বিশেষিত করা হয় নি।[১৩০] রূপ গোস্বামী বলেছেন কীর্তন তিন রকম – নামকীর্তন, লীলাকীর্তন, গুণকীর্তন, সবগুলি উচ্চৈঃস্বরে কর্তব্য।[১৩১] চৈতন্য নীলাচলে অধিক সময় কীর্তনে অতিবাহিত করতেন –

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"[১৩২]

চণ্ডীদাসে ও কর্ণামৃতে গুণবর্ণনা, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক ও গীতগোবিন্দে লীলাবর্ণনা আছে, এ সব চৈতন্য শুধু শুনতেন তা-ই নয়, গান করতেন।

## উল্লেখ-পঞ্জী


১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৫১-১৫৮
২। ভাগবত ১/২/১১
৩। গীতা ১৮/৫৪
৪। ব্রহ্মসূত্র ২/১/১১, ৩/২/২৭, ২৮ ইত্যাদি
৫। পরমাত্মসন্দর্ভীয় এবং ভগবৎ সন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী
৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৫৭ - ১৬০
৭। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৬

৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/৩
৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১, ২, ৩
১০। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭
১১। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/১৯
১১ক। মুণ্ডক উপনিষদ ১/১/৭
১২। বিষ্ণু পুরাণ ১/৪/৪, কঠোপনিষদ ১/২/২৩
১৩। মুণ্ডক উপনিষদ ৩/২/৩
১৪। ভাগবত ১০/১৪/৩২
১৫। ঐ ১০/১২/১২
১৬। ঐ ১০/২৯/১১
১৭। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ২০/১১, বিষ্ণু পুরাণ ৫/১৩/১২
১৮। চৈতন্যচরিতামৃতে (২/২৩/৮) উদ্ধৃত
১৯। ভাগবত ৩/২৯/৭-১২
২০। চৈতন্য ভাগবত ১/৯/১৬০
২১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৯/১০, ৩/৮/৩৬
২২। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ২২
২২ক। চৈতন্য ভাগবত ১/৯/১৭৫
২২খ। স্বামী বিদ্যারণ্যের ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫২
২৩। ভাগবত ১০/৮২ অধ্যায়
২৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/৫৮
২৫। ঐ ২/১/৭৬
২৬। ঐ ২/৮/১৩৮, ২/৮/১৮৭
২৭। ঐ মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ
২৮। ঐ ২/৮/৯৮, ২০৪, ২০৫, ২২৮
২৯। ঐ ৩/১৪/১৪, ৩/১৯/৩১, ৯০, ১০৭
৩০। ঐ ৩/১৪/১৯, ১০৮, ৩/১৭/২৪, ৩/১৮/৮১, ৮২
৩১। ঐ ৩/১/২০৪
৩২। ভাগবত ১১/২/৪৭
৩৩। চৈতন্য ভাগবত ১/১৬/২৬৯
৩৪। ঐ ১/১৬/২৬৫
৩৫। ঐ ১/১৬/২৮১
৩৬। ঐ ২/১/৪০৮
৩৭। ঐ ২/৬/১২৬, ১/২/১৫১
৩৮। ঐ ১/১/১
৩৯। ঐ ২/৫/৫৩, ২/৬/১৬৫
৪০। ঐ ২/১৩/৩০২, ৩১৭

৪১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৫/১০০
৪২। ঐ ২/৬/২৬০
৪৩। ঐ ২/৯/২৬৭
৪৪। ঐ ২/৮/৭৯, ৯৮
৪৫। ঐ ২/৯/২৬১
৪৬। ঐ ২/১৯/১৫১
৪৭। ঐ ২/১/৫৮
৪৮। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন, পৃঃ ২৬৬
৪৯। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৫৮
৫০। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ
৫১। ঐ ২/১৪/১৩৬-১৬২
৫২। ঐ ২/৮/২৭৯, ২৮০
৫৩। ঐ ২/৮/৩১২
৫৪। ঐ ২/৮/২৫৬
৫৫। ঐ ২/৮/৩১২
৫৬। চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮/২
৫৬ক। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১১৬
৫৭। Guadiya Vaishnava Studies by A. K. Majumdar, p. 12
৫৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/৯৮
৫৯। ঐ ২/৮/২০২-২০৪
৬০। ঐ ২/৮/২০৪, ২০৫
৬১। ঐ ২/৮/২০৭
৬২। ঐ ২/৮/১৯১
৬৩। স্বামী বেদারণ্যের ভাগবতধর্মের বেদমূলতা, পৃঃ ৬৪
৬৪। ভাগবত ১০/২৯/৯ এর জীব গোস্বামীকৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকায় পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড হ'তে উদ্ধৃত
৬৫। পদ্ম পুরাণ, পাতালখণ্ড, ৪১ অধ্যায়
৬৬। চৈতন্যভাগবত ৩/৪/৪০২-৪০৯, চৈতন্যচরিতামৃত ১/৯/১০
৬৭। চৈতন্যভাগবত ১/৯/১৬০
৬৮। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২২
৬৯। চৈতন্যভাগবত ২/২৬/১১১
৬৯ক। পদকল্পতরু ২/৫৭৬
৭০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৯৬
৭১। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৭/১৬
৭১ক। অমরু, সদুক্তিকর্ণামৃত ৪৭, নায়কে মানিনী বচনম্ ২
৭২। উজ্জ্বল নীলমণি, স্থায়ীভাব প্রকরণ, ৮৪

৭৩। মেঘদূত, উত্তরমেঘ, ৪১
৭৪। ভাগবত ১০/৩০/২, ১৪
৭৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৯৩
৭৬। ঐ ২/৮/২৮২
৭৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/৫৬
৭৮। চৈতন্যভাগবত ১/১৫/১২৯-১৩৪
৭৯। চৈতন্যভাগবত ১/১৭/১১৬, ১২৮, ২/১/৩৭৫
৮০। চৈতন্যভাগবত ২/২/৪৭
৮১। চৈতন্যভাগবত ২/৫/৫২
৮২। চৈতন্যভাগবত ২/৬/১৩৪
৮৩। ঐ ২/২৬/৮৭, চৈতন্যচরিতামৃত ১/১৭/২৪৭
৮৩ক। চৈতন্যভাগবত ২/২৪/১৩
৮৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/২৬৯-২৭১
৮৫। চৈতন্যভাগবত ৩/৯/১৯৯-২০০
৮৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৮/১১১, ২/২৫/৭৮, ২/২০/৩৬৪-৩৬৬
৮৭। ঐ ৩/১/১৩১, ১৭৯
৮৮। ঐ ২/৮/২৭৩, ২/১০/১৭৯
৮৮ক। ঐ ৩/১৬/৪৩
৮৯। চৈতন্যাষ্টক ১/২
৯০। চৈতন্যভাগবত ১১/৭/৪৭
৯১। ঐ ১/৭/১৮৩, ২০২
৯২। ঐ ১/১/১০৪
৯৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১০/৭২, ১/১৫/৫, ১/১৬/৩১, ৩২; Early History of Vaishnavism by S. K. De, p. 71, চৈতন্যভাগবত ১/৮/২৭, ১/১০/৪৩, ১/১২/8, ১/১৩/১২১, ১/১০/২২
৯৪। চৈতন্যভাগবত ১/১৩/২০২
৯৫। চৈতন্যভাগবত ১/১১/৩৬, ১/৮/৩৯
৯৬। ঐ ১/১৩/২০৩
৯৭। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১৬/৫২
৯৮। ঐ ১/৭/৬৯
৯৯। ঐ ২/২/৭৭
১০০। চৈতন্যভাগবত ৩/৩/২৩০, ৩/১০/৩৩
১০১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১১৫, ১১৬
১০২। ঐ ২/১৯/১৭
১০৩। চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ

১০৪। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৯/৪৪
১০৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৫১
১০৬। ঐ ২/১৯/১৫৮, ১৭৫
১০৭। ঐ ২/১৯/১৭৭, ১৭৮
১০৯। ঐ ২/১৯/১৮০, ১৮১
১০৯। ঐ ২/১৯/১৮৫, ১৮৭
১১০। ঐ ২/১৯/১৯২
১১১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/১/২
১১২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৩/৬
১১৩। ঐ ২/২৩/৯৬
১১৪। ঐ ২/১৯/১৬৬
১১৫। ঐ ২/২২/১০৪
১১৬। Early Hisatory of Vaishnava Faith by S. K. Dc p. 114
১১৭। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্য দর্পন, ৭/৭
১১৭ক। চৈতন্যভাগবত ২/১৯/৯৫
১১৮। চৈতন্যভাগবত ২/১০/১৮৯-১৯২
১১৯। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৫ পরিচ্ছেদ
১২০। চৈতন্যভাগবত ৩/৩/১০০-১৫২
১২১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৬/১৯৫
১২২। ঐ ২/৭/৯৭-১০৫
১২৩। বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃঃ ১৭৭
১২৪। Early History of Vaishnava Faith by S. K. De p. 103 Footnote
১২৫।
১২৬। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৭/৮২
১২৭। ঐ ৩/৭/৮৮
১২৮। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৩/৭৭
১২৯। ঐ ২/১১/৯৭
১৩০। ভাগবত ১১/৫/৩২, ১২/৩/৫১, ৫২
১৩১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি, ৩৩
১৩২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২/৭৭

॥ ২ ॥

# ঈশ্বর তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব

## সূচনা

বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং অন্য নানা দার্শনিক মতবাদ যখন বিপুল আকার ধারণ করল তখন তাদের সমন্বয় সাধন ক'রে সংক্ষিপ্ত ক'রে রচিত হল সূত্র, এবং নিয়ম হ'ল যা কিছু সবই সূত্রে ধরা আছে, এর অতিরিক্ত প্রতিপাদ্য কিছু নাই। এতে মৌলিক চিন্তা স্ফুরণকে খর্ব করা হল বটে কিন্তু যাঁদের নূতন কিছু দেওয়ার ছিল তাঁদের উদ্যমকে দমিত করতে পারা গেল না, সূত্রের অতি সংক্ষেপিত আকার হেতু অর্থ- দ্বৈধের সুযোগ নিয়ে নিজের মনোমত ভাষ্য রচনা ক'রে চিন্তাশীল ব্যক্তি নূতন মতবাদ প্রচার করে গেলেন। শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত পন্থায় বৈদান্তিকের পক্ষে নিয়ম হ'ল প্রস্থানত্রয়ের— ব্রহ্মসূত্র, গীতা এবং উপনিষদের— ভাষ্য রচনার কৃতিত্বেই তাঁদের বুদ্ধির প্রকাশ হ'তে পারে, প্রতিভাধরের পক্ষে হ'ল এই একমাত্র অবলম্বন। শঙ্করাচার্যের অভিমত অনুসারে "নহি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ"[১], বেদবাক্য- সমূহের কোনওটি অর্থযুক্ত কোনওটি অর্থযুক্ত নয় এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত নয়, প্রমাণত্ববিষয়ে সকল বেদবাক্যের সমান প্রতিপত্তি। অথচ বেদবাক্যে অর্থ-বিরোধ যথেষ্ট আছে এবং স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করবার জন্য শঙ্করাচার্যকে অনেক বাচনিক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। শঙ্করাচার্য এই উপায়ে অদ্বৈতমত স্থাপন করলেন এবং তাঁর মত খণ্ডন ক'রে বৈষ্ণবাচার্যরা স্বমত প্রতিষ্ঠা করলেন, এই উপায়েই, একই সূত্রের বা বাক্যের অন্যরূপ অর্থ ক'রে। রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক এবং বল্লভাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবমত এই প্রকার ভাষ্যের উপরে স্থাপিত। দুর্লভ মেধার অধিকারী এই সব বুধদের যদি স্বকীয় রচনার স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত, তা হলে তাঁরা রচনাকে আরও ব্যক্তিগত, ঘনসন্নিবিষ্ট, মনোজ্ঞ করতে পারতেন।

ঐতিহ্য অনুযায়ী উপরোক্ত চারজনের প্রবর্তিত চারটি বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সে গণনার বাইরে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে এই চারটির সঙ্গে পঞ্চম রূপে যুক্ত হয় নি অর কারণ প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্যের উপর এটি স্থাপিত নয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরের নিকটে গলতায় আহূত এক সম্মিলনে যখন গিয়েছিলেন তখন অন্য ধর্মীয়েরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্য নাই ব'লে অবহেলা করে। বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা-অর্জন-কল্পে। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও তৃতীয় পাদে, চৈতন্যের তিরোভাবের দুইশত বৎসর পরে। সে সময়ে বৃটিশ রাজত্বের পত্তন হচ্ছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে যথাসন-স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ও উপযোগিতা তখন অনেক ক'মে গিয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মতবাদের প্রধান উপজীব্য গ্রন্থ ভাগবত, পদ্ম পুরাণ এবং গোপাল-তাপনী উপনিষদ। পুরাণকারদের মতে বেদের অর্থ নিগূঢ়, সহজে বোঝা যায় না, বেদের কথাই পুরাণে সরল ভাষায় লিখিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুরাণ সমূহের মধ্যে ভাগবতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, এমন কি ভাগবতকে বলা হয় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।[২] পদ্ম পুরাণ যে কত পুরাতন তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য তবে মধ্বাচার্য পদ্ম পুরাণের শ্লোক উদ্ধরণ করেছেন।[৩] এই বৃহৎ গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে রচিত হওয়া সম্ভব। গোপালতাপনীর রচনাকালও জানা নাই।

মতবাদের প্রধান প্রবক্তা রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শেষের পাঁচজন বৃন্দাবন-প্রবাসী। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ছিলেন বৃন্দাবনবাসী, বলদেব বিদ্যাভূষণও গলতার তর্ক সভায় গিয়েছিলেন বৃন্দাবন থেকে। অতএব বৃন্দাবন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-চর্চার কেন্দ্রস্থান। রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, সনাতন, রূপ এবং গোপাল ভট্ট চৈতন্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সনাতন এবং রূপ চৈতন্যের জীবনচর্যা থেকে প্রেরণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; জীব গোস্বামী শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর জেষ্ঠ্যতাত সনাতন ও রূপের কাছে, কৃষ্ণদাস গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত; শেষের দুজন চৈতন্যকে দেখেন নি। তত্ত্ব সম্বন্ধে রচিত যে সব গ্রন্থ আজ আকর রূপে বিবেচিত হয় সে সব সংস্কৃতে লেখা, শুধু কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বাংলায় লেখা। রামানন্দ রায় কোনও তত্ত্বগ্রন্থ লিখে যান নি, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমায়িত চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর গোষ্ঠীতে, যা কবিকর্ণপূর এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের রচনায় ধ'রে রেখেছেন। স্বরূপ দামোদর একটি কড়চা লিখেছিলেন কিন্তু সেখানি আজ লুপ্ত। টীকা ছাড়া সনাতনের এবং গোপাল ভট্টের মৌলিক রচনার বিষয় নিত্যনৈমিত্তিক আচার, ক্রিয়াকলাপ,

পাপপুণ্য-বিধিনিষেধের বিচার, অর্থাৎ বৈষ্ণব-স্মৃতি তাঁদের বিবেচ্য। রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আছে ভক্তিপথে সাধনার প্রভাবে এবং ভগবৎ-কৃপায় ভক্তচিত্তে কি ভাবে ভক্তিভাবের অভিব্যক্তি ক্রমিক বর্ধিত হয়। উজ্জ্বল-নীলমণি বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব বিষয়ক অলঙ্কারশাস্ত্র-জাতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ। জীব গোস্বামীর প্রধান রচনা ষট্ সন্দর্ভ এবং তৎ-সংযুক্ত সর্বসম্বাদিনী, এগুলি সম্প্রদায়ের মূল নির্দেশক দার্শনিক গ্রন্থ। গোপাল ভট্টের মনীষাকে পূর্ণ-স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে' মনে হয় না, চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাই। হরিভক্তি-বিলাস সম্ভবতঃ তাঁর রচনা, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর রচনা বলে দাবী করবার চেষ্টা করা হয়েছে। জীব গোস্বামী ষট্সন্দর্ভের ভূমিকায় লিখেছেন গোপালভট্টের প্রথম লিখিত গ্রন্থ কোথাও ক্রমানুসারে, কোথাও বা ক্রম-ব্যতিরেকে, কোথাও খণ্ডিত ভাবে ছিল, জীব গোস্বামী তার পর্যালোচনা ক'রে যথা - পর্যায়ে লিখেছেন। গোপাল ভট্টের লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় না, সুতরাং জানবার উপায় নাই যে জীব গোস্বামী গোপাল ভট্টের রচনার মূল বিষয়বস্তু, অপরিবর্তিত রেখে শুধুই প্রক্রমভঙ্গ করেছেন, না উপাদানকে পূর্তি করেছেন নিজ উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও যুক্তি দ্বারা। বোধ হয় শেষেরটিই সত্য কারণ একজনের রচনায় যতটা শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব আশা করা যায় জীব গোস্বামীর রচনায় ততটা নাই। মনে হয় রূপ গোস্বামীর দৃঢ়-নিবদ্ধ সুশৃঙ্খলায় বিন্যস্ত অথচ সুখপাঠ্য কবিত্বময় রচনা-কৌশল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জীব পান নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত শুধুই চৈতন্যের জীবনকাব্য নয়, বৈষ্ণবধর্মের মূল দার্শনিক মতবাদের সঙ্কলন, যদিও বাংলায় লেখা। দুরূহ তত্ত্বের ভার এই কাব্য বহন করেছে আংশিক ভাবে, কারণ দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিপাদনে ভাষার দ্ব্যর্থহীনতা ও সূক্ষ্মতা আবশ্যক, বাংলা ভাষায় তখনও সেটা সম্ভব হয় নি। তখন সংস্কৃতই ছিল সুনির্দিষ্ট ভাব-প্রকাশের একমাত্র ধারক ও বাহক, এবং সেই কারণে তাঁকে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়কে বিশদ করতে হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থে ক্ষুরধার বিভাজন বিকিরণের শক্তির পরিচয় যতটা আছে, বিচার-স্থাপনালব্ধ যৌক্তিক প্রতিষ্ঠা ততটা নাই, কিন্তু পূরণ-স্বরূপ যে প্রগাঢ় ভক্তির বিভূতি সর্ব-রচনায় পরিলক্ষিত হয় তার মূল্য অমেয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ঈশ্বর সবিশেষ অর্থাৎ লক্ষণযুক্ত, সশক্তিক, সচ্চিদানন্দ, লীলাবিলাসী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। এ বিষয়ে অন্য বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে মিল আছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু হলেও তিনি মায়াতীত; তিনি গুণাতীত এই হিসাবে যে মায়িক বা প্রাকৃত গুণের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই, প্রাকৃত চক্ষু কর্ণ মন ইত্যাদি নাই; অপ্রাকৃত চক্ষু ইত্যাদি আছে কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের দৃষ্টি-শক্তি

ইত্যাদির তুলনা হ'তে পারে না, এই বিশেষত্ব মনে রাখলে একে গুণময় বা সগুণ বলা যায়। আবার তিনি প্রাকৃত গুণ-বর্জিত বলে কোথাও বা নির্গুণ বলা হয়েছে[৪]—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ"[৫] যে ঈশ্বরে সত্ত্ব আদি প্রাকৃত গুণ নাই।

"আমার প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ নাই এবং আমার গুণ সকল সিদ্ধ নয় ব'লে আমাকে নির্গুণ বলে, আমাকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায় না ব'লে বেদ সকল আমাকে অরূপ বলে। আমি সর্বদাই গোপীদের প্রেমে বিহ্বল হয়ে আছি, অন্য কোনও কার্য করি না।"[৬]

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্"[৭]
আমি নির্গুণ ও অপেক্ষাশূন্য, সমস্ত গুণ আমাকে ভজনা করে। ভাগবতের অন্যত্রও নির্গুণ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রাকৃত উপাদান-জাত প্রাকৃত বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের অপ্রাকৃত গুণের ধারণা কি করে হ'তে পারে? কৃষ্ণের গুণ যেমন সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা, বিভুত্ব, যোগমায়ার নিয়োজনে বৃন্দাবনবাসীর মনে বিভ্রম উৎপাদন—এসব আমাদের কাছে প্রাকৃত গুণের পরিসীমা মাত্র, তার প্রান্তিক কল্পনা, চূড়ান্ত প্রসারণ। আমাদের মনের সব কিছু ধারণা প্রাকৃত শুধু বাচনিক আতিশয্যে তাকে স্ফীত করা হয়। যেখানে ঐশ্বর্যভাব সেখানে এই স্ফীতির অপ্রতুলতা নাই, যেমন গোবর্ধন-ধারণ, কালীয়দমন প্রভৃতি, কিন্তু মাধুর্যের বেলায় প্রাকৃত রূপ গুণ যার নাই তিনি কি ক'রে মরজীবের কাছে বোধ্য ও প্রতিভাত হবেন? এ সম্বন্ধে ব্রহ্ম-সংহিতা এবং জীব গোস্বামী বলেছেন[৮]' ভক্তিরূপ চক্ষুকে প্রেমরূপ অঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ক'রে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে সতত হৃদয় মধ্যে দর্শন করা যায়। ব্যঞ্জনা এই যে ঈশ্বর চিন্তার অতীত হ'লেও ভক্তির দ্বারা অনুভূত হ'ন। পরিপূরক উক্তি আছে ভাগবতে[৯], ভক্তিতে পরিশুদ্ধ হ'লে জীব সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে অঞ্জন-লিপ্ত হ'লে চক্ষু যেমন সূক্ষ্মবস্তু দেখতে পায়। সারার্থ এই যে ভগবান অনির্দেশ্য, শুধু ভক্তির দ্বারা প্রাপ্তব্য বা উপলভ্য। তাঁকে অনুভব করা যায় কিন্তু বাণীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

উপনিষদে আছে "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"[১০] একাগ্র এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি সহায়ে সূক্ষ্মদর্শীগণ দ্বারা দৃষ্ট হ'ন।

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ত-তস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"[১১], জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযোগে সেই নিরবয়ব (ব্রহ্মকে) দেখতে পান। অবশ্য এখানে ভক্তির কথা নাই, জ্ঞান-বুদ্ধির কথা আছে।

ঈশ্বর মুক্তিদাতা, জিজ্ঞাস্য এবং জ্ঞেয়, কিন্তু কোনও পার্থিব জ্ঞানই তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তিনি শুধু বিজ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা জ্ঞেয়

কিম্বা তাঁর স্মরণই তাঁর জ্ঞান; তিনি শব্দের অবাচ্য, অবশ্য ভক্ত-কথিত বাক্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হ'ন, সর্বতোভাবে প্রকাশিত হ'ন না। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানের প্রকাশক; আনন্দ স্বরূপ এবং সকলের প্রেমাস্পদ, আনন্দ বিতরণ করেন; তিনি আস্বাদ্য। এ বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে প্রভেদ আছে, সেখানে ব্রহ্ম কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তিনিই জগৎরূপে পরিণত হন। কিন্তু বিকৃত হ'ন না। অদ্বৈত মতে বিকৃত না হয়ে পরিণতি হ'তে পারে না, শক্তির ব্যবহারে বিকার অবশ্যম্ভাবী।

ঈশ্বর অদ্বয়তত্ত্ব, অর্থ এ নয় যে অদ্বৈত বেদান্তের অনুযায়ী দ্বিতীয় কিছু নাই। অর্থ এই যে ঈশ্বর ছাড়া স্বয়ংসিদ্ধ চেতন বা অচেতন পদার্থ নাই, চেতন জীব এবং সমগ্র অচেতন বস্তু ঈশ্বর-নির্ভর, এ সকলই ভগবানের শক্তি, শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে দ্বৈতভাব নাই, যা ঈশ্বরতন্ত্র নয় এমন বস্তুর অসম্ভাব।

## ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"[১২]

যা অদ্বয়জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাকেই তত্ত্ব বলেন, যা ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই নামে অভিহিত হয়।

গীতায় আছে[১৩] ক্ষর ও অক্ষর দুই পুরুষ, তন্মধ্যে সর্বভূত ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন তিনি পরমাত্মা তিনি লোক-সকলকে পালন করছেন, তিনি অব্যয়, ঈশ্বর। আরও একজন আছেন যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হ'তে উত্তম, তিনি পুরুষোত্তম। অতএব ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতিকে বাদ দিলে থাকছে তিনটি সত্ত্বা—কূটস্থ অক্ষর পুরুষ; পরমাত্মা যিনি পালক, অব্যয়, ঈশ্বর; এবং পুরুষোত্তম। এঁরাই যথাক্রমে ভাগবত বর্ণিত ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান। কূটস্থ অক্ষর পুরুষকে জীবাত্মা অর্থে না নিয়ে ভাগবতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম অর্থে নেওয়া হয়েছে।

এ সম্বন্ধে আর একটি শ্লোক গীতায় আছে[১৪]—এই দেহে যে পরমপুরুষ আছেন তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলেও উক্ত হন। এখানে উপরোক্ত তিনটি সত্ত্বার সমন্বয়ের চেষ্টা আছে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপদ্রষ্টা, পরমাত্মা অনুমন্তা ও ভর্তা, পুরুষোত্তম ভোক্তা (= রস ভোক্তা) এবং মহেশ্বর। তিনটি সত্ত্বাকে একই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। অনুমন্তার ব্যাপক অর্থ নিয়ন্তা, যিনি অনুমোদন না করলে জীব কর্ম করতে পারে না তিনি নিশ্চয়ই জীবের নিয়ন্তা।

দেখা যাচ্ছে উপরে বর্ণিত পরমাত্মা যোগদর্শনের পরমাত্মা হ'তে ভিন্ন। যোগের পরমাত্মা এক আদর্শ আত্মা যাঁর দর্শনে এবং অনুবর্তনে যোগী স্বরূপে অবস্থিত হ'তে পারে অর্থাৎ সে যে প্রকৃতি থেকে পৃথক পুরুষ এই উপলব্ধি ক'রে মুক্তি পেতে পারে। এই পরমাত্মার কোনও কর্তৃত্ব নাই।

জীব গোস্বামী জীবাত্মাকে ব্যষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমাত্মাকে সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ বলেছেন।[১৫] "শক্তি-বর্গ-লক্ষণ তদ্ধর্মাতিরিক্তম্ কেবলম্ জ্ঞানম্ ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে; অন্তর্যামিত্বময়—মায়াশক্তি-প্রচুর—চিচ্ছক্ত্যংশ—বিশিষ্টম্ পরমাত্মেতি; পরিপূর্ণ—সর্বশক্তিবিশিষ্টম্ ভগবানিতি।"[১৬] ব্রহ্মশব্দে ব্যঞ্জিত হয় শুদ্ধ জ্ঞান, শক্তিসমূহের লক্ষণ ও ধর্ম যার অন্তর্গত নয়; পরমাত্মা চিৎশক্তির অংশ-বিশিষ্ট মায়া-শক্তি-প্রধান এবং সকল জীবের নিয়ামক; ভগবান পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট। অদ্বৈতবাদের ন্যায় এখানেও ব্রহ্ম নির্বিশেষ শক্তিহীন জ্ঞানের বিষয়। ভগবান সর্বশক্তিমান সবিশেষ হয়েও সৃষ্টিকর্তা নয় শুধু আনন্দদায়ক। এই ঐশ্বর্য-বর্জিত মাধুর্য-প্রধান ভগবৎ-কল্পনায় তাঁকে শুধু হ্লাদিনী শক্তিতে শক্তিমান করায় একজন জগৎ-পিতার আবশ্যক হ'ল, যার জন্য প্রয়োজন হ'ল যোগীর পরমাত্মাকে পরিবর্তিত ক'রে জগৎ-সৃষ্টি ও পালনের জন্য এমন পরমাত্মা কল্পনা যিনি কর্তৃরূপে চেতন অচেতনে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

"যিনি জগৎ সৃষ্টিকর্তা তিনি ভগবানের অংশবিশেষ এবং সর্বান্তর্যামী পুরুষ, ইঁহার নাম পরমাত্মা। ভগবান কিন্তু তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ঐ পুরুষের অংশী। এই পরমাত্মা মায়াবৃত্তি-সমূহ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। ভগবান শুধু স্বরূপ-শক্তিতে বিলাস করেন, মায়া শক্তির সহিত তাঁর কোনও সম্বন্ধ নাই।"[১৭]

ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভগবানের পূর্ণরূপ নয়, ভগবানই শুধু পূর্ণাবির্ভাব অখণ্ড পূর্ণতত্ত্ব। ব্রহ্ম ভগবানের প্রভা বা অঙ্গকান্তি মাত্র[১৮] বা বিভূতি[১৯], এবং পরমাত্মা ভগবানের অংশমাত্র[২০], কারণ ভগবান বা কৃষ্ণ আত্মার আত্মা, যে কারণে নিজ পুত্রাদি হ'তে তাঁ'তে প্রেমের আধিক্য থাকা বা হওয়া স্বাভাবিক।[২১] ভগবান সর্বগুণযুক্ত সর্বশক্তিমান, জ্ঞাতা; ব্রহ্ম শক্তিহীন নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র[২২]; এই তিনের মধ্যে ভগবান যে শ্রেষ্ঠতম, পূর্ণতম, পরাৎপর, এই মতবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে গীতায়, বলা হয়েছে ব্রহ্মলাভের পরে জীব ভগবানলাভের উপযুক্ত হয়—

"ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।"[২৩]

যিনি ব্রহ্ম হয়েছেন এবং আত্মস্থ আনন্দে প্রসন্ন, তিনি শোক বা আকাঙ্খা করেন না, তিনি সর্বভূতে সমদর্শী, তিনি আমার পরাভক্তি লাভ করেন। এর অনুসারী উক্তি পাওয়া যায় ভাগবতে—

"আত্মারামাশ্চমুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ।"[২৪]
(সর্ব প্রকার হৃদয়-)—গ্রন্থি শূন্য আত্মারাম মুনিগণও কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, হরির এমনিই গুণ। ব্রহ্মানন্দ লাভের চেয়ে ভক্তির আনন্দ শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত হয়েছে।

জীব গোস্বামী উদাহরণস্বরূপ কবি মাঘের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

"চয়স্তিষামিত্যবধরিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতা কৃতিং
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুংনারদ ইত্যবোধি সঃ।"[২৫]
(রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য যখন নারদ গগণপথে আসছেন তখন কৃষ্ণ) প্রথমে দেখলেন একটি তেজঃপুঞ্জ আসছেন, তার পরে নিকটবর্তী হ'লে আকৃতি দর্শনে শরীরি ব'লে নির্ধারণ করলেন, আরও নিকটবর্তী হলে করচরণাদি দর্শনে পুরুষ বলে নিশ্চয় করলেন, নিকটবর্তী হ'লে নারদ ব'লে স্থির করলেন। একই পরমপুরুষকে ব্রহ্মবিদ্ দেখেন শুধু জ্যোতি স্বরূপ, এ দেখা দূরের দেখা; নিকটতর দৃষ্টিতে তাঁর পরিচয় স্ফুটতর হয় পরমাত্মারূপে, কিন্তু তবুও অসম্পূর্ণভাবে; সম্পূর্ণভাবে পূর্ণসত্ত্বায় দেখেন ভক্ত, অত্যন্ত নিকট থেকে তাঁর সমগ্র রূপটি তাঁর কাছে প্রকাশিত হয় ভগবান রূপে।

একটা কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সময়ে বা যোগীর সমাধি-অবস্থায় মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সমেত সকল প্রাকৃতিক তত্ত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান এই তিনের ত্রিপুটি-ভেদ লুপ্ত হ'য়ে শুদ্ধ জ্ঞানের একাগ্রতায় পরিণত হয়। কিন্তু ভগবৎ-দর্শনের সময়ে ইন্দ্রিয় নিষ্প্রভ হ'লেও, মন সক্রিয় উল্লসিত এমন কি আনন্দে উদভ্রান্তও হ'তে পারে, এমন মূর্ছাপন্ন অবস্থাতেই চৈতন্য কৃষ্ণের দর্শন পেতেন। এমন জীবভক্ত বিরল ব'লে সাধারণ জীবভক্তের বেলায় বিধান সজ্ঞান সক্রিয় সেবা।

## কৃষ্ণ

কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম[২৬], স্বয়ং ভগবান[২৭], সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, গোপবেশ, বংশীধারী। "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা।"[২৮] ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা কৃষ্ণের ভক্ত। প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাই নরলীলা, অপ্রকট লীলাতে তিনি চতুর্ভুজ নয়। প্রকট লীলাতেও তাঁর দেহ রক্তমাংস-গঠিত নয়, "ন তস্য প্রাকৃতী মূর্তি-র্মেদোমাংসাস্থি-সম্ভবা। যোগী চৈবেশ্বরশ্চান্যঃ সর্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ।"[২৯] তাঁর মেদ-মাংস-অস্থি দ্বারা নির্মিত প্রাকৃত মূর্তি নাই এবং তিনি যোগী পরমেশ্বর সকলের আত্মারূপে নিত্যবিরাজমান। কৃষ্ণে দেহদেহী

ভেদ নাই। উভয় লীলাতেই তিনি চিন্ময় বিশুদ্ধ চেতনা। নারায়ণ রাম প্রভৃতি তাঁর বিভিন্ন বিলাস বা অংশ, কৃষ্ণ অংশী। ভিন্ন আকারে আত্মপ্রকটনকে বিলাস এবং তুল্যরূপে আবির্ভাবকে প্রকাশ বলে। কৃষ্ণের নিত্যধাম গোলোক, পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের উপরে অবস্থিত! নারায়ণ রূপে তিনি বৈকুণ্ঠের অধিপতি, পরমাত্মারূপে বিভু সর্বব্যাপক। কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণরূপে, মথুরায় পূর্ণতররূপে, এবং গোকুলে পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত।[৩০] কৃষ্ণে এবং তাঁর বিগ্রহে কোনও প্রভেদ নাই, বিগ্রহ তাঁরই স্বরূপভূত। বিগ্রহ অর্থে শরীর-সমন্বিত মূর্তরূপ—দেহধারী কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মূর্তি দুই-ই হয়। নিম্বার্ক এবং বল্লভাচার্যের মতে এবং গীতায় কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, রামানুজ ও মধ্বাচার্যের মতে পরব্রহ্ম নারায়ণ বা বিষ্ণু।

কৃষ্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা হ'লেও সৃষ্টি কার্য শুধু লীলাবশে হয়েছে, কোনও প্রয়োজন বশে হয় নি; কৃষ্ণ আপ্তকাম পরিপূর্ণ-স্বরূপ, তাঁর কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না।

## শক্তিবাদ

বৃংহ্ ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন ব্রহ্ম, অর্থাৎ বৃহৎ। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্"[৩১] যা সর্বাপেক্ষা বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত এবং সর্বব্যাপকত্ব-প্রযুক্ত তাকে ব্রহ্ম বলা হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শক্তিবাদের প্রাধান্য, সবিশেষ ব্রহ্মের একটি বিশেষত্ব তাঁর শক্তি, শক্তিবাদের প্রাধান্য বাঙালীর বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক। "ব্রহ্মণ" শব্দ শক্তি অর্থে বেদে ব্যবহৃত হয়েছে মনে করা যেতে পারে। "Thus it appears that, in the Vedic vocabulary, Brahman corresponded exactly to what the Hinduism of subsequent centuries terms Sakti : energy, force, power, potency............... Professor Keith, therefore, was being quite exact when he chose the term "holy power" to render Brahman, in his translation of the old Vedic charm."[৩২]

উপনিষদে, পুরাণে এবং গীতায় শক্তির উল্লেখ আছে কিম্বা ব্যঞ্জনা আছে মায়া বা প্রকৃতির নামে—

"পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"[৩৩]
(সেই মহেশ্বরের) শ্রেষ্ঠ শক্তি বিচিত্র ব'লে শ্রুত হয় এবং এই স্বাভাবিক শক্তি জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়া।

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।"[৩৪]
এই থেকে এই বিশ্বকে মায়ী সৃজন করেন, এবং মায়ার দ্বারা তাহাতে অন্যরূপে আবদ্ধ থাকেন।

"মায়াত্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্
তস্যাবয়বভূতেস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ।"৩৫
প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মায়ী ব'লে জানবে। সেই (পরমেশ্বরের) অবয়ব-রূপ বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।"৩৬
হে মহাবাহো! এই (পূর্বোক্ত প্রকৃতি) অপরা। কিন্তু ইহা ভিন্ন জীবরূপা আমার পরা প্রকৃতি আছে জানিও; যার দ্বারা জগৎ বিধৃত আছে।

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ।"৩৭
"বিষ্ণু শক্তি পরাশক্তি নামে অভিহিতা, অপর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি। একটি তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞায় অভিহিতা, অর্থাৎ এটি অবিদ্যাশক্তি বা কর্মশক্তি।

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ
হ্লাদতাপকারী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ।"৩৮
হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ (শক্তিত্রয়) সর্বাধিষ্ঠানভূত শুধু তোমাতেই (আছে), হ্লাদকরী (=সাত্ত্বিকী), তাপকরি (তামসী), এবং মিশ্রা (রাজসী)(শক্তিত্রয়) তুমি গুণবর্জিত (বলিয়া) তোমাতে নাই।
পঞ্চরাত্রমতে জগৎকারণ বিষ্ণু শক্তিমান। বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম। বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারে লক্ষ্মীই কার্য করেন, তিনিই ক্রিয়াশক্তি। যেমন এক অগ্নিশিখা থেকে অন্য অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয় সেইরকম আদিদেবতা বাসুদেব থেকে তিনটি ব্যূহের উদ্ভব হয়, এদেরও স্ব স্ব শক্তি আছে। শক্তিসমূহ দেবীরূপে পূজনীয়। জীব লক্ষ্মীর অংশ, অতএব মুক্তিলাভের পরে বৈকুণ্ঠে বাস করে।৩৮ক

এইসব নিশ্চয়ের অভিযোজিত রূপ গৌড়ীয় তত্ত্বে গৃহীত হয়েছে। এই অদ্বয়তত্ত্ব বা পরমব্রহ্মের শক্তির তিনটি রূপ—

(১) পরাশক্তি বা চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি। একে বলা হয় অন্তরঙ্গা শক্তি। এই শক্তির বিশেষ প্রকাশ শুদ্ধসত্ত্ব৩৯ যা পরিকরদের মধ্যে নিত্য বিরাজমান এবং যা ভগবান দান করেন সাধন দ্বারা বিশুদ্ধিকৃত ভক্তচিত্তে। নামের মিল থাকলেও এটি সত্ত্বগুণ নয়, গুণোত্তীর্ণ। স্বরূপশক্তি স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম ও তাঁর স্বরূপশক্তি অভিন্ন।

স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিত ও হ্লাদিনী—যথাক্রমে সৎ. চিৎ ও আনন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ও তত্তৎ লক্ষণযুক্ত। সন্ধিনী সত্ত্বা সম্বন্ধীয় যদ্দ্বারা আপন বিদ্যমানতা ধারণ করেন এবং অন্যকে ধারণ করান। সম্বিত জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞান-সম্বন্ধীয়, যদ্দ্বারা তিনি জানেন ও জানান। হ্লাদিনী আনন্দ-স্বরূপ এবং আনন্দদায়িনী শক্তি যদ্দ্বারা

তিনি আনন্দ পান এবং দেন ।[৪০]

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং যা কিছু প্রকৃতির বহির্ভূত বা অপ্রাকৃতিক তাতে গুণ থাকতে পারে না, সাত্ত্বিক গুণও নয়। এই অর্থে বৈষ্ণবের ভগবান নির্গুণ, কিন্তু তাঁর অপ্রাকৃতিক গুণ আছে, ভক্তির প্রভাবেই যার অবধারণা সম্ভব। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক কোনও গুণ নাই। সত্ত্বগুণও একটি প্রাকৃতিক গুণ, অতএব ভগবানকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণমুক্ত ক'রে শুধু অপ্রাকৃতিক গুণে ভূষিত করতে "শুদ্ধসত্ত্ব" কথাটির সৃষ্টি হয়েছে, যেটি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। রজস্তমশূন্য সত্ত্বও প্রাকৃত সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব নয়; শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত ।[৪১]

কেবলাদ্বৈতমতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ব্রহ্ম সত্ত্ব চেতনা আনন্দ দান করেন না, কারণ তিনি ক্রিয়াহীন। ভক্তিবেদান্তমতে ভগবান সত্ত্ব চেতনা ও আনন্দ দান করেন। কেবলাদ্বৈতমতে সচ্চিদানন্দ শব্দ কোনও গুণব্যাখ্যা নয় জানায় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা। শুদ্ধ স্বপ্রকাশতা ব্যক্ত করতে পারে এমন শব্দের উদ্ভবের জন্যই মনে হয় বৈষ্ণবধর্মে "শুদ্ধসত্ত্বের" আবশ্যক হয়েছে। আর একটি কারণে "শুদ্ধসত্ত্বের" প্রয়োজন হয়েছে ঃ অদ্বৈতবাদী সাত্ত্বিক প্রকৃতির এবং এমন ব্রহ্মভূত ব্যক্তিকে ভক্তিলাভের সর্বাংশে যোগ্য মনে করা হয়েছে গীতায় (১৮/৫৪), অতএব ভক্তি অর্জন করলে সাত্ত্বিক প্রকৃতির চেয়ে উন্নততর অবস্থার বিধান অবশ্যক, সুতরাং সত্ত্বের উপরে শুদ্ধসত্ত্বের উদ্ভাবন হয়েছে।

(২) মায়াশক্তি—এর স্ফুরণ এবং কার্য জড়জগতে, একে বলা হয় বহিরঙ্গা শক্তি। জড়জগৎ বহিরঙ্গা মায়ার যোগে ভগবানের লীলার প্রকাশ। ভগবান নিজের মায়ার দ্বারা সৃষ্টির কারণে নিজে নির্গুণ হয়েও সগুণ হয়েছেন ।[৪২] শক্তি অনাশ্রয়ে থাকতে পারে না মায়াশক্তিরও আশ্রয় চাই। যেহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণব অদ্বয়তত্ত্বে ভগবানের অনুরূপ তত্ত্ব নাই, অতএব মায়াশক্তিও ভগবানকেই আশ্রয় করে, কিন্তু তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে। প্রকৃতি ও গুণমায়া সমার্থক। জীবের অবিদ্যার নামকরণ হয়েছে জীবমায়া। মায়াশক্তির তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ; এই শক্তি জড়রূপা অপরাশক্তি, স্বপ্রকাশ নয়, অপরকেও প্রকাশ করে না। ব্রহ্ম জগতের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, জীবমায়া গৌণ নিমিত্তকারণ এবং গুণমায়া গৌণ উপাদান কারণ। ব্রহ্ম জগৎ-রূপে নিজেকে পরিণত করেও অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অবিকৃত থাকেন, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই বিকারপ্রাপ্ত হয়। স্বরূপশক্তির বিকার হয় না, চিন্তামণি যেমন নানাদ্রব্য তৈরী ক'রে নিজে অবিকৃত থাকে ।[৪৩] ব্রহ্মের শক্তিই শুধু বিকারপ্রাপ্ত হয় এটি জীব গোস্বামীর পরিণামবাদের বিশেষত্ব ।[৪৪] তিনি চিন্তামণির যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেটা কাল্পনিক কিন্তু অয়স্কান্ত মণির উপমা

বৈজ্ঞানিক, একখণ্ড ম্যাগনেটকে লোহার ওপরে ঘর্ষণ করলে লোহাটি চুম্বক-শক্তি প্রাপ্ত হয়, ম্যাগনেটের শক্তির পরিবর্তন না হ'য়েও। পরিণামবাদের এই ব্যাখ্যা যেন স্মরণ করিয়ে দেয় convertibility of matter and energy। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে জড় ও জীবকে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি না ব'লে মায়াশক্তি ও জীবশক্তির প্রকাশ বলাই সঙ্গত।

জগৎ মিথ্যা নয় সত্য, তবে অনিত্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই শুধু সত্য নয়, স্বপ্নও সত্য।[৪৫] পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে স্বপ্নদৃষ্ট কাম্য দ্রব্যাদির সৃষ্টি হয়, স্বপ্নদ্রষ্টার অন্যস্থানে যাওয়ার উপযোগী দেহও পরমেশ্বরের সৃষ্টি, যার ফলে স্বপ্নদ্রষ্টা শায়িত থেকেও অন্য দেহে অন্যত্র যেতে পারেন। এই শক্তি জীবের নয় পরমেশ্বরের। স্বপ্ন যে সত্য তার অন্য প্রমাণ স্বপ্নদর্শনের ফল অনেক সময়ে সত্য হয়, স্বপ্নে ঔষধাদির প্রাপ্তি হয়। রামানুজের মতেও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব আছে, এর সৃষ্টিকর্তা জীব নয় ঈশ্বর। কর্মফল ভোগের জন্যই স্বপ্নের সৃষ্টি, স্বপ্নাবস্থাতেও জীব সুখদুঃখ ভোগ করে, সুখদুঃখ সব ক্ষেত্রেই কর্মফল। শঙ্করাচার্যের মতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মায়াময়, সত্য নয়; স্বপ্নদর্শনকালে জীব দেহের বাহিরে গিয়ে কর্ম করে না, কোনও জিনিষ দর্শন করে না। স্বপ্ননির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সত্য হ'লেও স্বপ্নে সূচক বস্তু মিথ্যা।[৪৬] শঙ্করাচার্যের সব মতের প্রতিবাদে বৈষ্ণব-বেদান্তী বদ্ধ-পরিকর, খণ্ডনকারী যুক্তির অভাব হয় না।

(৩) জীবশক্তি—স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মাঝামাঝি, একে তটস্থা শক্তিও বলা হয়; জল ও স্থলের সন্ধিস্থলে যেমন তট, সেইরূপ স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য ও জড়বস্তুর সংযোগস্থলে জীবশক্তি অবস্থিত ব'লে তটস্থা। তটস্থের অভিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজিত হয় না যদি না জীবশক্তির এই অর্থ করা হয় যে এই শক্তি জীবের আত্মাকে এবং দেহকে সৃষ্টি করেছে, ধারণ করেছে। "আমি" বলতে জীব নিজের আত্মা, অন্তঃকরণ, শরীর সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে, এবং এই পরিবেষ্টক অর্থে নিলে তবেই "তটস্থার" ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়। জীব কর্তৃক ভগবৎসেবা যদি কায়িক বাচিক মানসিক হয় তাহলে শরীর মনকে বাদ দিয়ে জীব-কল্পনা অবাস্তব হয়। জীব গোস্বামীর মতে[৪৭] জীব শব্দে কেবল আত্মাকে না বুঝিয়ে ব্যক্তিকে বুঝায়, কারণ আত্মাই ব্যক্তির আশ্রয়। অতএব জীব শব্দে বুঝতে হবে দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সম্বন্ধে আত্মভাব চিন্তনে অভিমানী এবং অন্তরে অবস্থানকারী আত্মা। জীব শুদ্ধচৈতন্য নয়, যদি তা-ই হ'ত তা হলে অজ্ঞান-অভিভূত হ'বে কি প্রকারে? শুদ্ধ চৈতন্যেও যদি অজ্ঞান সম্ভবপর হয় তা হলে মোক্ষ সম্ভবপর হয় কি করে?[৪৮] জীবের দেহ জড়বস্তু মায়াশক্তির প্রতিমুখী, চিৎ-রূপ

জীবাত্মা বা দেহী স্বরূপশক্তির উন্মুখী। দেহের মধ্যে অবস্থিত যে বস্তু চেতন এবং নিজের সংস্পর্শে দেহকেও চেতনাময় করে তা-ই দেহী বা জীবাত্মা। জীবশক্তিতে দেহ-দেহী ভেদ অর্থাৎ স্বগত-ভেদ আছে, ঈশ্বরে বা জড়ব্রহ্মাণ্ডে সে ভেদ নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং দেহ (বা বিগ্রহ) একই বস্তু, উভয়ই চিন্ময় ও আনন্দময়।

ব্রহ্মসূত্রে এবং গীতায় বলা হয়েছে জীব ব্রহ্মের অংশ।[৪৯] জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের অংশ-অংশী সম্বন্ধ রামানুজ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বীকার করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতে এই অংশ-অংশী সম্বন্ধ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ "তত্র শক্তিরূপত্বেনৈবাংশত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি"[৫০], শক্তিরূপেই জীব ব্রহ্মের অংশ। "জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব (কৃষ্ণস্য) অংশঃ, ন তু শুদ্ধস্য"[৫১] জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব, শুদ্ধ (=স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট) কৃষ্ণের অংশ নয়। তেমনিই, জীব মায়াশক্তিরও অংশ নয়, কিন্তু মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি উভয়েরই প্রভাব আছে।

জীব পরিমাণে অণু, পরব্রহ্মের চিৎকণ অংশ, সংখ্যায় অনন্ত, নিত্য; ঈশ্বর বিভুচিৎ, জীব অনুচিৎ অর্থাৎ ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, সেজন্য মায়াকবলিত, স্বরূপশক্তির-বিশেষতঃ হ্লাদিনী-শক্তির-সাহায্য ভিন্ন মায়ামুক্ত হ'তে পারে না। জীবের কণামাত্রও হলাদিনী-শক্তি আছে কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। মুক্তাবস্থাতেও জীবের মন এবং অপ্রাকৃত শরীর থাকে, পৃথক অস্তিত্ব থাকে। বিষ্ণু পুরাণের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব এইরকম করেন—

"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি।"[৫২]

বিশেষরূপে ভেদের জনক অজ্ঞান আত্যন্তিকরূপে বিনষ্ট হ'লে, আত্মা ও ব্রহ্মের যে ভেদ তাকে অস্তিত্বহীন কে করবে?

জীব এককণা জীবনীশক্তি মায়ামেঘের আবরণে ঢাকা—জীবশক্তির এই কল্পনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের একটি সফল উদ্ভাবনী। জীবের দেহ কর্ম করে ভোগ করে কিন্তু মায়াগ্রস্ত জীবাত্মা মনে করে সে কর্তা সে ভোক্তা। তটস্থা হলেও জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির প্রভাব যে সমান অংশে আছে তা নয়, জীবের অস্তিত্ব আছে অতএব কণামাত্র সন্ধিনী শক্তি আছে, বিপুল মায়ামেঘের আবরনে তার শক্তি আবৃত যা ভেদ করে ভক্তির কিরণ উদয় হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার।

জীব মনে করে সে জ্ঞাতা ভোক্তা এবং কর্তা, কিন্তু সে ঈশ্বরের কর্তৃত্বাধীন। জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ চিৎ- রূপ কিন্তু স্বরূপশক্তি থেকে পৃথক; স্বরূপশক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে অপসারিত করতে পারে কিন্তু জীবশক্তি পারে না, এজন্য সে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ-নির্ভর। জীব সেবক ভগবান সেব্য, জীব মায়ামুক্ত সংসারবন্ধনমুক্ত হলেও এ

সমন্ধ চিরদিন থাকে। জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন, কিন্তু তিনি জীবের কৃত প্রযত্নের অপেক্ষা রাখেন, "কৃত-প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"৫৩ জীবের প্রযত্ন-অনুরূপ ধর্মাধর্ম নামক কর্ম- সংস্কার সঞ্চিত থাকে এবং জীব তার ফলভোগ করে। বিশেষ শস্য বা ফল বিশেষ বীজ থেকে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টির জল সাধারণ কারণ মাত্র, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপা অপক্ষপাতে বর্ষিত হয়, জীবের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার কর্মরূপ বীজ থেকে। জীবের বাসনা এবং প্রযত্ন অনুসারে ঈশ্বর জীবের ইচ্ছানুরূপ কর্ম করান। তিনি জীবের অনুমন্তা বা নিয়ন্তা৫৪, যিনি নিয়মের প্রয়োগ এবং অনুবর্তন করেন শুধু তিনিই নিয়ন্তা হ'তে পারেন। যদি মানুষের অনপেক্ষ ইচ্ছাশক্তি (free will) না থাকত, তা'হলে বিধিনিষেধের কোনও সার্থকতা থাকত না। সনাতন কর্মবাদে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা তার নিজের কর্ম, এর ওপর কোনও ঐশ্বরিক শক্তি হস্তক্ষেপ করেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত এ থেকে ভিন্ন নয় কিন্তু সংসারের প্রতিকূল-শক্তি এতই প্রচন্ড দুরপনেয় এবং মানুষের শক্তি এতই অকিঞ্চিৎকর যে নিজের চেষ্টায় এই দুর্দৈব নিবারণ এক অসম্ভব ব্যপার। অকূল সমুদ্রে এক ভঙ্গুর ডিঙিতে জেলের যা অবস্থা হয় ঘূর্ণীঝড়ে পড়লে, সংসার সাগরে জীবের অবস্থা সেই রকম, এ অবস্থায় জেলের যেমন কোনও উদ্যমের প্রশ্ন ওঠে না একমাত্র আকূল প্রার্থনা ছাড়া, সাংসারিক জীবেরও শরণগতি ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। জেলে যদি ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও কূল পায় তা হলে যেমন বলা যেতে পারে তার সুকৃতির ফলেই পেয়েছে, জীব যদি ভগবৎ- কৃপায় সংসার-উওরণ করতে পারে তাহলে সুকর্ম-ফলেই কৃপা-অর্জন করেছে মনে করা যেতে পারে, অতএব তিনি কর্ম অনুসারেই ফলদাতা। ৫৫ ভক্তি জীবের অর্জনীয় সাধনীয় বস্তু, ভক্তির প্রভাবে কর্মক্ষয় হয়, কর্মক্ষয়ে কৃপার পথ প্রশস্ত হয়।

যে কোনও তীব্র মনোবৃত্তির ফলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, যথা ভয়, স্নেহ, কাম, দ্বেষ বা ভক্তি।৫৬ কিন্তু জীবভক্তের পক্ষে ভক্তিই একমাত্র পথ, বাকিগুলি পুরাণোক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য সংরক্ষিত।

## মায়া

উপনিষদে মায়ার উল্লেখ কমই আছে, যেখানে আছে সেখানে মায়া এবং প্রকৃতি সমার্থক৫৭, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী শক্তি।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু মায়ার প্রভাবে ইদং সর্বং বা বিশ্বজগৎ সৃষ্টিরূপে পৃথক-প্রকৃতি- রূপে প্রতিভাত হয় এবং অবিদ্যার প্রভাবে জীব নিজেকে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক মনে করে, বহু মনে করে। মায়ার কোনও কর্তৃত্ব নাই, ব্রহ্মের

আবরণ মাত্র, মায়া সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্বচনীয়, যে জন ব্রহ্মকে জীব -ও জগৎ হইতে ভিন্ন মনে করে তার কাছে মায়া সৎ, যে অভিন্ন মনে করে তার কাছে মায়া অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন।

মায়ার দুটি রূপ পাওয়া গেল, একটি কর্মাত্মিকা বা বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিরূপা-প্রকৃতি থেকে অভিন্ন, অন্যটি আবরণাত্মিকা অজ্ঞানরূপা, যেটি ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করে আছে। এক বিষয়ে এই দুই মায়া কল্পনার আনুরূপ্য আছে, দুটিই ভগবৎ-বিমুখী। তৎপরা প্রকৃতি অজস্র ভোগের উপকরণ মানুষের সামনে ধ'রে রেখে তাকে ভোগ-বিলাস-রূপ বিক্ষেপ থেকে মন-প্রত্যাহরণের অবকাশ দেয় না, মায়ার আচ্ছন্নতায় বিকৃত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপ তার আকর্ষণ- শক্তি হারায়। উভয় ক্ষেত্রেই মোহের সৃষ্টি হয়।

মায়ার আবরণাত্মিকা রূপ ব্রহ্ম সমন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়, তার বিক্ষেপাত্মিকা রূপ জগৎ পদার্থকে বা প্রকৃতিকে ভোগ্যবস্তু কিম্বা আত্মস্বরূপ জ্ঞান করে, দেহের সহিত নির্বিকার আত্মার মিথ্যা তাদাত্ম্য হেতু আমি কর্তা এই ভ্রম জন্মায়। অবিদ্যা মায়ারই স্বজাতীয়, তবে তার আছে শুধু আবরণ-শক্তি, যার ফলে বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মা জীবরূপে অভিহিত হয়, অতএব জীব অবিদ্যা-উপহিত ব্রহ্ম।

জগতের সঙ্গে নিজের ব্যবহারিক সমন্ধকে সাধারণ মানুষ দুটি স্থূল ভাগে ভাগ করেছে, একটি সুখের অন্যটি দুঃখের—এ বিভাগ তার ব্যক্তিগত, নিজের মর্জিমত, কোনও দার্শনিক তত্ত্বের অনুমিতিতে নয়। ধার্মিক প্রকৃতির লোক এ দুটিতেই মায়ার কার্য দেখতে পায় কোনও না কোনও প্রকারে, তার মতে মায়া নামক এক বহিরাগত বস্তু মানুষের অন্তঃকরণকে প্রভাবিত করেছে। মানুষ যখন সুখভোগ করে, তার কারণ খুঁজতে সে বলে মায়া তাকে অনিত্য ভোগসুখের উপকরণ যুগিয়ে সংসারমুখী করে রাখে, প্রকৃতির ভান্ডারে ভোগের উপকরণ প্রচুর। ভগবৎ-বিস্মরণ ঘটিয়ে জীবকে মোহমুগ্ধ সংসারবদ্ধ করে রাখার কার্য বিক্ষেপাত্মিকা বা ব্যামোহিকা, এই ক্রিয়াশীল ঘটনা-পটিয়সী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সমার্থক, অনির্বচনীয় শক্তির দ্যোতক। সে আরও বলে জগৎ দুঃখময় এবং দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলে প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীন মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং সেই কারণে দুঃখভোগী। মায়া এখানে কর্মাত্মিকা নয় ভ্রমাত্মিকা, অবিদ্যার অন্য নাম, মায়া এখানে আবরণাত্মিকা বা আচ্ছাদিকা। মায়ার দুটি রূপই সে স্বীকার করে এর অধিক কোনও তত্ত্বের মধ্যে না গিয়ে।

মায়া কর্মাত্মিকা প্রকৃতিই হোক বা আবরণাত্মিকা আত্মভ্রমই হোক লোকমনে দুটির সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে একটা কুহক বা ইন্দ্রজাল রচনা: ভোজবাজিতে মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা

থাকে, যা নাই তাকে আছে বলে প্রতিপন্ন কারবার, সুতরাং এটা শুধুই মতিভ্রম নয়, এই ভ্রম উৎপাদনের জন্য কার্যের প্রয়োজন। শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় এটি শুধুই একচর বৃত্তি নয়, একক মন্তব্য নয়, এটা দুজনের ব্যাপার, একজন ভোলাবে অন্যজন ভুলবে। অতএব মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মনে করতেই সাধারণ লোক অভ্যস্ত। মায়ার আর একটি অভিপ্রায় বা অর্থ লোকমনে আছে যার উদ্ভব-তত্ত্ব আমাদের জানা নাই। জৈব-চক্রাবর্তনকে অব্যাহত রাখতে যে স্নেহ প্রেম বাৎসল্য দরকার তাকেও সাধারণ ভাষায় মায়া বলা হয়, মমতার সঙ্গে জড়িত হয়ে যেটা শ্লাঘ্য রূপ নিয়েছে। সন্তানের প্রতি দুঃস্থের প্রতি পীড়িতের প্রতি মায়ামমতা না থাকলে সংসার অচল হয়ে যেত, কিন্তু এই সঞ্জীবনী শক্তিকেও অনর্থকারী হিসাবে দেখেছেন সংসারবিরাগী তাত্ত্বিক জন, তাঁরা বলেন এই মায়া জীবকে প্রলোভিত ভ্রান্ত আবদ্ধ করে, বারনারীর সকল আচরণ তাঁরা এর মধ্যে দেখতে পান। একটা দুর্বল হরিণ শিশুর প্রতি মমতায় ভরতের জড়ত্ব-প্রাপ্তি কি করে হয়েছিল তার দীর্ঘ বিবরণ দেন।

বৌদ্ধধর্মে মায়া বা মার এক বহিরাগত বস্তু, প্রলোভন ও প্রহার দুইই তার কাজ। জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মে দুষ্প্রবৃত্তির জনক অহ্রিমান, পরমেশ্বর আহুর মজ্‌দার শক্তিমান শত্রু। খৃষ্টধর্মে সয়তান ঈশ্বরের বিপক্ষীয়, তাঁর কর্তৃত্বাধীন নয়, সর্বদাই দুজনের দ্বন্দ্ব, এবং এইটাই সে ধর্মের সর্ববৃহৎ সমস্যা। হিন্দুধর্মে সয়তানের সমজাতীয় যদি কিছু থাকে সেটা মায়া এবং বৈষ্ণবধর্মে সব দ্বন্দ্বের নিরশন করা হয়েছে মায়াকে ভগবানের অধীন করে।

গীতায় মায়ার দুটি রূপই পাওয়া যায়। যেখানে মায়া দৈবী গুণময়ী[৫৮], সেখানে স্পষ্টতঃই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; যেখানে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর মায়ার দ্বারা জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালনা করেন[৫৯] সেখানেও মায়া কর্মরূপিণী, প্রভেদ এই যে এই মায়াকে করণরূপে ব্যবহার করে ঈশ্বর জীবের শুভ ও অশুভ দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু গুণময়ী মায়ার বেলায় এর হাত থেকে জীবকে রক্ষা করেন, সুতরাং মনে করা যেতে পারে গুণমায়ার কাজ সততই ক্ষতিকর; আর ভগবান যেখানে অজ হ'য়েও আত্মমায়ার প্রভাবে জন্মগ্রহণ করেন[৬০], সেখানে মায়া শুধুই ঘটন-পটিয়সী নয়, ঈশ্বরের উপরেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। এই সব কার্যকারী মায়ার অন্যদিকে আছে যোগমায়া[৬১], যাতে সমাবৃত হ'য়ে ভগবান সকলের নিকটে প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ মূঢ় লোক ভগবানকে জানতে পারে না। স্পষ্টতঃই এটি অজ্ঞানের সমজাতীয়, আবরণাত্মিকা মায়া।

ভাগবতে মায়ার উল্লেখ আছে দুইশত-বারের বেশী। সেখানে মায়া ছাড়া তাকে অন্য নামেও অভিহিত করা হয়েছে যেমন দেবমায়া, যোগমায়া, স্বমায়া, আত্মমায়া, ভাগবতীমায়া—অনেক

সময়ে তারতম্যবিচার না ক'রে যথেচ্ছেভাবে। কিন্তু তবুও একটা কার্যকরী বিভাজন পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে মায়ার যতগুলি বোধ্যরূপ উপরে আলোচিত হয়েছে তার সবগুলিই ভাগবতের বিপুল কলেবরে আছে।

ভাগবতের এক স্থানে[৬২] মায়ার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা মায়ার দুটি রূপ বোঝানো হয়েছে। অর্থ ব্যতিরেকে যে বস্তু প্রতীয়মান হয় অথচ আত্মায় (= পরমাত্মায়) প্রতীয়মান হয় না, তা-ই ভগবানের মায়া অর্থাৎ মায়া অনর্থক বা নঙর্থক, মায়া ভগবানের বা পরমাত্মার সৃষ্টি, অথচ তাঁর ওপর এর কোনও প্রভাব নাই। কিন্তু জীবাত্মার প্রতীয়মানতায় মায়া দুই প্রকারে পরমাত্মাকে বিকৃত বা পরিচ্ছিন্ন করতে পারে; এক, যেমন সূর্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব সূর্যবৎ প্রতীয়মান হলেও সূর্য নয়; দুই, মেঘে সূর্য আবৃত হ'লে সূর্যের অবলুপ্তি সত্য নয় মিথ্যা প্রতীতি। প্রথম ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মি বিক্ষিপ্ত, প্রতিফলিত হয়ে মনোরম হয়, তার আকর্ষণ আছে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সূর্য আবৃত, অদৃশ্য, মিথ্যা উপলব্ধির আশ্রয়। মায়ার দুটি রূপ-বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা — এই উপমার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। দৈবীমায়া এবং গুণময়ী মায়াকে পৃথক করা হয়েছে।[৬৩]

উভয়ক্ষেত্রেই মায়া বিমুখমোহিনী, ব্যক্তিগণকে ভগবৎবিমুখ করেন। দুষ্কৃতকারী মায়া ভগবানের সম্মুখে যেতে লজ্জা পান[৬৪]। এখানে স্পষ্টতঃই সাংখ্যদর্শনের ছায়া পড়েছে।[৬৫]

ভাগবতে মায়াকে নানাভাবে অভিহিত করা হয়েছে—ইন্দ্রজাল, অনির্বচনীয় শক্তি, প্রকৃতি, অজ্ঞান, কুহক, মোহ, দুর্জ্ঞেয় প্রভৃতি, কিন্তু আবরণ ও বিক্ষেপস্বরূপ দুটি প্রচলিত অর্থ ছাড়া যে বিশেষার্থে প্রযুক্ত হয়েছে এখন সেইটা বিচার্য। গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় চেষ্টা আছে, সেখানে[৬৬] চার রকম ভজনকারীর মধ্যে জ্ঞানীকেই দেওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ স্থান, কিন্তু ভাগবতে জ্ঞান ভক্তি-অর্জনের একটা ক্রমাবস্থা মাত্র। এখানেও বলা হয়েছে জ্ঞানী ঈশ্বরের প্রিয়তম,[৬৭] কিন্তু পরমাভক্তি লাভের জন্য ভক্তকে জ্ঞান আহুতি দিতে হবে,[৬৮] জ্ঞান সমর্পণ করতে হবে[৬৯], কর্মসন্ন্যাসের অণুকরণে যাকে বলা যেতে পারে বিদ্যা-সন্ন্যাস। অতএব ভক্তি এখানে জ্ঞানলভ্য কিন্তু পরে জ্ঞানের সার্থকতা নাই, কূলে এসে ভেলা ত্যাগ করা যায়। জ্ঞান বা বিদ্যা যদি ত্যজ্যবস্তু হয় তা হলে এও বহিরঙ্গ বস্তুর বা মায়ার অধিকরণে পড়ে।

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিনাম্
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে।
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়াঽনাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ [৭০]

হে উদ্ধব! শরীরীগণের বিদ্যা এবং অবিদ্যা আমার শক্তি, এবং

বন্ধ- ও মোক্ষ-কারিণী আমার অনাদি মায়া-নির্মিত বলে জানবে। হে মহামতি! জীব আমার একাংশ হ'লেও অবিদ্যাহেতু সে অনাদিকাল হ'তে বদ্ধ, বিদ্যার দ্বারা সে মুক্ত হয়। অর্থাৎ শুধু অবিদ্যাই মায়া নয়, যে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়ে মোক্ষলাভ হয় সেও মায়া কারণ ভক্তির উদয়ে বিদ্যার আবশ্যক থাকে না, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে দুটিকেই ফেলে দিতে হয়।

শাস্ত্রগত ঐতিহ্য থেকে অপসারিত হয়ে স্নেহ মমতা অর্থে মায়া শব্দের ব্যবহার ভাগবতে আছে। দুটি পাখী পরস্পরের প্রতি এবং সন্তানের প্রতি স্নেহানুরাগে বদ্ধ ছিল বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে,[৭১] এখানে স্পষ্টতঃই মায়া ব্যবহৃত হয়েছে স্নেহপ্রেমজনিত দুর্বলতার অর্থে। অন্যত্রও এই অর্থে মায়া প্রযুক্ত হয়েছে।[৭২] চণ্ডীতেও বলা হয়েছে মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়, পক্ষীগণ মমতা বশতঃ শাবককে আহার যোগায়।[৭৩] স্নেহমমতা অর্থে এই মায়া না থাকলে মায়া-আলোচক কোনও তাত্ত্বিকের জীবনধারণ সম্ভব হ'ত না, এটা জৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

মায়া বা প্রকৃতি যে নিয়মে কাজ করে সেটা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ নয়, কুহক বা ইন্দ্রজাল রচনা করলেও সেটা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে না, মানুষের সৃষ্ট ইন্দ্রজাল যেমন নৈসর্গিক নিয়ম অমান্য করে না, বিভ্রম উৎপাদন করে মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণের বেলায় প্রাকৃতিক-নিয়ম-লঙ্ঘনকারী কাজ প্রচুর আছে যা মায়ার সাধ্যাতীত, ভ্রূণকে যশোদার গর্ভ হ'তে রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তরিত করা প্রাকৃতিক নিয়মে সম্ভব নয়, সেখানে উদ্ভাবন করতে হয়েছে যোগমায়াকে,[৭৪] যিনি অপ্রাকৃতিক কার্য করতে পারেন; জীবগণে প্রযোজ্য মায়া কৃষ্ণ-সমন্বিত হ'য়ে হয়েছে যোগমায়া, এ এক অপ্রাকৃতিক শক্তি, স্ব-মায়া আত্ম-মায়া প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়েছে। নামের সাহায্যে মায়ার প্রকৃতি নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার, শ্লোকের প্রাসঙ্গিকতায় বুঝে নিতে হয়। যোগমায়ার প্রভাব জীবের উপরে নাই, মায়ার প্রভাব আছে। যোগমায়ার প্রভাব ভগবানের উপরে আছে, মায়ার প্রভাব নাই।

এই উচ্চকোটির মায়া বা যোগমায়া বিভিন্ন নামে ইতিহাসে পুরাণে অভিহিত। ইনি ঈশ্বরের সম্মাননীয় শক্তি বিশেষার্থে নিয়োজিত, এবং প্রথমে শিবের সঙ্গে নয় বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, নাম—নারায়ণী। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে ইনি নারয়ণ প্রিয়া কিন্তু যশোদাগর্ভসম্ভূতা,[৭৫] অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবে ইনি কৃষ্ণের অনুজা।[৭৬] শুম্ভনিশুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে ইনি বিষ্ণুমায়া,[৭৭] যশোদাগর্ভসম্ভবা, বিন্ধ্যবাসিনী। বহুনামের মধ্যে একনাম শাকম্ভরী।[৭৮]

যাকে বলরামের গর্ভ-স্থানান্তকরণ-রূপ অনৈসর্গিক কার্যে বিষ্ণু

নিযুক্ত করেন; হরিবংশে তাঁকে বলা হয়েছে "নিদ্রা"[৭৯], ইন্দ্রের ভগিনী, কৌশিকী, বিন্ধ্যপর্বতের অধিষ্ঠাত্রী,[৮০] যাঁর পূজা নবমী তিথিতে পশুবলি সহকারে হয়।[৮১] স্তুতিতে তাঁকে বলা হয়েছে[৮২] নারায়ণী, কাত্যয়নী, বিন্ধ্যবাসিনী, নন্দের কন্যা, বলরামের ভগিনী, মদ্য-মাংস-বলি-প্রিয়, শবর-বর্বর-পুলিন্দ-পূজিতা, বন্যজন্তু পরিবৃতা, পার্বতী, ইন্দ্রাণী। ইনি একনংশা, এবং কৃষ্ণকে রক্ষা করবার কারণে যদুকুলোদ্ভব সকলের পূজিতা।[৮৩] অন্যস্তবে তিনি চণ্ডী, আর্যা, বিষ্ণুর ভগিনী, কালী, কার্তিকের জননী, মহাদেবী দুর্গা।[৮৪]

মনে হয় আদিমজাতির পূজিত পশু-এবং-পশুমাংস—প্রিয় দেবীকে আর্যগোষ্ঠীতে তোলা হয়েছে, তিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বলে সবেমাত্র পরিচিত হচ্ছেন, কিন্তু এখনও মহামায়ার সম্পূর্ণ গৌরব পান নি। তিনি কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ, তবে তাঁর শক্তিরূপা নয়, কৃষ্ণের উপরে মোহবিস্তারেরও কোনও প্রভাব নাই।

বিষ্ণুপুরাণে এঁর নাম "যোগনিদ্রা"। ইনি যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠিত হন[৮৫] যখন কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন। ইনি বৈষ্ণবী মহামায়া[৮৬], শুম্ভ-নিশুম্ভ বিনাশক[৮৭], আর্যা, দুর্গা, অম্বিকা, ভদ্রকালী প্রভৃতি এঁর বহু নাম, সুরা মাংস দ্বারা এঁর পূজা হয়।[৮৮]

ভাগবতেও এঁর অনেক নাম, ভদ্রকালী, বৈষ্ণবী, চন্ডিকা, কন্যকা, নারায়ণী, ঈশানী, অম্বিকা ইত্যাদি, ইনি কৃষ্ণের অনুজা।[৮৯]

মায়ার নাম এবং রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে চণ্ডীতে, সেখানে তিনি মায়া বা যোগমায়া নয়, মহামায়া বা বৈষ্ণবী মায়া, এবং বলেছেন তিনি যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন।[৯০] মহামায়া কারও আজ্ঞাবহ নয়, স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত মহিমময়ী জগৎকর্ত্রী, যেন সশক্তিক ব্রহ্ম। প্রভেদ এই যে তিনি জ্ঞানলভ্য নয়, জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করে' মোহাবৃত করেন, আবার প্রসন্ন হলে মুক্তিলাভের জন্য বরপ্রদান করেন। তিনি পরমা বিদ্যারূপিণী, সনাতনী, সংসার-বন্ধন ও সংসারমুক্তির কারণস্বরূপ।[৯১] জীবগোস্বামী এঁকে কৃষ্ণের ভগিনী-ভাবময়ী একাংশ শক্তি বলেছেন।[৯২]

এই সবগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মায়াকল্পনা সৃষ্ট হয়েছে। যে মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যার কারণ, দেহী জীবগণের বন্ধন ও মুক্তির হেতুস্বরূপ, সে মায়া জীবমায়া[৯৩], যে মায়া প্রকৃতির সমার্থক সে মায়া গুণমায়া। জীবমায়া সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, গুণমায়া উপাদান কারণ, দুটিই ভগবানের শক্তিবিশেষ, সুতরাং ভগবানই সৃষ্টির মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।[৯৪] "মায়ানাম বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকা শক্তিঃ"[৯৫]

"মায়ার যে দুই বৃত্তি "মায়া" আর "প্রধান"।
"মায়া" নিমিত্ত হেতু, বিশ্বের উপাদান "প্রধান"॥[৯৬]

ভাগবতে স্নেহ মমতা অর্থে মায়ার যে আভাস আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে তাঁকে বিস্তৃত ক'রে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। গৌড়ীয় ধর্মে ভগবৎ-ভক্তি স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মায়ামমতাকে উচ্চমূল্য দেওয়া হয়েছে। মায়ার কাজ মোহ সৃষ্টি করা, সে মোহন-কার্য যদি জীবকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ রাখে তা'হলে মায়ার কাজ হীন, সে মোহ যদি ভক্তকে ঈশ্বর সেবায় মোহিত করে রাখে বা লীলার সহায় হেতু স্বয়ং ঈশ্বর মায়াকে নিয়োজিত করেন, তা'হলে মায়ার ভূমিকা প্রশংশনীয়, তার স্থান উচ্চে। জীবগোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন ভগবৎ-প্রেম-সম্বন্ধে ভক্তের মায়া মোহ তন্দ্রা ইত্যাদি দোষ নয় গুণ।[৯৭]

যে সকল চিত্তবৃত্তির অনুশীলনে যথাভাবানুরূপ দেহপ্রাপ্তিতে কৃষ্ণ সেবার সুযোগ আছে, তার মধ্যে কামভাব, সহজপ্রণয়, বাৎসল্য প্রভৃতি আছে, সুতরাং ভক্তির সঙ্গে মোহও আছে।[৯৮] মোহ এখানে রিপু নয়, জীব গোস্বামী টীকায় বলেছেন মোহ অর্থে সর্ববিস্মরণময় ভাব যার ফলে পরব্রহ্ম-প্রতীতি হয় অর্থাৎ ভক্ত যেখানে জগৎ-বিস্মৃত হয়ে ভগবৎ-বিষয়ে মোহিত হয়ে থাকেন।[৯৯]

দেখা যাচ্ছে মায়ার বিদ্যাশক্তিই জীবকে ভক্তির পথে আনয়ন করে। বিদ্যা মায়া-শক্তির বৃত্তি, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি নয়, এবং মায়াশক্তির এই বৃত্তিই ভক্তিমার্গের প্রবেশদ্বার। মায়া এখানে উন্মুখ মোহিনী তিনি ভগবানের প্রতি ভক্তকে উন্মুখ ক'রে মুগ্ধ ক'রে আনন্দ আস্বাদন করান।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে জীব নিত্যমুক্ত, অবিদ্যার প্রভাবে নিজেকে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক মনে করে, ভ্রান্তি দূর হ'লেই জীবের ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। এটা শুধুই জ্ঞানের ব্যাপার কোনও অবস্থা-পরিবর্তন নয়, কোনও ক্রিয়ার অবকাশ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে "তদেবমনন্তা এব জীবাখ্যাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ং একবর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ অন্যত্ত্বনাদিত এব ভগবৎপরাঙ্মুখঃ স্বভাবত স্তদীয় জ্ঞানভাবাত্তদীয় জ্ঞানাভাবাচ্চ।"[১০০] এই অনন্তপরিমাণ তটস্থাশক্তির জীবের দুইটি বর্গ, তন্মধ্যে একটি বর্গ অনাদিকাল হতে ভগবৎ-উন্মুখ অন্যটি অনাদিকাল হ'তে ভগবৎ-পরাঙ্মুখ, ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব-প্রযুক্তই এরকমটি হয়েছে। ভগবৎ-জ্ঞান হওয়ার ফলে অনাদিকাল হ'তে ভগবৎ-উন্মুখ অথচ এখনও জীবাবস্থায় আছে এমন কল্পনা শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেই সম্ভবে, কারণ এ ধর্মে মুক্তি সুদুর্লভ। অতএব এই মতবাদে জীবকে নিত্যমুক্ত বলা যায় না। জীব তটস্থা, তার অণুমাত্র স্বরূপ-শক্তি আবৃত আছে বিশাল মায়াশক্তিতে, তার যে উপাদানটি মুক্ত সেই স্বরূপ-শক্তির পরিমাণ অতি সামান্য। জীব শুদ্ধ হলেও মায়া-কবলিত হওয়ার কারণে অনাদি-বহির্মুখ ও অনর্থ-প্রাপ্ত। স্বরূপে অবস্থিতি মুক্তি[১০১],

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস সুতরাং দাসভাবে অবস্থিতিই মুক্তি। কৃষ্ণ-পরিকর নিত্য-মুক্ত জীব আছেন বটে, কিন্তু তারা সংখ্যায় সামান্য, অধিকাংশ জীব নিত্যবদ্ধ, অবিদ্যাযুক্ত, কর্মফলভোগকামী, দেহস্থ না হয়েও নিজেকে দেহস্থ মনে করে, আমি কর্তা এইরূপ অভিমান আছে,[১০২] ভগবান সম্বন্ধে নিত্য-বহির্মুখ।[১০৩] সাধনার ফলে বর্হিমুখতা দূর হয়ে সেবার বাসনা জাগলে জীব কৃষ্ণসন্মুখ হয়, মুক্ত হয়। এটি অবস্থান্তর, বহুলাংশে ক্রিয়াসাপেক্ষ। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়লে চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণের পূর্বে গ্রহণকালে গ্রহণের পরেও চন্দ্র পূর্ণ, কিন্তু গ্রহণকালে সন্দেহ হয় চাঁদ আছে কিনা; অদ্বৈতবেদান্ত মতে জীব ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বেও মুক্ত পরেও মুক্ত, শুধু অবিদ্যার ছায়া অপসারিত হওয়া দরকার। অপর দিকে অমাবস্যর চাঁদ ষোলকলা অতিক্রম করে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে বদ্ধজীব দীর্ঘ সাধনার ফলে ক্রমবিকশিত হ'য়ে মুক্ত জীবে পরিণত হয়। এঁরা পরিণামবাদে বিশ্বাসী, এই মুক্তি ক্রমমুক্তি শুধু জ্ঞানের ব্যাপার নয় ক্রিয়ার ব্যাপার, সেবা সাধনার ব্যাপার।

আমাদের শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে যার আদি নাই তার অন্তও নাই, কিন্তু বর্তমান-ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, বহির্মুখত্ব অনাদি হলেও তার অন্ত-সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যৎ-ভক্তির ফলস্বরূপে।

জীব স্বয়ং চিদ্রূপ হ'লেও মায়া কর্তৃক সম্মোহিত হয়[১০৪] মায়ার কার্য ভগবৎ-বহির্মুখ জীবের সম্মোহন। জীবগোস্বামী বলেছেন[১০৫] মানুষের রসাস্বাদিনী বৃত্তি তার প্রকৃতিসিদ্ধ, এর ফলে আজীবন তার সুখভোগের স্পৃহা, এবং এই স্পৃহা এমন যে ভোগে চরিতার্থ হয় না, জীবের আকাঙ্খা কখনও মেটে না। সুখাস্বাদনের সব প্রতিবন্ধক তার কাছে দুঃখ, সেকারণে সুখার্থী জীব সব দুঃখের অবসান চায়। এই রসাস্বাদন প্রবৃত্তি যখন পার্থিব ভোগসুখে লিপ্ত থাকে তখন দুঃখের অবসান হয় না, সংসারভোগই নূতন দুঃখের সৃষ্টি করে, এই আজন্ম-প্রবৃত্তি যখন পারমার্থিক সুখের আস্বাদন-প্রবণ হয় তখনই দুঃখের অবসান হয়। জীবের সুখভোগ-প্রবৃত্তি যখন তাকে পার্থিব ভোগসুখে লিপ্ত করে তখন বলা হয় সে মায়াকবলিত, ভগবৎ-বিমুখ, মায়ামুক্ত হলে সে ভগবৎ-সম্মুখ হয়।[১০৬] এই মতানুসারে মানুষের একটি প্রবল স্পৃহা তাকে ঈশ্বর-বিমুখ করে' অশ্রেয়স্কর আপাতসুখে নিমজ্জিত রাখে এবং সেই সুখাস্বাদ-স্পৃহাকেই অন্যগতিমুখে দুঃখবিমুক্ত ভাগবৎ-সেবা-সুখেই নিযুক্ত করা যায়। এখানে আরও মন্তব্য এই যে সুখ-লালসার যে-বৈশিষ্ট্য তাকে ভোগে অতৃপ্ত রাখে সেই বৈশিষ্ট্যই ভগবৎ-প্রেমিকের আকাঙ্খাময় উল্লাসের রূপে বরণীয় হয়ে ওঠে। অতএব মানুষের স্বভাবগত সুখলিপ্সা মায়ার প্রভাবে তাকে

সংসার সুখে নিমজ্জিত রাখতে পারে আবার সেই মনোগতিই মায়ামুক্ত হয়ে তাকে ভগবৎ-মুখী করতে পারে। অর্থাৎ বাসনা পরিবর্তিত হয় প্রীতিতে যেটি হ্লাদিনীর বৃত্তি।

মায়ার বন্ধন ও প্রভাব পারমার্থিক, কারণ মায়া পরমার্থের আজ্ঞাবহ শক্তিবিশেষ, সংসারভোগ ও তজ্জনিত সুখদুঃখাদি অনুভব যা আত্মার বন্ধনস্বরূপ সে সব মিথ্যা নয়, অতএব বন্ধন কল্পনামাত্র নয়, সত্য। সুতরাং জ্ঞান দ্বার এ প্রভাব নিবৃত্ত হ'তে পারে না, জীব মায়ার প্রভাবমুক্ত হ'তে পারে শুধু ভক্তির দ্বার।[১০৭] শঙ্করাচার্য-সংজ্ঞিত মায়ার ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মায়াকেও বলা যেতে পারে সদসদ্‌বিলক্ষণ, যে ভগবৎ-বিমুখ জীব মায়াবদ্ধ তার কাছে মায়া সৎ, আর যে ভক্তির প্রভাবে মায়াকে নিরর্থক করেছে তার কাছে মায়া অসৎ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মায়ার ধারণা অনন্যসাধারণ, তাতে নূতন তাজা হাওয়ার আমেজ আছে। তিনি মায়াকে চিত্রিত করেছেন কুহকিনীরূপে নয় শাস্তা রূপে, মায়া মায়াবিনী নয় দন্ডদাত্রী ঃ

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস
× × × ×
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।
কভূ স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়
দন্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়।
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।
শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনারে জানান
"কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা" জীবের হয় জ্ঞান।"[১০৮]

"নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বর্হির্মুখ
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।
সেই দোষে মায়াপিশাচী দন্ড করে তারে
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জারি তারে মারে।
× × × ×
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।"[১০৯]

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস হয়েও নিত্য কৃষ্ণ-বর্হিমুখ অনাদিকাল থেকে। এটা মায়ার প্রভাবে ঘটে নি জীব নিজেই এই দুষ্প্রবৃত্তির কারণ, এমনটি ঘটবার পরে—"অতএব" "সেই দোষে" মায়া তাকে

দুঃখ শাস্তি দিয়েছে। মায়া জীবকে ফাঁদে ফেলে' 'আবদ্ধ করে' রাখছে না, তাকে শাস্তি দিয়ে জাগিয়ে তুলে ভগবৎ-উন্মুখ করছে, ভগবৎ-সম্মুখতার অনুকূল কার্যই করছে। রাজ-অনুচর দন্ডার্হ জনকে একবার নদীতে চুবায় একবার তুলে ধরে, তুলে ধরাটা ক্ষমাচিহ্ন নয় বারবার চুবাবাব জন্য আবশ্যক, তেমনিই মায়া স্বর্গে পাঠায় পুরস্কার স্বরূপ সুখভোগের জন্য নয়, নরকবাসের যন্ত্রণা তীব্রতর করবার জন্য। মায়া মোহিত করে না—এখানে মুগ্ধ অর্থে মূর্ছিত—শাস্তিপ্রভাবে মূর্ছিত জন কৃষ্ণবিষয়ে জ্ঞানশূন্য। সাধু গুরু ও পরমাত্মার কৃপায় তার মূর্ছাভঙ্গ হয় তখন সে জানতে পারে কৃষ্ণই তার পরম আশ্রয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হলে মায়া শাস্তি হতে অব্যাহতি দেয়। সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতির চেষ্টা পুরুষ যাতে নিজের পৃথকত্ব উপলব্ধি করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে।[১১০]

বৈষ্ণব-বেদান্তে বিশেষোক্তি করা হয়েছে যে ব্রহ্ম মায়াতীত, মায়াধীশ, মায়াশক্তির প্রভাব শুধু জড়বস্তুর এবং জীবদেহের উপরে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে মায়ার নয় যোগমায়ার প্রভাব আছে কৃষ্ণের উপরে এবং তাঁর পরিকরদের উপরে, যাঁরা স্বরূপশক্তির অংশ। একমতে কৃষ্ণপ্রেয়সীরা স্বকীয়া কিন্তু তাদের পরকীয়া ভাবে দেখেন কৃষ্ণ নিজে এবং তাঁর পরিকররা। গোপীরা রাসক্রীড়ায় গেলেন কিন্তু তাঁদের স্বামীরা মনে করলেন তাঁরা শয্যাপার্শ্বেই আছেন। এঁরা কৃষ্ণপরিকর অথচ সকলেই আত্মবিস্মৃত। কৃষ্ণ এবং পরিকররা যোগমায়ার বশ।

## হ্লাদিনী শক্তি

আনন্দ—স্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি হ্লাদিনী। ব্রহ্মের আনন্দ- স্বরূপতা উপনিষদে ব্যক্ত হয়েছে—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, ন বিভেতি কদাচন"[১১১] সেই ব্রহ্মানন্দকে জানলে কখনও ভয় হয় না।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসং-বিশন্তি।"[১১২] আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানলেন। কারণ আনন্দ হতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়। জাত হয়ে আনন্দের দ্বারা জীবনধারণ করে' এবং (বিনাশ কালে) আনন্দে প্রতিগমন করে' বিলীন হয়।

"কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"[১১৩] যদি আকাশে (= হৃদয়াকাশে) আনন্দ না থাকতেন তবে কেই বা প্রাণধারণ করত?

"আত্মা আনন্দময়ঃ"[১১৪]

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"[১১৫] আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ

যে (আত্মা) বিশেষরূপে স্ফুরিত হ'ন।

"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ"।[১১৬] যিনি কেবল অনুভূতিস্বরূপ ও আনন্দময়।

"এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি[১১৭]"। ইহাই (ব্রাহ্মীস্থিতি) এর (= জীবের) পরম আনন্দ, অপর প্রাণিগণ এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বনে জীবনধারণ করে।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" [১১৮] আনন্দময়ের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ।

কৃষ্ণদাস বলেছেন "হ্লাদিনীর সার প্রেম"[১১৯], অতএব প্রেমভক্তি বা সাধ্যভক্তি হ্লাদিনী-সঞ্জাত, এবং যেহেতু হ্লাদিনী শক্তি জীবভক্তে সামান্যই আছে অতএব প্রেমভক্তি লাভ ভগবৎ-অনুগ্রহ-নির্ভর। অবশ্য এটি সাধ্যভক্তির সমন্ধেই প্রযোজ্য সাধন-ভক্তির সম্বন্ধে নয়। পদ্মপুরাণের মতে এবং রামানুজের মতে[১২০] জীব চিদানন্দস্বরূপ, অতএব মনে করা যেতে পারে হ্লাদিনী শক্তির সামান্য অংশ তার আছে।

রাধা হলাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, কৃষ্ণের শক্তি মূর্ত হয়েছে রাধাতে। ভগবৎ-প্রেয়সী ব্রজগোপীগণ হ্লাদিনী শক্তির অংশ, এঁরা রাধার কায়ব্যূহ।

বেদ-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের একটি বিশেষত্ব এই যে সকল দেবতাই সাক্ষাৎ-অধিগম্য, স্তবস্তুতি করতে হ'লে সরাসরি তাঁদেরই করা হয়, মধ্যস্থ কেউ নাই যাঁর সুপারিশ-মতন দেবতা কাজ করেন। এবিষয়ে খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম্ হ'তে বৈদিক হিন্দুধর্ম ভিন্ন। সকল দেবতারই স্ত্রীরূপে দেবী আছেন, তাঁরা দেবের কার্যকলাপের— সৃষ্টিস্থিতিলয়ের, ভক্তবাৎসল্যের, বরদানের, অবতারিত্বের—অংশী নয়, শুধু ঐশ্বর্যের অংশী। যজ্ঞভাগ নিতে হ'লে বা বর দিতে হ'লে পুরুষ দেবতা একলাই আসতেন স্ত্রীসমভিব্যাহারে নয়, তাঁর সঙ্গে বা অপর কারও সঙ্গে পরামর্শ করে নয়, এ বিষয়ে দেবীরা ছিলেন পরদানশীন, গ্রীক দেবীদের মতন ষড়যন্ত্রে যোগ দিতেন না। পরে কিছু দেবী নিজগুণে পূজিতা হ'তে লাগলেন যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা — এঁদের স্বামীরা রইলেন আড়ালে; কিন্তু কোনও দেবীর পূজাতেও মধ্যস্থের আবশ্যক নাই। কিন্তু যে সব বৈষ্ণব মত গড়ে উঠলো সেই সব ভক্তি-শাস্ত্রে দেবের অংশভাক্ রূপে দেবীর প্রাধান্য বাড়লো, শ্রী বা লক্ষ্মী বা রাধা শুধু দেবতার স্ত্রী হিসাবে পূরক হিসাবে নয়, সমপর্যায়ে গৃহীত হ'তে লাগলেন, দেবতার প্রসাদ বিতরণের অধিকার লাভ করলেন। পঞ্চরাত্রমতে বিষ্ণুর শক্তিরূপে লক্ষ্মী আরাধ্যা, লক্ষ্মীর অনুগ্রহে জীব মুক্তিলাভ করে, লক্ষ্মীর প্রসাদ ভিন্ন সম্ভব নয়। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে লক্ষ্মীর অনুগ্রহের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে[১২০ক]। রামানুজ প্রবর্তিত শ্রী-সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী জীব ও ভগবানের মধ্যস্থা, করুণাময়ী,

কল্যানময়ী। গোপালতাপনীতে রুক্মিণীকে বলা হয়েছে "জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি"[১২১] পদ্মপুরাণে[১২২] কৃষ্ণ রুদ্রকে বলছেন "অতএব সর্বপ্রকার যত্নসহকারে আমার প্রিয়ার (= রাধিকার) শরণাপন্ন হ'বে, যদি আমাকে বশ করতে চাও তাহ'লে আমার প্রিয়ার শরণ নাও।"

এর চরম স্বীকৃতি এল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে যেখানে কৃষ্ণ পূজিত হলেন রাধার সহিত যুগলে, যেখানে কৃষ্ণের এক প্রধান শক্তি রাধা, রাধাকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকল্পনা নিরর্থক।[১২৩] তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দেবীরা স্ব স্ব দেবের শক্তি, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু দেবরা নিজ নিজ দেবীর সহিত অচ্ছেদ্য পাশে বদ্ধ যুগনদ্ধ-রূপে পূজিত। এই ধর্মের প্রভাব বঙ্গদেশে প্রবল ছিল, হয়ত বা এরই প্রভাবে রাধাকে কৃষ্ণের শক্তিরূপে কল্পনা ক'রে রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার প্রচলন হয়েছে। এই ভাব পুষ্ট হয়েছে চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ রূপে দেখবার প্রয়াসে।

তিনটি রূপে রাধা আমাদের কাছে প্রতিভাত—তিনি কৃষ্ণের শক্তিরূপা মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি; তিনি কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম প্রেয়সী; আবার তিনিই কৃষ্ণের নিজসৃষ্ট পরিকর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ভক্তদের মধ্যে প্রধান। তত্ত্বপ্রণেতারা এর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখতে পান নি কিন্তু পদকর্তারা এই দুরূহতার মধ্যে না গিয়ে রাধিকাকে অনুরাগময়ী প্রেয়সী বলেই চিত্রিত করেছেন, শক্তি ও ভক্তির তত্ত্বের সঙ্গে লিপ্ত না হয়ে।

লক্ষ্মীর স্তুতি করেছেন ইন্দ্র[১২৪], রাধার স্তোত্র রচনা রূপ-গোস্বামী, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি করেছেন। মহাজন-পদাবলীতে রাধার স্তব যৎসামান্য।

## সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্ব

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সহিত জীবের যে চিরাগত অংশ-অংশী সম্বন্ধ বা সম্যক বন্ধন, তা'কে বলা হয় "সম্বন্ধ তত্ত্ব"। অবিদ্যাহেতু জীব এই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়, জ্ঞানের ততটুকুই প্রয়োজন যে টুকুতে এই সম্বন্ধজ্ঞান জীবহৃদয়ে জাগরূক হ'তে পারে। সাধনার গোড়ার দিকে তাই জ্ঞানের উপযোগিতা স্বীকৃত, ভক্তির উদয়ের পরে আর জ্ঞানের সার্থকতা নাই। দ্বিতীয় তত্ত্ব "অভিধেয় তত্ত্ব" অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ অভিষ্ট বস্তু পাবার জন্য যে ক্রিয়া আবশ্যক বা প্রাপ্তির যে উপায় তা-ই অভিধেয়। এর জন্য সাধন-ভক্তি কর্তব্য এবং এইটাই অভিধেয়।

"ভগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়।
সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম।"[১২৫]

তৃতীয় তত্ত্ব প্রয়োজন তত্ত্ব, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে ভক্তির সাধনা ও

উপাসনা করা হয়। এই প্রয়োজনও ভক্তি, কিন্তু সাধনভক্তির চেয়ে উচ্চস্তরের ভক্তি—কেবলাভক্তি বা প্রেমভক্তি। পরম প্রীতির সহিত ভগবানের সেবার লালসাই ভক্তের তীব্র বাসনা, ভক্তের একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র প্রয়োজন।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম্

× × × ×

পরম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।"[১২৬]

যে উপাসনা হ'তে পরতত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় সেই উপাসনা অভিধেয়ের লক্ষণ, এবং পরতত্ত্বের অনুভব এর প্রয়োজন। এই অনুভব অন্তঃ ও বহিঃ সাক্ষাৎকার-রূপ।[১২৭]

## প্রমাণ ও লক্ষণ

বেদই একমাত্র প্রমাণ। বেদকে পূরণ করে বলেই পুরাণ নাম। ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। ভাগবত পুরাণ সর্ব বেদ পুরাণ ইতিহাসের সার এবং ব্রহ্মসূত্রেরও ভাষ্যস্থানীয়, অতএব শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রীধরস্বামীকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা যতটুকু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুকূল ততটুকুই জীব গোস্বামী গ্রহণ করেছেন।[১২৮] গরুড় পুরাণের বচন উদ্ধৃত ক'রে জীবগোস্বমী বলেছেন ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য প্রকাশক অর্থ, এই গ্রন্থে মহাভারতের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণীত হয়েছে, এটি গায়ত্রীমন্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ, বেদের গূঢ়ার্থ এতে বিশ্লেষিত হয়েছে, পুরাণের মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ, যেমন বেদের মধ্যে সামবেদ।[১২৯]

শব্দপ্রমাণ ছাড়াও ভক্তিবিদ্যাবিশারদ্ যা অনুভব করেন তা-ও শ্রেষ্ঠ এবং গ্রহীতব্য প্রমাণ—

"সর্বপ্রমাণচয়চূড়ামণিভূতো বিদ্বদনুভব এবাত্র প্রমাণম্"[১৩০]

নিখিল প্রমাণসমূহের চূড়ামণিস্বরূপ বিদ্বানের অনুভবই এস্থলে প্রমাণ।

যে চিহ্ন বস্তুর প্রকৃতিগত, অঙ্গীভূত, সদাবর্তমান, স্বতঃপ্রকাশ, সেই পরিচয়-নির্দেশক লক্ষণকে স্বরূপলক্ষণ বলে। আর যা ব্যবহারগত, ক্রিয়ায় উপলব্ধ, ব্যুৎপত্তিলভ্য, যার আবির্ভাব তিরোভাব আছে, সেটি তটস্থ লক্ষণ। অগ্নির উজ্জ্বল বর্ণ স্বরূপ লক্ষণ, দাহিকা শক্তি তটস্থ লক্ষণ।

"আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ লক্ষণ
কার্য দ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ লক্ষণ।"[১৩১]

## অচিন্ত্য ভেদাভেদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি বিশেষ তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, এটি জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক সমীক্ষা। পূর্ববর্তীকালের যে সব নিরুক্তির সঙ্গে এর ভেদাভেদ আছে তাদের

সামান্য পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মে কোথাও অভেদ কোথাও ভেদ বলা হয়েছে, দার্শনিকরা ভাষ্যের যুক্তিজালে এ সবের নিজপক্ষ-সমর্থনকারী ব্যাখ্যা করেছেন। "তত্ত্বমসি" "সোহহং" অভেদজনক উক্তি, "দ্বা সুপর্ণা" স্পষ্টতঃই ভেদজ্ঞাপক।

শক্তির স্বরূপ এবং ক্রিয়া যে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার সে ইঙ্গিত বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায়।

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ১৩২"।

সকল ভাববস্তুর শক্তিসমূহ অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য বিষয়ের সংজ্ঞাঃ "অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্"১৩৩, অচিন্ত্য বিষয় সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি প্রয়োগ করবে না; প্রকৃতির অতীত যা তাই অচিন্ত্য লক্ষণযুক্ত।

ভেদাভেদবাদের চৈতন্যপূর্ব প্রবক্তা আরও আছেন যেমন ভাস্করাচার্য এবং নিম্বার্ক। এঁদের মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় মতবাদের সাম্য বৈষম্য দুই-ই আছে। ভাস্করের মতে অসীম ব্রহ্ম অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধির যোগে সসীম জীবরূপে পরিণত হ'ন, জীব ব্রহ্মের ভোক্তৃশক্তি, সংসার দশায় জীব ভোক্তা, মুক্ত অবস্থায় নয়। অনুরূপ ভাবে ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হ'ন। অতএব ব্রহ্মের দুটি রূপ, কারণরূপ ও কার্যরূপ, কারণরূপে এক এবং অদ্বিতীয়, কার্যরূপে তিনি বহু; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের কার্য। মুক্ত অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হ'তে অভিন্ন, স্বরূপতঃ বিভু; সংসার দশায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, জীব সংখ্যায় বহু, পরিমাণে অণু। জীব ও জগৎ সত্য কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য। উপাধির অন্তে জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যায়, ঘট ভগ্ন হ'লে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশে যায়। কারণরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-ও-জগতের সম্বন্ধ অভেদ, এই সম্বন্ধ স্বাভাবিক, নিত্য। ব্রহ্মের সহিত ঔপাধিক এবং সাময়িক জীব-ও-জগতের ভেদ সম্বন্ধ, এটি আগন্তুক অনিত্য। এই মতবাদ গৌড়ীয় আচার্যদের স্বীকৃত নয় কারণ এই মতে অন্তিমে জীব-ব্রহ্মের প্রভেদ বিলুপ্ত হ'য়ে যায়।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈত মতে ব্রহ্ম জগতের অতীত, আবার জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম কারণ, পূর্ণ বা অংশী, বিভু, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, জীব কার্য, অংশ, অণু, নিয়ন্ত্রিত, অল্পজ্ঞ; অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে, মুক্ত অবস্থাতেও জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে। ব্রহ্ম জগতে প্রকাশিত, জীব ব্রহ্ম-নির্ভর—এই অর্থে জীব-ও-জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ; ব্রহ্ম জগৎ-অতীত,—এই অর্থে ভেদ। এখানেও সেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ, সুতরাং ভিন্ন এবং অভিন্ন দুই-ই বলা যায়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাস্য কৃষ্ণ এবং রাধা। শরণাগতিই মুক্তিলাভের উপায়।

রামানুজ ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন না, তাঁর মতে জীব ও জগৎ সত্য এবং ব্রহ্মের আশ্রিত; জীব-ও-জগৎ ব্রহ্মের শরীর-স্থানীয়, ব্রহ্ম শরীর—অন্তর্যামীরূপে জীবের মধ্যে এবং পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পৃথিবীর মধ্যে ব্রহ্ম অবস্থান করেন। জীব-ও-জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, ব্রহ্ম বিশেষ্য, এ দুয়ের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ। জীব গোস্বামী এ সম্বন্ধ স্বীকার করেন নি কারণ (১) ব্রহ্ম চিদ্-বস্তু, জগৎ জড়-বস্তু, এ দুটির দেহ-দেহী সম্বন্ধ হ'লে এ দুয়ের স্বগত ভেদ আছে স্বীকার করতে হয়। জীব গোস্বামীর মতে এ দুয়ের সম্বন্ধ শক্তি ও শক্তিমানের। (২) জগৎ বিকারশীল, ব্রহ্মের বিকারশীল দেহ অসম্ভব। (৩) জীব-ও-জগৎ যদি ব্রহ্মের শরীর হয় তা হ'লে এই শরীর হ'ল ব্রহ্মের সীমা, কিন্তু আসলে ব্রহ্ম অসীম। জীব-ও-জগৎকে বিশেষণ হিসাবে দেখলেও এই সীমার ভাব আসে, তা ছাড়া বিশেষ্য-বিশেষণে অভেদ-সম্বন্ধ হ'লেও তাদের ধর্মে ভেদ আছে। ভাস্করাচার্য ও নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদও জীবগোস্বামীর মান্য নয় কারণ জীব ও ব্রহ্মকে যদি কার্য-কারণ সম্বন্ধরূপে দেখা যায় তাহলে জীবের যতকিছু দোষের কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকেই দোষী করতে হয়, অথচ ব্রহ্মে কোনও দোষ স্পর্শে না। জীব গোস্বামী তাই শক্তিমানের সহিত শক্তির সম্বন্ধকে করলেন জীব-জগৎ-ব্রহ্ম সম্বন্ধের মূলভিত্তি। ভেদসম্বন্ধ ও অভেদসম্বন্ধ পরিস্ফুট করবার জন্য ব্রহ্মের শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হ'ল কারণ শক্তির ভিন্নতা আছে তারতম্য আছে, সুতরাং শক্তির বিশেষত্বের সাহায্যে ব্রহ্ম এবং জীব-ও-জগতের ধর্মগত প্রভেদের ব্যাখ্যা সহজতর হয়।[১৩৩ক]

নির্ধারণ এ নয় যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি হ'তে উদ্ভূত, নির্ধারণ এই যে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি। মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ, পশুর জীবনক্রিয়া, মানুষের সহস্রমুখ নির্মাণ—এ সবই ব্রহ্মের শক্তির পরিচায়ক। শক্তিমানের সহিত শক্তির যে সম্বন্ধ ব্রহ্মের সহিত জীব-ও-জগতের সেই সম্বন্ধ। জীব গোস্বামীর মতে শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নরূপ চিন্তা করা যায় না ব'লে উহাদের ভেদ মনে হয়, আবার আত্যন্তিক ভেদ স্বীকৃত হ'লে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হ'য়ে শক্তির পৃথক অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। ভগবান চিৎ-স্বরূপ, জীব-শক্তিও চিৎ-স্বরূপ, অতএব উভয়ের মধ্যে চিদাংশে অভেদ; অন্যদিকে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিয়ন্তা, জীব সে সব কিছুই নয়, জীবকে মায়া বশীভূত করতে পারে ব্রহ্মকে পারে না, এই সব চিহ্নগুলি সূচনা করে ভেদ। এবং এই যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ভাব অচিন্ত্য অর্থাৎ এর কোনও ব্যাখ্যা নাই। "তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ অভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।"[১৩৪] স্বরূপ থেকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না ব'লে তার (= শক্তির)

ভেদ (প্রতীত হয়), ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না ব'লে অভেদ প্রতীত হয়। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই স্বীকার করতে হয় এবং এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্‌ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদনির্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নামসমঞ্জসঃ।"[১৩৫] তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশের কারণে শক্তিমান থেকে পৃথকভাবে শক্তির ধারণা করা যায় না ব'লে কখনও অভেদ প্রতীয়মান হয় এবং শক্তিমান থেকে শক্তির পার্থক্য দর্শন হেতু কখনও ভেদ নির্দিষ্ট হয়।

"অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্মর্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি।......স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।"[১৩৬] তর্কের দ্বারা কোনও কিছুর প্রতিষ্ঠা হয় না, ভেদেও যেমন অভেদেও তেমনিই অসীম দোষ-সমূহ দৃষ্ট হওয়ায়, ভিন্নতারূপে চিন্তা করার অসমর্থতা হেতু অভেদ সাধনা ক'রে, তেমনিই অভিন্নতারূপে চিন্তা করার অসমর্থতা হেতু ভেদ সাধনা ক'রে এঁরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। অচিন্ত্যশক্তিময়ত্ব হেতু স্বীয়মতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সিদ্ধ।

কোনও বস্তুর শক্তি সেই বস্তু হ'তে অতিরিক্ত কিছু নয়, কস্তুরীর গন্ধ কস্তুরীর অংশ, আগুনের উত্তাপ আগুনই, দুটিকে পৃথকভাবে ভাবা যায় না, সুতরাং উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ। আবার আগুনের ভিতরে এবং বাহিরে দহন-শক্তির তারতম্য আছে, কস্তুরীর সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের ইতিহাস তা'র গন্ধের ইতিহাস হ'তে ভিন্ন, সুতরাং এখানে ভেদ। সমুদ্র ও তরঙ্গ, সূর্য ও কিরণ, এ সব দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়। জীব ঈশ্বরের রশ্মি ও পরমাণু স্থানীয়।[১৩৭]

জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধের সঙ্গে সমীকৃত ক'রে এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শুধুই যে বাঙালীর শক্তি-আরাধনার প্রধান্যের প্রতি ইঙ্গিত করলেন তা-ই নয়, এই ভিত্তিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'ল চৈতন্য-তত্ত্ব, চৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার সেটা প্রতিপন্ন করতে, রাধাকে শক্তি কৃষ্ণকে শক্তিমান রূপে দেখার কারণে, এবং শক্তি-শক্তিমানের সহজমিলনের সম্ভাব্যতায় রাধাকৃষ্ণের যুগল-বিগ্রহ চৈতন্যাবতারের ধারণা সু-গ্রহণীয় হ'ল।

এ বিষয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কয়েকটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতৈক্য নাই[১৩৮], শেষোক্ত সম্প্রদায়েরা শক্তি ও শক্তিমানের শুধুই

ভেদ স্বীকার করেন। কিন্তু যেখানে জীবের পৃথক সত্ত্বা না থাকলে ভক্তের অস্তিত্ব থাকে না অথচ অদ্বয়তত্ত্ব অব্যাহত রাখবার জন্য জীবকে তত্ত্ব হিসাবে না দেখে শক্তি হিসাবে দেখতে হয় এবং শক্তিমান ও শক্তির ভিন্নতা অভিন্নতা কিছুই বলা যায় না, সেখানে অচিন্ত্যভেদাভেদ মানা ছাড়া উপায় নাই।

শুধুই যে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ অচিন্ত্য তা-ই নয়, আরও কিছু অচিন্ত্য বিষয় আছে। অদ্বৈতবেদান্ত মতে শক্তি অস্বীকৃত, কারণ ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হ'লে তাঁর বিকারত্ব স্বীকার করতে হয় অথচ ব্রহ্ম যে বিকারশীল এ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জগৎ-রূপে পরিণত হয়েও ব্রহ্ম অবিকৃত, বিকার প্রাপ্ত হয় তাঁর শক্তি। শক্তি বিকারপ্রাপ্ত হ'লেও শক্তিমানের পরিবর্তন হয় না, এই পরিণাম যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না, এমনটি হয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে।[১৩৯]

ভগবান নরবপু অথচ তিনি সর্বব্যাপী, অচিন্ত্যশক্তি ভিন্ন এর সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। ভগবান সগুণ এই অর্থে যে তাঁর গুণসকল অপ্রাকৃত, প্রাকৃত জীবের পক্ষে এই গুণের অনুধাবন সম্ভব শুধু ভক্তির প্রভাবে। এ-ও এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।"[১৪০]

অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, তিনি আনন্দ অনুভব করেন না, আনন্দ দেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণ আনন্দরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে বিতরণ করেন। অতএব আনন্দ কৃষ্ণ হ'তে পৃথক বস্তু, কৃষ্ণ যদি সুখ আস্বাদন করেন তা হলে তিনি সুখরূপ হ'তে পারেন না। এখানে স্বতঃই বচন-বিরোধ আসে অতএব এর সম্ভাব্যতা স্বীকার করতে হ'লে অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই।

ভগবানের মায়াশক্তি জীবকে সংসারবদ্ধ রাখতে চায়, স্বরূপশক্তি মুক্তিদায়ী, অথচ বিপরীত-স্বভাব এ দুটি শক্তি ভগবদাশ্রিত হয়ে নির্বিবাদে একসঙ্গে বাস্ করছে, দ্বন্দ্বের কোনও চিহ্ন নাই, অন্য কোনও পরিস্থিতিতে এটা অকল্পনীয়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নরলীলা অথচ বৃন্দাবনের কিছুই মৃন্ময় পার্থিব নয়, সবই চিন্ময় অপ্রাকৃত—পশুপাখী নদী গিরি পর্যন্ত সবই অসম্ভাব্য, অতিকৃত। ভাগবতে এ ভাবটি নাই, এটি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কল্পনা, ব্রহ্মসংহিতা থেকে নেওয়া।[১৪১] এইরূপ পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি কল্পনা অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব ভিন্ন হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত সম্বন্ধ-বিচার যে এমন এক অনির্ণেয় বহুসম্ভাবনাময় সিদ্ধান্তে উপনীত হ'বে সেটা জেনে বহুকাল আগে জৈনদর্শনে স্যাদ্‌বাদের উদ্ভব হয়েছে—"এও হয় তাও হয়।"

আধ্যাত্মিক আলোচনায় বোধ হয় এর বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। ভেদ এবং অভেদের দৃষ্টান্ত দেওয়ায় বিশেষ কৃতিত্ব নাই, কবিরা যে সব উপমা ব্যবহার করেন তা'র প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যের লম্বা তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রকৃতিগত সম্বন্ধের বিচার না ক'রে ব্যবহারিক সম্বন্ধের বিচার অনেক বেশী কার্যকর ও হিতকর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য তা-ও করেছেন।

বিষ্ণুর আবাস বৈকুণ্ঠলোকে সেখানকার ক্রিয়াকাণ্ড লেখা হয়েছে, তিনি যে সব অবতার-রূপে মর্ত্যে ঘটনা-লিপ্ত হয়েছিলেন, তারও দীর্ঘ কাহিনী আছে, একটি অন্যের দ্বিত্ব নয়। কিন্তু যাঁরা কৃষ্ণকে অবতার নয় পরমতত্ত্ব মনে করেন, তাঁদের কাছে কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গেই শেষ হ'তে পারে না, তাই তাঁদের মতে কৃষ্ণের মর্ত্যলীলা ছাড়াও এক প্রস্ত অপ্রকট লীলা আছে। কিন্তু বলা হয়েছে কৃষ্ণের অপ্রকট লীলা তাঁর নরলীলার সঙ্গে এক, শুধু অসুর-বধ-আদি ঐশ্বর্য-বর্জিত এবং পরকীয়া-অভিমান-হীন। হয়ত সেজন্যই অপ্রকট লীলার স্বতন্ত্র বর্ণনা সামান্যই আছে। কিন্তু ঘটনাবহুল রস-বৈচিত্রী-সমৃদ্ধ বহু-জন-পোষিত পার্থিব প্রেমলীলার এক বিরাট ক্ষেত্র থাকার দরুন, ভগবানের সঙ্গে জীব-ও-জগতের সম্বন্ধ জটিল। কৃষ্ণের লীলাস্থল কয়েকটি—অপ্রাকৃত গোলোক, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা। তাঁর প্রেয়সীর কেউ স্বকীয়া কোউ পরকীয়া, কারও ঐশ্বর্যজ্ঞান আছে কারও নাই। তাঁর পরিকর-ভক্ত কয়েক শ্রেণীর—নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত জীব, সাধন-সিদ্ধ জীব—তা ছাড়া মরজগতের সাধক ভক্ত আছে। তাঁকে ভক্তি করা যেতে পারে কয়েক উপায়ে, জীবের মুক্তি সম্ভব কয়েকটি প্রকারে, বিদেহ-মুক্তির পরেও ভক্তির বিভিন্ন স্তর উত্তরণ করতে হয়। এ সবের মধ্যে একটি সুনির্ধারিত নির্দিষ্ট ক্রমবিন্যাস, উচ্চাবচতা আছে। কৃষ্ণ জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা, কিন্তু এ সব শক্তিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে তাঁর সদা-প্রেমিক রসাস্বাদী রূপটিকেই উজ্জ্বল রেখেছেন গৌড়জন। অতএব জীব-ও-জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ এখানে জটিল, এবং অকল্পনীয় অচিন্ত্যশক্তির আশ্রয়ে ভেদাভেদের উভয়-কোটি-সংযুক্ত হওয়া ছাড়া গ্রন্থিমোচনের উপায় ছিল না। শক্তির কয়েকটি স্তর এবং প্রকার, এক শক্তির উপর অন্য শক্তির নির্ভরতা, শক্তির ভাগাংশের তারতম্য অনুসারে আত্মপ্রতিষ্ঠার তারতম্য—মান পরিমাণের এমন পল্লবিত বহুলীকরণ না করলে ব্যাখ্যা সম্ভব হ'ত না।

## বিবিধ মতবাদ

**গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে নাম ও নামী এক।**

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।"[১৪২]

নামরূপ চিন্তামণি এবং চৈতন্য-রসবিগ্রহ কৃষ্ণ (উভয়েই) পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত,' কারন নাম ও নামী অভিন্ন। নাম ও রূপ যে পরমবস্তুর অভিধামাত্র, পরিবর্তনশীল বিনাশী নামরূপ যে পরমপদার্থ হ'তে পারে না, এটি ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারণার একটি ভিত্তি। একে অবলুপ্ত ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'ল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিপরীত মত। কিন্তু এই মতবাদের ঐতিহাসিক কারণ আছে। হিন্দুর দুর্গ্রহ যে সে ঈশ্বরকে রূপ দিয়ে মূর্তি দিয়ে পূজা করেছে এবং ঈশ্বরের ধ্যানরূপ ও মূর্তরূপকে একচক্ষে দেখেছে, সুতরাং বিগ্রহের অপমানে পরমার্থেরই অপমান। ইহুদিরা সে চক্ষে তাদের ঈশ্বরকে দেখে নি, সমগ্র জাতি বহু শতাব্দী ধ'রে নির্যাতিত হয়েও তাদের উপাসিত য়াহ্ওয়ের সত্ত্বাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে কারণ তাদের ঈশ্বর মনোময়, বিগ্রহাত্মক নয়। কিন্তু হিন্দুর দেবমূর্তি ম্লেচ্ছহস্তে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপাস্য লাঞ্ছিত হয়েছেন। প্রতীক কল্পনার এইখানেই দুর্বলতা, ধ্যানবস্তুকে অপদস্থ করা যায় না কিন্তু মূর্ত প্রতীককে ধুলিসাৎ করা সম্ভব ও সহজ। নাম ও নামীকে একাত্ম করা ছিল সে যুগে ধর্মরক্ষার ফলবতী উপায়, মূর্তিকে ধ্বংস বা দূষিত করা যায় কিন্তু অমূর্ত নামকে অশুচি করবার কোনও প্রক্রিয়া নাই।

কিন্তু এই কৌশল সার্থক হয় নি কারণ এর সমান্তরালে ছিল আর একটি সিদ্ধান্ত—বিগ্রহ মূর্তি ভগবৎ-স্বরূপ হ'তে অভিন্ন।[১৪৩] এই দুটি অভিমত আজও পাশাপাশি হিন্দুধর্মে চলছে।

কৃষ্ণের দেহ লীলা ইত্যাদি অপ্রাকৃত অথচ স্বপ্রকাশ।[১৪৪] অপ্রাকৃতত্ব হেতু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর অবধারণা হ'তে পারে না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হ'লে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি সম্ভব।

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের কৃষ্ণসেবার ভগবদ্ভজনের এবং গুরু হওয়ার অধিকার আছে।

"কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার"[১৪৫]

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়।"[১৪৬]

নরহরি সরকার, নরোত্তম দাস, শ্যামানন্দ—এঁরা ব্রাহ্মণ না হ'লেও এঁদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামানন্দ রায় কায়স্থ হ'লেও চৈতন্য তাঁর উপদেশ শিষ্যোচিত শ্রদ্ধায় নিয়েছেন। ভক্তপ্রধান হরিদাস ছিলেন যবন, তাঁকে আলিঙ্গন করতে চৈতন্যের কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

চারটি বেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অধিক মিল দেখা যায়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ভেদাভেদবাদের উপর

প্রতিষ্ঠিত এবং এঁদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণ, এই দুটি প্রধান বিশেষত্ব নিম্বার্ক ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সমান সম্পত্তি। মধুরভাবে সেবা বা প্রেমভক্তি, সর্বদা লীলার অনুধ্যান এ সব গৌড়ীয় মতবাদ নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ে কাল-নির্ধারণের একান্ত অভাব, সুতরাং এ সব বিষয়ে যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের অস্তিত্বকাল সম্বন্ধে সমূহসংশয় আছে, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই সম্প্রদায়ের কাছে কখন এবং কতটা গ্রহণ করেছেন তা জানবার উপায় নাই। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও পুষ্টিমার্গ বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির অনুরূপ, বল্লভাচার্য সম্প্রদায় "গোপীজনবল্লভ" কৃষ্ণের উপাসক, রাধারও উপাসক।

ভগবান মানুষের সংস্পর্শে আসেন তিন প্রকারে। এক, সাক্ষাৎ—প্রকটরূপ, যখন সকলেই তাঁকে দেখতে পায়। দুই, আবেশ—ভক্তের দেহমনে ভগবান আপনার বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করেন, ভক্ত তখন স্বকীয় স্বভাবের পরিবর্তে আবিষ্ট শক্তির প্রেরণাতে পরিচালিত হন। তিন, আবির্ভাব—বিশেষ ভক্তের সাক্ষাতে ভগবান নিজের রূপ প্রকটিত করেন, তখন সেই ভক্ত ভগবানকে দেখতে পান, অন্য কেউ নিকটে থাকলেও পায় না। কৃষ্ণের ব্রজলীলা সাক্ষাৎ বা প্রকট।

ঈশ্বরের অবতার বা পুত্র বা দূত পৃথিবীতে জন্ম নেন এমন কথা সব ধর্মেই আছে, তাঁরা শিষ্য সখা ভক্ত সঙ্গে নিয়ে আসেন না পৃথিবীতেই সংগ্রহ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব এই যে ভগবানের অনুচর পরিকররা পৃথিবীবাসী নয়, অবতীর্ণ হয়েছেন ভগবানের সঙ্গে। এর কারণ এ নয় যে কৃষ্ণকে ভক্তিরস যোগাতে পারে এমন উপযুক্ত ভক্ত পৃথিবীতে পাওয়া যেত না; কারণ এই-যে বৈষ্ণবতত্ত্বে বৃন্দাবনলীলায় গোপীদের পরকীয়াত্ব অভিমান বা অভিনয়, কৃষ্ণের জন্ম ও শৈশবাবস্থাও তাই, কারণ ঈশ্বরের জন্ম বা শৈশব হ'তে পারে না। অতএব এই অভিনয়ের উপযোগী পাত্রপাত্রী উপকরণ সব কিছুই কৃষ্ণের সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।

## কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ

কৃষ্ণের মর্ত্যে আগমনের বা নরলীলা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ? গীতায় ভগবান বলেছেন[১৪৭] যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন ক'রে ধর্মসংস্থাপনার জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন। হরিবংশে[১৪৮] এই কথাই আছে। ভাগবতেও এই আদর্শের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়—

"যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়োবৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ।"[১৪৯]

যে যে সময়ে জগতে ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেই সেই সময়ে জগদীশ্বর ভগবান হরি আত্মপ্রকাশ করেন। ধর্মসংস্থাপন এবং ভূভার হরণের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল।[১৫০] ভূরিভারে অবসন্না অবনীর ভারাবতরণের নিমিত্ত কিম্বা কামকর্মাদি অবিদ্যাক্লিষ্ট মানবকে ভক্তিধর্ম শিক্ষনার্থ কৃষ্ণের অবতারিত্ব।[১৫১] কৃষ্ণের জন্ম ভক্তিযোগ-বিধানার্থ।[১৫২]

বিষ্ণু পুরাণে কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য দুরাত্মাদের শাস্তিদান এবং পৃথিবীর ভার হরণ।[১৫৩]

এমন কি গীতগোবিন্দেও আছে যে কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করেছেন।[১৫৪]

কিন্তু এই ভাগবতেই আদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে রাসলীলায়। সেখানে আছে যে জীবগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক মানুষী তনু গ্রহণ ক'রে ভগবান এমন সব ক্রীড়া করেন যা শুনে (লোক সমূহ) তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়—

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।"[১৫৫]

পাঠান্তর ভূতানাং/ভক্তানাং; দেহমাস্থিত/দেহমাশ্রিত। লোকসমূহকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট অনুরক্ত করবার জন্য কৃষ্ণ যে সমস্ত কার্য করেছেন, ভাগবতের আখ্যানে তার মধ্যে অসুরবধাদি শ্লাঘনীয় ব্যাপার আছে। কালিয়দমন ক'রে যমুনার জল নির্মল ক'রে, অতিবৃষ্টির সময়ে লোকত্রাণ ক'রে কৃষ্ণ জনগণের হিতসাধন করলেন—এ সব ঘটনাও আছে। লোকহিতের জন্য সৎসাহসিক বীরত্ব যাঁরা দেখান তাঁরা অব্যতিক্রমে সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হ'ন। কিন্তু ভক্ত এ সব উপেক্ষা করেছেন, তাঁর কাছে লোক-আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় রাসলীলা।

অনুরূপ উক্তি অন্যত্র আছে—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ"[১৫৬] আমার ভক্তের চিত্তবিনোদনের জন্য আমি বিবিধ ক্রিয়া করি।

গীতার ভগবান সর্বমানবের কল্যাণের জন্য বারে বারে আবির্ভূত হ'ন, যে সাধুর ত্রাণহেতু বা যে দুষ্কৃতের নাশ হেতু তাঁর আগমন তা'রা তাঁর ভক্ত বা বিদ্বেষী কিনা সে বিচার তিনি করেন না, যে ধর্ম তিনি স্থাপন করেন সেটা বর্ণাশ্রম ধর্ম বা আর কোনও ধর্ম না হয়ে শুধু উচ্চনৈতিক মানবধর্ম হওয়াই সম্ভব। এই ভগবান বিশ্বমানবের ভগবান, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। কিন্তু সে উচ্চ আদর্শ পরিবর্তিত হ'ল, ভগবান লোক-আকর্ষণ করবার জন্য তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য ক্রীড়া করেন, যেন এই উপায়ে কোনও সম্প্রদায় বা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে লোককে টেনে নিতে চান। লোকের পরিত্রাণ নয় তাকে আমোদিত হৃষ্ট করাই এখানে মুখ্য

উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের আবির্ভাব এখানে লোকপালনের মহাপুরুষোচিৎ শক্তিমান কার্য থেকে অনেক দূরে। তাঁর মধ্যে জ্ঞানবলক্রিয়ার কোনও প্রকাশ নাই, এ সবকে ভক্তের মধ্যে বিকশিত করবার কোনও প্রয়াস নাই।

ভগবান ভক্তের চিত্তবিনোদন করেন দুই প্রকারে : এক, ভক্তের সেবা গ্রহণ ক'রে, আর, ভক্তকে রসাস্বাদন করিয়ে। কৃষ্ণ সেবা গ্রহণ করেন শুধু পরিকর ভক্তদের কারণ তারাই সখ্য-মধুরাদি ভাবে সেবার অধিকারী, তারাই সান্নিধ্যে আসতে পায়। জীবভক্ত শুধু মূর্তির পূজা অর্চনা করতে পারে, মানস-কল্পনাতেও কৃষ্ণের নিকটে থেকে ইচ্ছানুরূপ সেবার অধিকার তার নাই। অতএব সে শুধু লীলাকথা শ্রবণ ক'রে রস-আস্বাদনের অধিকারী। তার প্রবৃত্তি এখন ফেনিল রস আস্বাদন করা, এবং ভগবানও তার অভীপ্সা পূরণ ক'রে তা'কে কৃতার্থ করলেন।

"রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি"[১৫৭] অর্থাৎ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন প্রেমরসের নির্যাস আস্বাদনের জন্য। গোলোকে রসবৈচিত্রীর অভাব নাই, সব রসই কৃষ্ণ সম্ভোগ করেছেন, একমাত্র পরকীয়া রস সেখানে নাই সুতরাং অনুমান অসঙ্গত হবে না যে সেই বিশেষ রসের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[১৫৮] পরকীয়া প্রেমে পরস্পরের যে উৎকণ্ঠা বর্ধিত হয় এবং রসাস্বাদনের যে চমৎকারিত্ব জন্মায় তা অপ্রকট লীলায় লব্ধ হয় না। কৃষ্ণের মর্ত্যে আবির্ভাবের কারণ যেন আরও ক্ষুদ্র-পরিসর হ'ল।

জীব গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই তত্ত্বে নূতনত্ব আনলেন, আবির্ভাব-কারণকে মুখ্য ও গৌণ এই দুইভাগে ভাগ ক'রে। জীব গোস্বামীর মতে ভূভার হরণ বা বিশ্বের মঙ্গলসাধন কৃষ্ণাবতরণের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ স্বীয় পরিকর-ভক্ত-গণের আনন্দ-চমৎকারিত্ব বর্ধন, ভক্তের চিত্তবিনোদন।[১৫৯] কৃষ্ণ বলেছেন ভূভার হরণ অতি সামান্য কার্য, আমার একটি কেশও তা করতে পারে। "অত্র ভারাবতারণং দেবাদীনামিচ্ছয়া তদিদন্তু ঔপপত্যন্তু তস্য স্বেচ্ছয়েতি হি গম্যতে।"[১৬০] ভূভার হরণ করা হয়েছে দেবতাদের ইচ্ছায়, আর ঔপপত্য সম্পাদিত হয়েছে (কৃষ্ণের) নিজের ইচ্ছায়, অতএব প্রথমটি অনিচ্ছাকৃত ব'লে গৌণ মনে করা যেতে পারে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিভাগ মেনেছেন—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ।"[১৬১]

"আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ
যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম্ ॥"[১৬২]

দুষ্টের বিনাশ ক'রে ভূভার হরণ গৌণ উদ্দেশ্য, যাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ও কবি একেবারেই পরিহার করেছেন। মূল উদ্দেশ্য দুটি— কৃষ্ণ আস্বাদন করবেন প্রেমরসের সারভাগ (যার সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন) এবং সাধারণ লোকের লাভ হ'বে রাগমার্গে ভক্তির সঞ্চার। এই দুটি স্পৃহার সৃষ্টি হয়েছে কৃষ্ণের দুটি গুণ থেকে—রসজ্ঞতা ও কারুণ্য। প্রথমটির গুণে কৃষ্ণের নিজের বাসনা-তৃপ্তি হয়েছে, দ্বিতীয়টির প্রসাদে ভক্ত পেয়েছে রাগমার্গে ভক্তির পরম সম্পদ। ভাগবতে[১৬৩] রাগমার্গে ভক্তিধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে।

"যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম।"[১৬৪]

মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রথমটির সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিস্তারিত উক্তি ঃ

"বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ
দোঁহার রূপে গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে কভু না মিলে—দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ
এই দ্বারে করিব সর্বভক্তের প্রসাদ॥"[১৬৫]

কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সমগ্রভাবে দেখলে এক শক্তিশালী পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় যিনি ছিলেন আভীরগোষ্ঠীর স্বীকৃত নেতা, যিনি দানব-রাক্ষস-সর্প-রূপী আততায়ীদের নিহত ক'রে অদ্যুষিত দেশকে বিপদমুক্ত ক'রে শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিলেন, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দেশবাসী ইন্দ্রের পরিবর্তে তাঁকেই দেবরূপে পূজা করেছিল। এমন সুদর্শন শৌর্য-বীর্য-শালী পুরুষকে যে কিছু নারী আত্মসমর্পণ করবে এটা দুর্গ্রাহ্য নয়। অভাবনীয় শুধু এই যে কালক্রমে লোকমনে তিনি ধনুর্বানচ্যুত কীরিটহীন হয়ে শুধু বংশীধারী মাল্যবান রসিক পুরুষ ব'লে পরিজ্ঞাত হ'লেন, যদিও তাঁর গোবর্ধনধারণ কালীয়দমন প্রভৃতি কীর্তি অবশিষ্ট রইল। শেষে সব শৌর্যবীর্য-বিনির্মুক্ত হয়ে তিনি হ'লেন একান্ত গোপবালাদের কান্ত, পরদার-অভিলাষী বিলাসী পুরুষ, অন্যদিকে তিনি পেলেন ঈশ্বর পদ, পরাভক্তির একান্ত বিষয়। ঈশ্বরকে দুষ্টের দমন-ও-জগৎ-পালন-রূপ মহৎকর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে শুধু পরদার-অভিলাষী ব'লে চিত্রিত করতে ভক্তের বাধলো না, বরং তিনি গর্ব অনুভব করলেন। দেশের

রাষ্ট্রিক ও নৈতিক অবনতির সঙ্গে লোকমনে যে পরিবর্তন এল তা'র প্রভাব এই ক্রমিক পালাবদলের ওপর ক্রিয়াশীল। দেশের ইতিহাস পরিবর্তন করল মানুষের মনকে, লোকমানস নূতন রূপ দিল ঈশ্বরকে।

অবশ্য এর সমর্থনে বলা যায় যেখানে রোগ দুরারোগ্য সেখানে চিকিৎসকের প্রথম কর্তব্য যন্ত্রণা লাঘব করা, পরে রোগের নিদান সন্ধান ক'রে তা'কে দূর করবার চেষ্টা করা; যেখানে রাজ-অত্যাচার অপ্রতিষেধ্য সেখানে লোকের চেষ্টা বাহুবলের চেয়ে যে কোনও প্রকারের সান্ত্বনা সঞ্চয় করা। মুসলমান যুগে বাংলার ভাগ্য বিপর্যস্ত দেশ বিধ্বস্ত, এমন অবস্থায় ভগবান কৃষ্ণকে জগৎ-শাসন কার্যে অক্ষমতার জন্য অভিযোগ না ক'রে ভক্ত সান্ত্বনা পেল এই ভেবে যে জগতের মঙ্গলসিদ্ধি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে গৌণ বা আনুষঙ্গিক, তাঁর মুখ্য কাজ পরকীয়া প্রেমরস আস্বাদন, এবং এ বিষয়ে যে তাঁর অবহেলা নাই এই অবধানকে আপৎকালের বিশেষ ন্যায় রূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্তই হয়েছিল।

গীতায়[১৬৬] কৃষ্ণ বলেছেন আমাকে যে জন যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেই-ভাবেই তুষ্ট করি। এই কথাই অন্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃতে এবং ভাগবতে।

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।"[১৬৭]
"আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।"[১৬৮]

ভজ্ ধাতুর একটা অর্থ গ্রহণ করা, to accept, কৃষ্ণের বেলায় সেই অর্থেই নিতে হবে।

"ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ।"[১৬৯]

মানুষ যে ভাবে দেবতাদের আরাধনা করে, তার (=মানুষের) কর্মানুসারে দেবতারাও ছায়ার ন্যায় ফল প্রদান করেন। কিন্তু সাধুগণ সর্বদাই প্রীতিযুক্ত তাঁরা কোনও কর্মের প্রত্যাশা করেন না। এই মর্মের কথা ভাগবতের অন্যত্রও আছে।[১৭০] এ সবে স্বীকৃত হয়েছে যে ঈশ্বর-কল্পনার পূর্ণ অধিকার ভক্তের আছে, ঈশ্বরের স্থির রূপ গুণ ক্রিয়া উদ্দেশ্য নাই, ভক্ত তাঁকে মনোমত গ'ড়ে নিতে পারে। আমাদের শাস্ত্রকাররা যে কথা ধর্মমর্যাদার হানি না ক'রে কৌশলে বললেন, নাস্তিক সেটাকে রুক্ষ ভাষায় বলেন যে ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি।

নির্জীব বাঙালী যখন আফগান ও তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারল না তখন দেখল যে ভাগ্যবিধাতাকে নূতন ছাঁচে গ'ড়ে নিতে হ'বে। অশক্ত মজ্জাহীন জনগণের ভগবানও হ'লেন নিরস্ত্র

কামমোহিত; রাষ্ট্র-অধিকার-বঞ্চিত, কর্মক্ষেত্র-সঙ্কুচিত, গৃহবন্ধ লোকের কল্পনায় ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন অসুর-সংহারের তুচ্ছ কারণে নয়, পরদার-গমনের মুখ্য অভিপ্রায়ে। বাঙালীকে তিন শত বৎসর অপেক্ষা করতে হ'ল দশপ্রহরণ-ধারিণী দেবতাকে আহ্বানের জন্য।

## চৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ

চৈতন্যের স্বরূপ এবং তাঁর আবির্ভাবের কারণ কৃষ্ণের সহিত এমন নিকট-সম্বন্ধিত যে তৎসম্বন্ধে আলোচনা এই প্রসঙ্গে করলে অসমীচীন হবে না।

চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব খ্যাপন সর্বপ্রথমে তিনি নিজেই করেছিলেন। বালক বয়সে তিনি গঙ্গার ঘাটে পূজার্থী কন্যাদেরকে বলতেন আমাকে পূজা কর আমি বর দেব, মহেশ্বর গঙ্গা দুর্গা আমার দাসদাসী।[১৭১] এই ঈশ-চেষ্টা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় যখন তিনি অদ্বৈতের নিকটে রামাই পণ্ডিতকে দিয়ে সংবাদ পাঠালেন চৈতন্যের পূজার উপকরণ নিয়ে হাজির হবার জন্য।[১৭২] শ্রীবাসের গৃহে ঈশ্বরাবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসলেন, অদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন, তাঁর মাথায় চরণ দিলেন।[১৭৩] ভক্তরা তখন তাঁর অভিষেক করলেন। এ সব তিনি স্বরূপে স্ব-ভাবে করেছেন, কোনও দেবতার আবেশের ভরে নয়।

মন্ত্রদীক্ষা নেবার পরে নবদ্বীপে অবস্থান কালে চৈতন্যের সময় ব্যয়িত হ'ত সঙ্গীদের সঙ্গে প্রধানতঃ তিনটি ভাব অবলম্বন ক'রে— (১) বিষ্ণু কৃষ্ণ বা অন্য কোনও দেবতার ভাবে আবিষ্ট হয়ে, অনেক সময়ে চর্তুর্ভুজ্ ষড়ভুজ মূর্তি ধ'রে। এর সম্ভাব্যতা এই আলোচনার বাইরে। (২) নিজেকে স্বয়ম্ভর ঈশ্বর উপলব্ধি ক'রে নিজরূপে সর্বসমক্ষে ঈশভাব প্রকাশিত ক'রে এবং ভক্তদের কাছ থেকে পূজাস্তুতিনতি দাবী করে'। (৩) তদ্বিপরীত দাস্যভাবে বিভাবিত হয়ে পরম বিনতির সহিত সকলের চরণ কামনা ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে।[১৭৪]

ঈশ্বর ব'লে তাঁকে স্বীকার করলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে প্রথম অদ্বৈত[১৭৫], দ্বিতীয় শ্রীবাস[১৭৬], তৃতীয় মুরারি[১৭৭], চতুর্থ নিত্যানন্দ[১৭৮], পরে সকলেই।[১৭৯] চৈতন্যের ঈশ্বরভাব এমন অবিমিশ্র ছিল যে প্রবীণ ভক্তদের মাথায় তিনি অনায়াসে চরণ তুলে দিয়েছেন। মুসলমানের অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দুরা এমন একজন ত্রাণকর্তারই আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছিলেন যাঁর ঔদ্ধত্য নবাববাদশাদের হৃদয়েও সন্ত্রাস আনবে। কিন্তু চৈতন্যের ঈশ্বরভাব স্থায়ী হয় নি।

চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার, বিশেষত্ব এই যে তিনি এ অবতারে

১৪৮। ভাগবত ১০/২৯/২৭
১৪৯। ভাগবত ১০/২৯/৩২, ১০/৪৬/৪
১৫০। প্রীতিসন্দর্ভ ১৯৯
১৫১। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১০২
১৫২। ভাগবত ১০/৩২/১০
১৫৩। রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৬৫০
১৫৪। .রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৬৪৯
১৫৫। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "বৈষ্ণব রস-সাহিত্য", পৃঃ ১১৫, ১৯৯
১৫৬। Mysticism by Evelyn Underhill, chapter "Ecstasy and Rapture" pp, 369, 377
১৫৭। ধর্মতত্ত্ব, সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়, চিত্তরঞ্জনীবৃত্তি
১৫৮। Complete Works published by Advaita Ashram Vol III p. 257
১৫৯। History of Sanskrit Literature p. 291
১৬০। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের বৈষ্ণব সাহিত্য পৃঃ ৮১
১৬১। Gaudiya Vaishnava Studies by A. K. Majumdar p. 32
১৬২। The Wonder that was India, p. 305
১৬৩। প্রেমধর্ম পৃ ২৬৯

## ॥ ৪ ॥
## রসতত্ত্ব

### রসশাস্ত্রের প্রাধান্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বিশেষত্ব রসতত্ত্ব। কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্পর্ক নিবিড় কিন্তু রসতত্ত্ব ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এমনটি দেখা যায় শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেলায়। শুধু সঙ্গীতের সরস সম্পাদনায় অর্থাৎ কীর্তনের রসসৃষ্টি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ধর্মানুষ্ঠান সমাপ্ত হ'তে পারে, অন্য কোনও উপচারের বিহনে তার অঙ্গহানি হয় না।

রস-সম্পর্কিত উপায়ে পরমপুরুষের পরিচয়-চেষ্টা ধর্ম-সমর্থিত ও সফল হ'ত না যদি না এ বিষয়ে একটি প্রাচীন ঐতিহ্য থাকত। উপনিষদে বলা হয়েছে—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি"[১] তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব রসকেই লাভ ক'রে আনন্দিত হয়। "স এষ রসানাং রসতমঃ"[২] উহাই রসসমূহের মধ্যে রসতম।

"বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর—রোধকম্
স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ।"[৩]

বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের অন্য কার্যরোধক এবং শুধু নিজের কারণাদি-সম্বন্ধিত (অর্থাৎ বিশেষ কারণে ঘটিত মনোবৃত্তিজাত) যে চমৎকারী সুখ তা'কে রস বলে। চমৎকারিত্ব অর্থে অনির্বচনীয় অনুভূতি। একমাত্র ভগবৎ-বিষয়ে এই চমৎকারিত্ব ক্ষয়হীন, নবনবায়মান; সুতরাং এই সুখ ভগবৎ-সম্বন্ধিত হ'লে তবেই উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর হয়। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি[৪]; রসঘনবিগ্রহ; অসমোর্ধ্ব-মাধুর্যময় অর্থাৎ যাঁর সমান বা যাঁর অপেক্ষা অধিক মাধুর্য কারও নাই; সর্বাত্ম-বিস্মাপন, সকলের বিস্ময়জনক। বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যায় আস্বাদ্য বস্তুই রস নয়, যিনি আস্বাদক তিনিও রস। অতএব রস হিসাবে কৃষ্ণ রসাস্বাদ্য এবং রসাস্বাদক বা রসিক উভয়ই; কিন্তু রস যেখানে ভক্তিরস সেখানে কৃষ্ণ রসের বিষয়, আশ্রয় নয়, কারণ তিনি ভক্তিরসের উৎস, এই রস-স্বরূপতা তাঁর হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ।

## অলঙ্কারশাস্ত্রে রস

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব আলোচনার আগে সনাতন অলঙ্কারশাস্ত্রের রস-বিষয়ক মূল বক্তব্যের অনুধাবন-চেষ্টা করা যেতে পারে।

কাব্যের দুটি রূপ, দৃশ্যকাব্য বা নাট্য এবং শ্রব্যকাব্য যাকে বর্তমানে কাব্য বলা হয়। এদের ব্যবস্থিত আলোচনা আরম্ভ হয়েছে প্রথমে নাটকের বিশ্লেষণ, প্রকৃতি-নিরূপণ, সংজ্ঞা-নির্ধারণ দিয়ে এবং বর্তমানে লব্ধ রচনার মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র সর্বপ্রাচীন, এটির ভিত্তি রসবাদ। ভরত পূর্বসূরীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় রসতত্ত্বের চর্চা ভরতের আগে থেকেই ছিল। ভরতের আলোচনা সীমায়িত নাটকের লক্ষণাবলীর এবং প্রবুদ্ধ সমালোচনার ক্ষেত্রে, তার পরেও আলঙ্কারিকরা রসালোচনা নাটকের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রেখেছেন, কাব্যের ক্ষেত্রে রসকে গুরুত্ব দেন নি। বোধ হয় আনন্দবর্ধনই ( নবম খৃষ্টাব্দ ) প্রথমে রসতত্ত্বকে কাব্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিতত্ত্বের যোগসাধন করলেন। তারপরে এলেন রসশাস্ত্রের প্রতিভাধর প্রবক্তা অভিনব গুপ্ত, তিনি আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের "লোচন" টীকা এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের "অভিনবভারতী" টীকা রচনা ক'রে শুধুই যে এ দুটি বিশিষ্ট পন্থার মেলবন্ধন করলেন তাই নয়, মূল্যবান অভিমত এবং তত্ত্বসৃষ্টির দ্বারা ভবিষ্যত আলঙ্কারিকদের দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ হ'লেন। তখন থেকে রসতত্ত্ব দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যে সমানভাবে উপযোজিত হ'ল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রসবিষয়ে লক্ষণসূত্র এই :— "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

প্রথমতঃ, বিভাবাদি কিসের সহিত সংযুক্ত হ'লে রস-নিষ্পত্তি হবে তার উল্লেখ নাই, শূন্য স্থান পূর্ণ করতে লোল্লটাদি অনেকেই স্থায়ি ভাবকে গ্রহণ করেছেন ভরতও একস্থলে বলেছেন স্থায়িভাব রসে পরিণত হয়। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এ তিনটিই রসনিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট, চতুর্থ বস্তুর প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, স্থায়িভাব এবং রসের অধিকারী কে অর্থাৎ কোনজনে বর্তায় এ নিয়ে মতভেদ আছে। তৃতীয়তঃ, "নিষ্পত্তির" প্রকৃত অর্থ মতানৈক্যের একটি কারণ।

যে বিষয়গুলি অবিসম্বাদিত তাদের সংবাদ আগে নেওয়া যাক। বিভাব ভাবোদয়ের বা emotion—এর কারণ, যাকে অবলম্বন ক'রে রতি প্রভৃতি ভাব উদ্ভূত হয়; বিভাব প্রকারে দ্বিবিধ, আলম্বন ও উদ্দীপন। কাব্যনাটকের যেসব চরিত্র ভাবোদ্রেক ঘটাতে পারে তারা আলম্বন, যেমন নায়কের ভাবোদ্রেক ঘটাতে পারে নায়িকা, অতএব নায়িকা আলম্বন, আলম্বন ভাবোদ্রেকের পাত্রগত কারণ। মনে রাখতে হবে উক্ত ভাবোদ্রেক পাঠক-দর্শকের নয়, কাব্যনাটকগত চরিত্রের। ভাবোদ্রেকের দেশকালগত কারণ

উদ্দীপন—মলয় বসন্ত কোকিল কবিদের অতি প্রিয়, ঐতিহ্য-সম্মত। একই উদ্দীপন মিলন-সুখ জাগাতে পারে বা বিরহবেদনা আনতে পারে, মলয় বসন্ত কোকিল সমান ভাবে সুখের বা দুঃখের কারণ হতে পারে, নির্ভর করে নায়ক বা নায়িকা একে অন্যের কাছে আছেন কিনা তার উপরে।

যা কিছু ভাবপ্রকাশদ্যোতক, ভাবোদয়ের ফল বা চিহ্ন, যা দর্শায় নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে—যেমন কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গি, হাসি, অঙ্গসঞ্চালন—এরা অনুভাব, অর্থাৎ মনোভাবের অনুযায়ী দেহের প্রত্যক্ষগোচর বিকার। হৃদয়-নিহিত ভাবের অনুমান এই নির্দেশনগুলি থেকে হয় ব'লে এদের অনুভাব বলে। নট এ সব প্রকাশ করতে পারে বাচিক আঙ্গিক অভিনয়-কৌশলে। লোল্লটাদির মতে দর্শকের রোমাঞ্চ আদি অনুভাব রসের কারণ নয়। অনুভাবের কোনও সংখ্যা দেওয়া হয় নি।

এ ছাড়া সাত্ত্বিক ভাব আছে যা প্রকাশিত হয় যখন অভিনেতা নাটকীয় চরিত্রের সত্ত্ব আশ্রয় করে। নট মদ্যপান না করেও নেশাগ্রস্তের, লজ্জিত বা ক্রুদ্ধ না হয়েও ব্রীড়ার বা রোষভাবের অভিনয় সাফল্যের সহিত করতে পারে, কিন্তু রীতিমত ভয় না পেলে তার গায়ে কাঁটা দেবে না। যে ক্ষেত্রে ভাবলক্ষণ কৌশলে আয়ত্তাধীন নয়, বুদ্ধির দ্বারা ক্রিয়মাণ হয় না, ভাবে পূর্ণ বিভাবিত না হ'লে সম্ভব নয়, সেসব ভাব-চিহ্নকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়; এরা সংখ্যায় আট—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (মূর্ছা)। পতন ও মূর্ছা সংস্কৃত ও বাংলা নাটকে সুলভ সুতরাং মূর্ছাকে সাত্ত্বিক বলা যায় কিনা বিবেচ্য। ইয়োরোপ থেকে glycerine tears এর আমদানী এদেশে হয়েছে। সাত্ত্বিক ভাবকে বিশেষ শ্রেণীর অনুভাব বলাই সঙ্গত, বিশ্বনাথ এ দুইয়ে প্রভেদ দেখেন নি।[৫]

ভরতের উপরোক্ত শ্লোকে স্থায়িভাবের কথা নাই কিন্তু স্থায়িভাবের উল্লেখ আছে ভরতের রচনায় অন্যত্র, এবং বহু আলঙ্কারিকের রচনায়। স্থায়িভাব ব্যভিচারিভাবের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে উভয়ের আলোচনা একত্রে হওয়াই উচিৎ। নাটকীয় চরিত্রের ভাব-পরিবর্তন সামান্যতঃ হ'তে পারে, সীতা হরণের পরে রাম কখনও প্রতিশোধ-কল্পে ক্রোধান্বিত, কখনও পত্নী বিরহে শোকান্বিত, কখনও ভবিষ্যৎ-কর্তব্যচিন্তক—এগুলি পরিবর্তনশীল সঞ্চারী বা ব্যভিচারি ভাব, কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাম চরিত্রের একটা স্থায়িভাব আছে। ক্রোধ, শোক রাবণেরও আছে তবুও রাম চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নাই। স্থায়িভাব চরিত্র-লক্ষণকে স্ফুট করে। ব্যভিচারিভাব নিত্য নয় সাময়িক নৈমিত্তিক, উপযুক্ত কারণবশতঃ জন্মায় এবং কারণ দূর হ'লে বিলীন হয়, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় রাজরূপ স্থায়িভাবকে সেবাপুষ্ট করে। নির্বেদ,

গ্লানি, শঙ্কা প্রভৃতিতে সংখ্যায় এরা ৩৩। স্থায়িভাবের লক্ষণ দেওয়া আছে সাহিত্য-দর্পণে, "বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ যে কোনও ভাব যার তিরোধান ঘটাতে পারে না, বরং অন্য ভাবসমূহ যার পুষ্টিসাধন করে, আস্বাদরূপ অঙ্কুরের যা মূল, তাকে স্থায়িভাব বলা হয়।"[৬] বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিগুলির মধ্যে যেটি স্থিরভাবে বিদ্যমান, অন্য সকল ভাবকে বশে এনে রাজার মতন বিরাজ করে সেইটাই স্থায়িভাব।

রস এবং স্থায়িভাবের প্রকৃতি, উৎপত্তি এবং নিবাস সম্বন্ধে ভিন্নমত থাকলেও এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে স্থায়িভাব থেকেই রসনিষ্পত্তি হয়। ভরতের সময়ে রসের সংখ্যা ছিল আট—শৃঙ্গার, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, করুণ। পরে শান্তরস যোগ ক'রে সংখ্যা হয়েছে নয়। এক-একটি রসের এক-একটি স্থায়িভাব আছে, অতএব স্থায়িভাবের সংখ্যাও নয়, উপরে বর্ণিত নয়টি রসের ক্রমানুরূপ স্থায়িভাব—রতি হাস, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শোক এবং শম। কেউ কেউ স্থায়িভাবের মধ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে স্থান দিয়েছেন কিন্তু অভিনবগুপ্ত স্বীকার করেন নি। তেমনিই বাৎসল্য সর্বত্র স্বীকৃত হয় নি। রুদ্রট প্রভৃতি শৃঙ্গাররসের দুটি বিভাগ মেনেছেন—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

যার আস্বাদনে চমৎকারিত্ব আছে তাকেই রসশাস্ত্রে রস বলা হয়। চমৎকার বলা যায় তা'কে যা নূতনত্বের শিহরণ আনে অভাবিতের চমক লাগায়, চিত্তের বিস্তার জন্মায়। এই চমৎকারিত্বের ফলে অন্য সব কিছু বিস্মৃত হওয়া যায়। ভাবগুলি পরস্পর-প্রতিহারী নয়, রতি যেখানে স্থায়িভাব সেখানে হাস্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে কিন্তু হাস এখানে স্থায়িভাব হ'তে পারে না, তবে সঞ্চারীভাব হ'তে পারে। মানিনীর ক্রোধও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়িভাব নয় সঞ্চারীভাব।

আর একটি কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় দরকার, সেটি সামাজিক বা সহৃদয়। সহৃদয় = যার হৃদয় আছে। অভিনবগুপ্ত আর একটি সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন হৃদয়সম্বাদভাক্=যার হৃদয়ের সম্মতি আছে। আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক মিলন বা মজলিশকে সমাজ বলা হয় এবং যিনি এতে যোগ দেন তাঁকে সামাজিক বলা হয়। সহৃদয় সম্বন্ধে অভিনব গুপ্ত বলেছেন "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবন যোগ্যতা ত এব সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ"[৭] কাব্য অনুশীলনের অভ্যাস বশতঃ মনোমুকুর স্বচ্ছ হওয়ায় (কাব্যের) বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে যাদের তন্ময় হওয়ার যোগ্যতা আছে তারাই হৃদয়-সমবায়ের অংশীদার সহৃদয়। সামাজিককেও এখন এই সীমায়িত অর্থেই নেওয়া হয়। নাটকের বেলায় তিনি দর্শক, কাব্যের বেলায় পাঠক। অভিনবগুপ্ত বলেছেন রসাস্বাদ ক্ষমতা সামাজিক

সহৃদয়ের পক্ষে প্রতিভার পরিচায়ক, অর্থাৎ বিরলগুণ, "অধিকারী চাত্র বিমলপ্রতিভানশালী হৃদয়ঃ" অধিকারী সেই যার হৃদয়ে স্বচ্ছ প্রতিভা আছে।[৮] রাজশেখরের মতে দুরকম প্রতিভা স্বীকৃত, কবির সৃষ্টি—আত্মক কল্পনাশক্তি রচনা-দক্ষতা কারয়িত্রী প্রতিভা এবং রচনার ভাবগ্রহণ-শক্তি ভাবয়িত্রী প্রতিভা, "ভাবকস্যোপকুর্বাণা ভাবয়িত্রী। স হি কবেঃ শ্রমমতিপ্রায়ং চ ভাবয়তি।"[৯]

## রস-উৎপত্তি এবং রসসম্ভোগ

দেখা যাচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে বিভাব ও অনুভাব বাহ্যবস্তু, দৃশ্যমান, জড়প্রকৃতি; ব্যভিচারি এবং স্থায়ি অন্তর্বস্তু, অনুমেয়, জ্ঞানাত্মক। বিভাব ভাব-উদ্বোধনের কারণ; ব্যভিচারী কারণ ও কার্য দুই-ই হ'তে পারে, যেমন কোনও জন প্রেমের বশ হ'লে তাঁর আবেগ, লজ্জা, হর্ষ, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, এবং অন্যজনের আবেগ, লজ্জা, হর্ষ দর্শনে নিজের মনে প্রেমভাবের উৎপত্তি হ'তে পারে। অনুভাব সর্বক্ষেত্রেই কার্যস্বরূপ অর্থাৎ ভাবোৎপত্তির ফলে হয়। ফল যখন দেখা দিয়েছে তখন ভাবের উৎপত্তি অবশ্যই হয়েছে, সুতরাং রসের নিষ্পত্তি মেনে নেওয়া কিছুই অসঙ্গত নয়। অতএব এই তিনটির সহযোগে রসনিষ্পত্তি হ'তে পারে ভরতের এই নির্ধারণে ভাবের বা স্থায়িভাবের অনুল্লেখ কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়। তা হ'লেও আলঙ্কারিকরা মনে করেছেন রস-নিষ্পত্তির জন্য স্থায়িভাবের আবশ্যক আছে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন রস-নিষ্পত্তির জন্য স্থায়ির আবশ্যক না মানলেও চলে, আমরা পরে দেখব।

আশ্চর্যের বিষয় রস-নিষ্পত্তিতে সংলাপের কোনও অংশ নাই; সবই যেন dumb-charadc মূকাভিনয়। অথচ দশ রকম নাটকের যে বর্ণনা আছে তার কোনওটি সংলাপ-বর্জিত নয়। নাটকীয় সংলাপের প্রকার ভেদকে বৃত্তি বলে—কৌশিকী, সাত্মতী, ভারতী আরভটি; এদের ভিন্নতা চিহ্নিত হয়েছে প্রধানতঃ হাস্য, হস্তভঙ্গী, বিস্ময়ভাব, সংঘাত প্রভৃতি দ্বারা, সামান্যতঃ সংলাপের রীতিভেদ বাক্‌বৈশিষ্ট্য অর্থসমৃদ্ধির দ্বারা; রস-নিষ্পাদনে সংলাপের কার্যকারিতা সম্বন্ধে রসবাদীরা নিরব। রঙ্গমঞ্চে দৃষ্ট শিহরণ কম্প ভ্রূভঙ্গি রস-নিষ্পাদনে সাহায্য করে অথচ সু-আবৃত্ত সু-প্রযুক্ত শ্লোক কিছুই করে না? বরং শিহরণ কম্প থেকে পাঠককে অনুমান করতে হয়, কিন্তু নাটকের ভাষা থেকে স্থিরতর নির্ধারণ হয়, শুধু ভাষাকে যথাযথরূপে interpret করতে হয় অর্থবোধ করতে হয়।

রসশাস্ত্র গোড়ার দিকে নাটকে প্রযুক্ত হয়েছে অতএব ভরত লোল্লট প্রভৃতি রসশাস্ত্রবেত্তা বক্ষ্যমান আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রকে ভিত্তি করেই রসতত্ত্বের বিচার করেছেন। কাব্যের প্রতিপত্তি যে তখন ছিল না তা

নয়, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁরা তাকে মর্যাদা দেন নি, এমন কি নাটকেও পাত্রপাত্রীর বক্তব্যের চেয়ে কর্তব্যের উপরেই এঁদের নিষ্ঠা বেশী, নটের যে প্রসঙ্গ আছে নাট্যকারের তা নাই। এঁরা পরিভাষার এমন কোনও পরিবর্তন বা বিস্তারণের কল্পনা করেন নি যাতে এঁদের বিচারণা কাব্যকেও অন্তর্ভুক্ত ক'রে সামুদয়িক হয়।

অন্য দিকে দণ্ডী, ভামহ, বামন, প্রভৃতি যাঁরা কাব্যালোচনা করেছেন তাঁরা আলোচনা করেছেন প্রধানতঃ কবির বাণীর উৎকর্ষ, তার লাবণ্যের কারণ, তার সম্পদের প্রকৃতি-নিরূপণ। কোন্ গুণে ভাষা কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় তার আলোচনা প্রসঙ্গে অলঙ্কার, রীতি, গুণ, বৃত্তি প্রভৃতির মনোমত অথচ উপযুক্ত বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন, পরন্তু রসের কারণ বা পাত্র নির্ণয়ে মনোযোগী হন নি। নাট্যভিত্তিক রসতাত্ত্বিকরা এই অলঙ্কারিকদের কাছ থেকে সংলাপ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত পেতে পারতেন না কি ?

শকুন্তলা নাটকের প্রথম দৃশ্যে হননেচ্ছু শিকারীর আসন্ন-শরাঘাত-ভীত পলায়নপর মৃগের বিভিন্ন অবয়বের যে অপূর্ব রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে অনবদ্য ভাষায়, যার সপ্রশংস উল্লেখ অভিনবগুপ্ত করেছেন, সেটা প্রকাশিত হয়েছে শুধু কবির ভাষায়, পলায়নপর মৃগকে নিশ্চয়ই রঙ্গমঞ্চে দেখানো যায় না। আবৃত্তিকালে নট কল্পনা করেন তিনি মৃগকে দেখতে পাচ্ছেন এবং এই দৃশ্যে তিনি যে ভাবে অনুভূত হচ্ছেন এবং যে পারিপাট্যে এই অনুভূতি প্রকাশ করছেন সেইটাই দর্শকের রসের কারণ। তাঁর কাছে কি কালিদাসের শ্লোকের কোনও অপরোক্ষ appcal নাই; সবটাই কি নটের মারফৎ হৃদয়ঙ্গম করবার বিষয় ?

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বি ব
দীপদর্শনম্
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ
স জীবতি।"

ঘন অন্ধকারে দীপালোকের মতন দুঃখের পরে সুখ উপভোগ্য, কিন্তু সুখভোগের পরে দরিদ্র অবস্থায় শরীর ধারণ যেন জীবিত অবস্থাতেও মৃততুল্য। মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তের এই উক্তি সহৃদয়ের হৃদয় স্পর্শ করে কারণ এই বিপর্যয় অনেকের জীবন বিপন্ন করেছে; এই কাতরোক্তি যে রসোদ্রেক-সমর্থ আশা করি তা'তে দ্বিমত নাই। এখানে রসের কারণ সংলাপ, কোনও বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীর সংযোগ-সহযোগিতা নয়।

রসের নির্মাণ যদি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় হয় তা হ'লে কবির শ্লোকে এবং তার নির্ভুল আবৃত্তিতে যতখানি হয় কোনও বিভাব-অনুভাবে ততখানি হয় না। ভ্রূভঙ্গিতে নায়িকা অনুভাব দেখাতে পারেন কিন্তু "ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ" নারীর মাধুর্য শুধু কবির উক্তিতেই সম্ভব। নায়িকার আঙ্গিক অভিনয় যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, "সঞ্চারিণী

পল্লবিনী লতেব" কবির এই উক্তির সমকক্ষ ভাব প্রকাশ করতে পারে না। অথচ রসশাস্ত্রবেত্তা সাহিত্যের অন্য বিভাগ বাদ দিয়ে শুধুই যে নাটকের আলোচনার ভিত্তিতে রসনির্ণয়ে রত হ'লেন তা'ই নয় নাটকের সীমায়িত ক্ষেত্রেও সংলাপকে গৌণ স্থান দিলেন। বোধ হয় এ বিষয়ে প্রথম মনঃসংযোগ করলেন আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত।

এঁদের সময় থেকে স্বীকৃত হ'ল ভাষার মোহিনী শক্তি, কবির প্রতিভা। কাব্যের আত্মার অনুসন্ধান হ'ল ভাষার চারুত্বে এবং অর্থব্যঞ্জনায়। নাটকের রস এবং কাব্যের অর্থব্যঞ্জনা, এই দুইয়ের সমাহার ক'রে সৃষ্ট হ'ল নূতন শব্দ "রসধ্বনি", রসশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মেলবন্ধন হ'ল।

কবি-প্রতিভা স্বীকার করেছেন অভিনব গুপ্ত। রসভোগের পর্যায়ে আদি কারণ কাব্য বা নাটক রচনা, সুতরাং আনন্দের সর্বপ্রথম অংশীদার কবি, তিনি নিরাবিল আনন্দে কাব্য রচনা করেন। অভিনব গুপ্তের পরে কিছু আলঙ্কারিক বলেছেন যে কাব্য সৃষ্টির সময়টা শুধুই আনন্দের নয়, তার সঙ্গে থাকে শ্রম ও উদ্বেগ, সে কারণে তাঁরা একে দুভাগে ভাগ করেন, প্রথম দিকে কবি জন্মদান সংক্রান্ত বেদনা অনুভব করেন এবং একেই যথার্থ সৃষ্টিপর্ব বলা যায়। দ্বিতীয় পর্বে তিনি নিজের মনোরাজ্যের বাইরে আসেন এবং যেন দূর থেকে নিজের রচনা শান্তভাবে বিচার করেন, যেন তিনি একজন সাধারণ দর্শক-পাঠক।[১০]

রস-নিষ্পত্তি এবং রস-সম্ভোগ সম্বন্ধে কয়েকজন রসতাত্ত্বিক মত প্রকাশ করেছেন, তাঁদের লেখা পাওয়া যায় না, অভিনব গুপ্ত, মম্মট প্রভৃতি সে সম্বন্ধে যে বিরূপ আলোচন করেছেন সেই উত্তরপক্ষীয় নিষ্কর্ষই আজ আমাদের অবগতির সহায়। রস আলোচনায় সম্বন্ধিত ব্যক্তি তিনটি—নাটকীয় চরিত্র বা অনুকার্য, নট বা অনুকর্তা, এবং দর্শক বা সামাজিক বা সহৃদয়। বিভাব অনুভাব ব্যভিচারীর সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত নাই যে এগুলি নাটকীয় চরিত্রের, যদি কোনও দর্শকের স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি হয় সেগুলিকে অনুভাব বলা চলে না। সংশয় শুধু রস এবং স্থায়িভাবের বেলায়।

লোল্লটের মতে স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব অনুভাব প্রভৃতি সংযুক্ত হ'লে রসের "উৎপত্তি" হয়। রসের আধার নাটকীয় চরিত্র, নাটকের নায়ক যদি রাম হ'ন তাহলে রসের স্থিতি হয় রামে। কিন্তু দর্শক নটকেই রামরূপে রঙ্গমঞ্চে দেখেন এবং নটের অভিনয়-কৌশল হেতু সাদৃশ্যের ফলে তা'কে রাম থেকে অভিন্ন মনে করেন সুতরাং অবধারণ করেন যে রসোৎপত্তি হয় রামে বা নটে। অবশ্য স্থায়িভাব প্রত্যক্ষ্য ভাবে নয় বাসনার আকারেই থাকে, বিভাবানুভাব দ্বারা উপচিত হ'লে রসে পরিণত হয়। উভয় বৃত্তিই মুখ্য রূপে থাকে অনুকার্যে, গৌণ রূপে অনুর্কতায়।[১১]

শঙ্কুকের মতে রস "অনুমিত" হয়। নট রামের অনুকরণ করেন, এই অনুকরণ নটের প্রযত্নঅর্জ্জিত অতএব কৃত্রিম, কিন্তু নটের অভিনয়-কৌশলে দর্শক মনে করেন সত্য। এ কারণে স্থায়িভাব এবং রস অনুকর্তায় আছে ব'লে দর্শক অনুমান করেন। বিভাব অনুসন্ধিত হয় কাব্যের বলে, অনুভাব নটের শিক্ষার ফলে, ব্যভিচারিগুলি নটের কৃত্রিম ভাবার্জ্জনের কারণে।[১২] অবগমন শক্তি বা প্রতীতি ঘটানোর শক্তিই অভিনয়-ক্রিয়া এবং এই শক্তি নটের আছে বলে স্থায়িভাব এবং রস নটের মধ্যেই অনুমিত হয়। "অর্থক্রিয়াপি মিথ্যাজ্ঞানাদ দৃষ্টা"[১৩] মিথ্যা জ্ঞান থেকেও অনেক সময়ে অর্থপ্রসূ কার্য সম্পন্ন করা যায়। এর অর্থ বোধ হয় এই যে নট রাম নয় সে অভিনয় করছে মাত্র এই জ্ঞান সত্ত্বেও দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। "সম্যক-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদি ন্যায়েন"[১৪] চিত্রে অঙ্কিত ঘোড়া দেখলে সত্য ঘোড়া দেখছি, সত্য ঘোড়ার মত একটা ঘোড়া দেখছি, মায়িক ঘোড়া দেখছি—এ সবের কোনও ভাবই উদিত হয় না, শঙ্কুক এই জ্ঞানকে সম্যক, মিথ্যা, সংশয়, সাদৃশ্য এর কোনটাকেই মনে করেন নি। যদি মিথ্যা জ্ঞান সৎকার্যের কারণ হ'তে পারে তা হলে যে জ্ঞান অনুকরণ-লব্ধ যেমন চিত্রতুরগের জ্ঞান, সেটাও যথার্থ উপলব্ধির কারণ হ'তে পারে। শঙ্কুকের মতে রস এবং স্থায়ির পার্থক্য নাই বলেই ভরত তাঁর সূত্রে স্থায়ির উল্লেখ করেন নি।

শঙ্কুকের রসস্থাপত্যের দৃঢ় ভিত্তি অনুকরণ ও অনুমান। আশ্চর্যের বিষয় সত্য-মিথ্যা সমূহের অতিরিক্ত aesthetic জ্ঞান দর্শকের আছে স্বীকার করা সত্ত্বেও শঙ্কুক বলেছেন রস দর্শকের নয় অনুকর্তার, দর্শক সেটি অনুমান করেন মাত্র। যদি স্থায়ি বা রস কথাগুলির পরিবর্তে art কথাটি ব্যবহার করা যায় তা হলে শঙ্কুকের মত সম্পূর্নরূপে গ্রাহ্য, art সৃষ্টি করেন নট। দুঃখের বিষয় শঙ্কুকের রচনা পাওয়া যায় না, আমাদের নির্ভর করতে হয় তাঁর থেকে ভিন্ন মতবাদী রচয়িতাদের উপরে, যাঁরা রসসম্ভোগ নিয়ে এতই ব্যাপৃত ছিলেন যে art-এর প্রকৃতি ও উপাদান কি তা নিয়ে আলোচনা করেন নি।

শঙ্কুকের অভিমত অভিনব গুপ্তের গ্রাহ্য নয়। অনুকরণ-তত্ত্ব সত্য হ'লে, যদি একাধিক নট রাম রূপে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন এবং দর্শক যদি সকলকেই রাম রূপে দেখেন তা হলে রাম সামান্য রূপেই পর্যবসিত হ'বেন। যথার্থ ভাবে বিভাবিত না হ'লে অনুকরণ সম্ভব নয়, শোকার্ত না হ'লে শোকের অনুকরণ করা যেতে পারে না। শুধু স্বরভঙ্গি বা বেশভূষার সাহায্যে অনুকরণ বাহ্য ব্যাপার, সর্বাঙ্গীণ অনুকরণ নয়। রামের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এমন কেউ নাই, সুতরাং কোনও নটের পক্ষে সত্য অনুকরণ সম্ভব নয়, কোনও দর্শকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে অনুকরণ যথার্থ।[১৫] বর্তমানে অনুকরণ বলা হয় না, পরিবর্তে বলা হয় interpretation।

অভিনব গুপ্তের মতে নটের অভিনয়ের মূলে আছে তার শিক্ষা, নিজের বিভাবের স্মৃতি এবং চিত্তবৃত্তির সাধারণী ভাব হেতু হৃদয়সংবাদ—এই তিন কারণে নট অনুভাবগুলি যথাযথ রূপে প্রদর্শন করতে পারেন এবং উপযুক্ত কাকু বা স্বরভঙ্গী দ্বারা সংলাপ উচ্চারণ করতে পারেন, এতে অনুকরণের কোনও প্রশ্ন নাই। অতএব এ কথা সত্য নয় যে ভাবের অনুকরণই রস।[১৬]

লোল্লট এবং শঙ্কুকের মতবাদে দর্শকের হৃদয়-সংবেদনার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, দ্বিতীয় জনের বেলায় দর্শক অনুমান করেন বটে কিন্তু রসের আবির্ভাব তাঁর চিত্তে নয়।

ভট্টনায়ক বলেছেন "রসো ন প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে, নাভিব্যজ্যতে"[১৭], রস প্রতীয়মান, উৎপন্ন, বা অভিব্যক্ত হয় না। যদি প্রতীত হ'ত তা হলে দর্শক করুণ রসে দুঃখ বোধ করত। রঙ্গমঞ্চে প্রেমিকযুগলের প্রেমদৃশ্য দেখলে নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী লজ্জা, জুগুপ্সা স্পৃহাদি বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, এ ক্ষেত্রে বলা যায় না যে রসোৎপত্তি হয়েছে। যদি মনে করা যায় রসের উদ্ভব হয়েছে পরগতভাবে তা হলে দর্শককে তটস্থ (neutral) ভাব অবলম্বন করতে হয়। একটা অসাধারণ চরিত্রের সঙ্গে সাধারণ দর্শকের একাত্মবোধ হ'তে পারে না তারতম্য হেতু। অর্থাৎ দর্শক পাঠক একেবারে পক্ষপাত-হীন হ'লে রস উপলব্ধি করতে পারবেন না, নাটকীয় ব্যাপারটিকে একেবারে আত্মবিষয়ক ভাবলেও তা পারবেন না। রস উৎপন্ন হয় বললে এইজাতীয় ভ্রান্তি সমূহ লক্ষিত হয়।

রামের বা নটের স্থায়িভাবের কারণে তাঁদের রস জ্ঞান হচ্ছে অথচ আনন্দলাভ করছেন সামাজিক, ভট্টনারায়ণের মতে এটা যুক্তিযুক্ত নয়। রসের ভুক্তি সামাজিকের না হ'লে রসজনিত আনন্দ বোধ তাঁর হ'তে পারে না। অতএব রসোদ্রেক হয় সামাজিকের চিত্তে। রস উৎপন্ন বা অনুমিত বা অভিব্যক্ত হয় না, উপভুক্ত হয়। ভট্টনারায়ণ দুটি শব্দের সৃষ্টি করেছেন ভাবকত্ব আর ভোজকত্ব—আর সেই সঙ্গে দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার। প্রথম প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি ভট্টনারায়ণ-সৃষ্ট ধারণা—সাধারণীকরণ। ভট্টনারায়ণের মতে বিভাবাদির সাধারণীকরণের ফলে রস ভাব্যমান হয়, অভীধা থেকে পৃথক এই ব্যাপারকে ভাবকত্ব বলা যায়। এই রস দ্রুতি-বিস্তার-বিকাশাত্মক সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময় সম্বিদ-বিশ্রান্তি-লক্ষণ পরব্রহ্মাস্বাদ স্বরূপ ভোগের বস্তু।[১৮] সম্বিদ-বিশ্রান্তি=আত্মচেতনা থেকে সাময়িক বিরতি।

সাধারণীকরণের ফলে কাব্যনাটকের পাত্র-পাত্রী দেশ-কাল-অবস্থার সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে পাঠক-দর্শকের কাছে সর্বদেশকাল-সাধারণ শাশ্বত রূপে প্রতীত হ'ন। আমরা জানি রাম ত্রেতা যুগের লোক, অতএব রামের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন

তিনি কখনই রাম নয়। রামের যে ছবি আমাদের হৃদয়ে আছে আমরা সেই রামকেই রঙ্গমঞ্চে দেখছি একেই বলে সাধারণীকরণ। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-দর্শকের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব বোধ দূর হওয়ার ফলে তিনি বিভাবকে সাধারণ রূপেই দেখেন যার ফলে কোনও প্রেমের দৃশ্য দেখলে তাঁর লজ্জা বা কামনা বা ঈর্ষা-বিদ্বেষ জন্মায় না। দুঃখশোক ভাগ ক'রে নিলে লাঘব হয়, সুখ ভাগ করে' নিলে বর্ধিত হয়, সাধারণীকরণের ফলে ঠিক এমনটিই হয়, শোকদৃশ্য দেখলে চোখে জল আসে বটে কিন্তু হাহাকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হয় না, সুখের দৃশ্য দেখলে দুঃখের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা সুখ অনুভব করি।

সাধারণীকরণের এ অর্থ নয় যে রাম-সীতার যে প্রাতিস্বিক বা পারস্পরিক মনোভাব সেটি সাধারণ নাগরিকের মনোভাব, কিম্বা রামচরিত নাটকে রামের জায়গায় যেকোনও চরিত্র কল্পনা করা যায়, কিম্বা রামের মনোভাব বা কৃতিপ্রযত্ন যেকোনও লোকে সম্ভবে। কারণ তা হ'লে রাম চরিত্রের অসাধারণত্ব, মহত্ত্ব লুপ্ত হ'য়ে যায়। অর্থ এই যে কবিনাট্যকার এমন ভাবে চরিত্রের রূপোদ্ঘাটন করলেন বা নট এমন অভিনয় করলেন যে সেটি সাধারণের অনুভূতির অঙ্গীভূত হ'ল সেটি সাধারণের সম্পত্তি হয়ে সকলের বোধগম্য হ'ল। রামের ব্যবহারে বা ভাবনায় কোনও প্রশ্ন কোনও সন্দেহ জাগে না, গ্রহণ [illegible] কোনও আপত্তি হয় না। যে ক্ষণে রামের মনোভাব প্রকাশিত হ'ল সেইক্ষণে সেটি তাঁর ব্যক্তিগত রক্ষণীয় বস্তু নয়, সেটি সাধারণের সম্পত্তি। যে ধনে রাম ধনী সেটি সাধারণের নাই, কিন্তু কবিকৌশলে সাধারণের মধ্যে সেটিকে বন্টন ক'রে দেওয়া হ'ল; এক থেকে ভাবটি বহুব্যপ্ত হল; ধনবন্টন লৌকিক প্রথায় হয়, কিন্তু ভাববন্টনের প্রক্রিয়া এ জাতীয় নয় ব'লে মনে করা হয় অলৌকিক।

রামের মনোবৃত্তি অভাবনীয় উচ্চ শ্রেণীর, সাধারণীকরণে তা'কে নিম্নমানের সাধারণ মনোবৃত্তিতে অবনয়ন করা হয় না, অভিপ্রেত অর্থ এই যে তাকে এমন সংক্রামক অবস্থায় পরিণত করা হয় যখন অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত মাত্রেই সহজে সঞ্চারিত হ'তে পারে, তখন সীতাবিরহ জনিত রামের শোক বা রাবণের প্রতি ক্রোধ রামের নয়, নটের নয়, বাল্মীকির নয়, পাঠক-দর্শক-সর্বসাধারণের ভোগ্য বস্তু, তখন রামের বাক্য ব্যবহারে এমন সংক্রামক শক্তি এসেছে যা সকলকেই সমভাবিত করে। ক্রোধাবেশে "রুধির করিব পান" বললে সাধারণীকরণ ব্যাহত হয় কারণ রক্তপাত করা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির স্বাভাবিক ইচ্ছা হ'তে পারে, রক্তপান নয়। সীতা হরণের পরে রাম যদি মনকে প্রবোধ দিতেন এই ব'লে "কা তব পুত্র কস্তে কান্তা" তা হ'লে সাধারণীকরণ হ'ত না। কিভাবে পরিস্থিতির সংঘটন সম্পাদন করতে হয় যাতে দর্শক-পাঠকের চিত্তে অনুরণন জাগিয়ে সহানুভূতি আনা যেতে পারে সেটা সজ্জাদক্ষ কবি জানেন। আবাল্য বাল্মিকী-

কৃত্তিবাসের সহিত পরিচিত পাঠকও মেঘনাদবধ পড়ে রাবণের দুঃখে কাঁদেন, লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করেন।

নাট্যকার এবং নটের নৈপুণ্যে সাধারণীকরণ ঘটলে বিশেষ চরিত্রের ভাব প্রভৃতিকে দর্শক চরিত্র-নিরপেক্ষ সাধারণ গুণ হিসাবে দেখেন, অর্থাৎ নাটকের রাম-সীতা সার্বিক স্ত্রী-পুরুষে এবং তাঁদের বিশেষ প্রেমপ্রীতি লোকব্যাপ্ত প্রেমপ্রীতিতে পরিণত হ'য়ে নাটকের ভাবকত্ব ঘটায়, এই প্রেমপ্রীতি তখন রাম সীতার প্রেমে সংক্ষুব্ধ না থেকে নৈর্বক্তিক প্রেমে পর্যবসিত হয়। আর দর্শক-পাঠকের মনের যে সত্ত্বগুণ হেতু সাধারণীকৃত অথচ অলৌকিক ভাবোদ্‌গমের যথার্থ অবধারণা এবং ভোগ হয়, চিত্ত স্বচ্ছ ও স্ফুটিত হ'য়ে আনন্দ বোধ অব্যাহত ভাবে স্ফুরিত হয়, রসানুভূতি ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান থাকে না, সেই আস্বাদন ক্ষমতা বা ভোজকত্ব হেতু নাটকের স্থায়িভাব দর্শকচিত্তে রস রূপে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে "সত্ত্বোদ্রেক" যখন রাজসিক ভাবের নিষ্কাশনে কর্মস্পৃহা দূর হয়, তামসিক ভাবের দূরীকরণে জড়তা নষ্ট হয়ে গ্রহণশক্তি তীব্র হয়, শুধু সাত্ত্বিক ভাবের বর্তমানতায় স্থির চিত্তে রসসম্ভোগ সম্ভব হয়। ভাবকত্বের দ্বারা কাব্য-নাটককে বিদগ্ধজনের গ্রাহ্য করা,ভাবকে কাব্যনাটক থেকে পাঠক-দর্শকের চিত্তে পরিবৃত্ত করা কাব্যনাট্যকার ও নটের কৃতিত্ব; ভোজকত্বের দ্বারা প্রকৃত আস্বাদনের সফলতা পাঠক-দর্শকের সম্পূর্ণ আন্তর শক্তি।

এই রসাস্বাদকে ভট্টনায়ক বলেছেন "পরব্রহ্মাস্বাদ সচিবঃ।" পরে অনেক আলঙ্কারিকই এ কথা বলেছেন। এই অবস্থা সম্পূর্ণ অস্মিতা-বিবর্জিত, যখন বাস্তব পরিপার্শ্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত, চিত্ত বস্তু-বিশেষে সম্পূর্ণ একাগ্র। ভট্টনায়ক ধ্বনিবাদ স্বীকার করেন না যদিও অভিনব গুপ্তের মতে পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করেন।

ভট্টনায়কের মতবাদের সবখানি অভিনব গুপ্তের গ্রাহ্য নয়। ভট্টনায়কের মতে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব দুটি পৃথক ব্যাপার, অর্থাৎ রসের ভাবনা ও রসভোগ স্বতন্ত্র ভাবে হয়। অভিনব গুপ্ত বলেছেন এ দুটি পৃথক নয়, রস-প্রতীতি বা রস-ভাবনা মানেই রস-ভোগ বা রসাস্বাদ।[১৯] রসের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি এর কোনওটিকে না মানলে রসকে হয় নিত্য নয় অস্তিত্বহীন ব'লে মানতে হয়।[২০] অভিনব গুপ্ত সাধারণীকরণ মেনেছেন, কিন্তু তাঁর মতে সাধারণীকরণ শুধু কাব্যনাট্যে বর্ণিত চরিত্রের দেশকালবর্জিত হ'য়ে সাধারণ রূপে অর্থাৎ type রূপে আবির্ভাব নয়, পাঠক-দর্শক মাত্রেরই চিত্তে সমান রূপে প্রকাশ পাওয়া। "অতএব সামাজিকানামেকঘনতৈব প্রতিপত্তেঃ সুতরাং রসপরিপোষায় সর্বেষামনাদিবাসনাবিচিত্রী- কৃতচেতসাং বাসনাসংবাদাৎ[২১]"। সকল সামাজিকের এই একঘনতার মতো উপলব্ধি রসকে অত্যন্ত পুষ্ট করে; কারণ অনাদি বাসনার দ্বারা চিত্ত

চিত্রিত হ'য়ে ওঠায় তাঁদের সকলের বাসনার একাত্মতা ঘটে। অর্থাৎ অভিনব গুপ্তের মতে কাব্য-নাট্যে বর্ণিত বস্তু দেশকালাদি বিশেষ রূপ-বর্জিত হয়ে পাঠক-দর্শকের চিত্তে সাধারণরূপে উপস্থিত হয় শুধু তাই নয়, অসাধারণত্ব ত্যাগ ক'রে সকল পাঠক-দর্শকই এক সাধারণ সত্ত্বায় পরিণত হ'য়ে এক মূলগত সাদৃশ্যের পরিচয় দেন। এই মতটি গ্রহণ করার অন্তরায় এই যে সকলের বাসনা একপ্রকার নয়, বাসনাকে পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার (যা অভিনব গুপ্ত বলেছেন) বললেও নয়, বাসনাকে রুচি মনে করলেও নয়; সুধী বিদগ্ধ হ'লেও সকলেই এক পুস্তক বা এক শ্রেণীর সাহিত্য সমান উপভোগ করতে পারেন না। অতএব সব সামাজিক যে একাত্ম হ'য়ে নাটক দেখবেন তা সম্ভব নয়, সকলেই যে এক রকম সমালোচনা করবেন এটা আজ পর্যন্ত কোনও কবিনাট্যকারের ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে নি। অভিনব গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও অদ্বৈতবেদান্তের অনুসারী ছিলেন এবং এক-এবং-অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদে বিভাবিত হয়ে মানুষের রসজ্ঞতাকেও অখণ্ড পরিব্যাপ্ত দৃষ্টিতে দেখে ব্যক্তিভেদের চেয়ে সাধারণীকরণের ভিত্তিতে সহৃদয়ের অবিভাজ্য সত্ত্বাকেই রসভোগের যথার্থ অনুকূল মনে করেছেন যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিস্মৃতি বা বিলুপ্তি ঘটার কারণে তিনি নৈর্বক্তিক সত্ত্বায় পরিণত হয়েছেন।

অভিনব গুপ্তের রসবাদে কয়েকটি বিশেষত্ব আছে তার মধ্যে দু একটির আলোচনা এখানে করা যেতে পারে।

ভট্টনায়ক বলেন যে নিজের অনুরূপ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করা সম্ভব কিন্তু রাম বা যেকোনও দেবতার সঙ্গে সেরকম সম্ভব নয়। অভিনব গুপ্তের মতে মানুষ পূর্বজন্মে নানারূপে ছিল অতএব সুপ্ত বাসনার ফলে নিজের অনুরূপ নয় এমন প্রাণীর সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করা সম্ভব।[২২]

পূর্বজন্মের সংস্কার বা বাসনাকে রসশাস্ত্রের একটি ধারক-স্বরূপ নির্ণয় করা অভিনবগুপ্তের বিশেষত্ব। "কবিহৃদয়তাদাত্ম্যাপত্তিযোগ্যতা" অর্থাৎ কাব্যিক সংবেদনশীলতা কবির হৃদয়ের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করার শক্তি; এবং এই শক্তি নির্ভর করে ব্যক্তির বাসনা বা অন্তর্নিহিত প্রবণতা বা স্বভাবের উপরে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন রসপ্রতীতির বিঘ্ন সামাজিকের যোগ্যতা না থাকা যার নাম সম্ভাবনার অভাব। কারণ সম্বন্ধে বলেছেন "অতএব বিভাবাস্তত্রোদ্বোধকাঃ সন্তঃ স্বরূপোপরঞ্জকত্বং বিদধানা রত্যুৎসাহাদেরুচিতানুচিতত্বমাত্রমাবহন্তি। নতু তদভাবে সর্বথৈব তে নিরুপাখ্যাঃ। বাসনাত্মনা সর্বজন্তুনাং তন্ময়ত্বেনোক্তত্বাৎ"[২৩] অতএব বিভাবগুলি উদ্বোধক হ'য়ে নিজেদের রঙীন করবার শক্তি বিস্তার ক'রে রতি উৎসাহ প্রভৃতির ঔচিত্য-অনৌচিত্যটুকুই বহন করে; কিন্তু তাদের অভাবে (স্থায়িভাবের) অনস্তিত্ব সূচিত হয় না। বাসনার আকারে (স্থায়িভাব) সর্বপ্রাণীর মধ্যেই থাকে এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

আমরা দেখেছি অভিনব গুপ্ত সাধারণীকরণের ব্যাখ্যায় সামাজিকের সাধারণীকরণ মেনেছেন অর্থাৎ বহু লোক এক সঙ্গে নাটক দেখলে দর্শকদের মধ্যেও সাধারণীকরণ ঘটে যার ফলে রসাস্বাদ সুগম হয়। চিত্রদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন "ন তৎপ্রতিকৃতিম্বেন চিত্রপুস্তবৎ... সর্বেষু এতেষু পক্ষেষু অসাধারণত্যা দ্রষ্টুরৌদাসিন্যে রসাস্বাদযোগাৎ[২৪] চিত্রের প্রতিকৃতিম্বেও নয়......এই সব ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ ঘটে না এবং সে কারণে দ্রষ্টার ঔদাসিন্য হেতু রসাস্বাদ ঘটে না। এটা কি শুধু শঙ্কুকের বিরোধিতা করবার জন্য বলেছেন, না অভিনব গুপ্ত নাটকের প্রতি এতই অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে চিত্র রচনাকে art এবং চিত্র দর্শনকে aesthetic experience ব'লে গণ্য করেন নি?

অভিনব গুপ্তের মতে বিভাবাদি রসের জন্মের কারণ নয়, যুক্তি এই যে জন্ম নেবার পরে রস আর বিভাবাদির উপরে নির্ভরশীল নয় সুতরাং বিভাবাদির তিরোধানের পরেও রসের থাকা উচিৎ কিন্তু থাকে না। সহৃদয়ের চিত্তে যে সুপ্ত বাসনা আছে, প্রাত্যহিক জীবনে তা থেকে রসোপলব্ধির নানা বিঘ্ন থাকে, বিঘ্ন দূরীভূত হ'লে দর্শকের চিত্ত প্রবুদ্ধ হ'লে রসনাভূতি হয়।[২৫] "সর্বথা রসনাত্মকবীতবিঘ্ন-প্রতীতিগ্রাহ্যো ভাব এব রসঃ। তত্র বিঘ্নাপসারকা বিভাব-প্রভৃতয়ঃ"[২৬] সকল ক্ষেত্রেই রস প্রতীতিগৃহীত এমন একটি মনোভাব যা থেকে সকল বিঘ্ন অপসারিত হয়েছে সুতরাং অনায়াসে আস্বাদ্য। এখানে বিঘ্ন অপসারণ করে বিভাব প্রভৃতি। অভিনব গুপ্ত বিঘ্ন গুলির বিশদ আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি "সম্ভাবনা বিরহ", যদি কেউ মনে করেন যে সম্বেদ্যবিষয় অর্থাৎ নাটকের বিষয়বস্তু সম্ভাবনার অতীত তা'হলে তিনি এতে চিত্ত-বিনিবেশ করতে পারবেন না, তার চিত্ত-বিশ্রান্তি হবে না।[২৭] রসোপলব্ধির একটি ফল, এমন কি প্রধান ফল, যে চিত্ত-বিশ্রান্তি একথা অভিনবগুপ্ত বারবার বলেছেন এবং এটি রসের প্রকৃতি নিরূপণের একটি দিগ্‌দর্শন। "অবিশ্রান্তিরূপত্বৈব চ দুঃখম। তত এব কাপিলৈর্দুঃখস্য চাঞ্চল্যম এব"[২৮] বিশ্রান্তির অভাবই দুঃখ, কপিলের শিষ্যরা বলেন চাঞ্চল্যই দুঃখ। রসোপলব্ধির আর একটি বিঘ্ন দর্শকের নিজের সুখদুঃখ নাটকীয় চরিত্রের সুখদুঃখের সহিত জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা।[২৯]

## রস-সৃষ্টি সহৃদয়ের চিত্তে

ধ্বনিবাদের সমর্থন ক'রে অভিনব গুপ্ত বলেন যে বিভাবাদির উপযুক্ত বর্ণনা কবিনাট্যকার করতে পারেন বটে কিন্তু নাটকীয় চরিত্রের যথা রামের মনোভাব যথাযথ বর্ণনা করবার সাধ্য তাঁর নাই, যা কল্পনা-নির্ভর তার অনেক কিছুই তাঁকে করতে হয় ইঙ্গিতে

বা ব্যঞ্জনায়। এই পরোক্ষ উপায়েই তিনি দর্শক-পাঠকের চিত্তে রসোদ্রেক করতে পারেন। স্থায়িভাব রস-নিষ্পাদক, এবং রস নিষ্পন্ন হয় ব্যঞ্জনার দ্বারা। রস আস্বাদন করেন সহৃদয় দর্শক-পাঠক, তাঁর চর্বণা বা আস্বাদেই এর পরিচয়। দর্শক-পাঠক মাত্রেই রসাস্বাদ করতে পারেন না, অতএব রস নাট্যকার বা নটের সৃষ্ট এবং পরিবেশিত বস্তু নয়, এর সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি হয় সহৃদয়ের মনে, এবং তাঁর রসাস্বাদের প্রতীতিই রসের বিদ্যমানতার একমাত্র প্রমাণ।

রস বলতে আস্বাদ এবং আস্বাদ্য উভয়কেই বোঝায়, কিম্বা বলা যায় আস্বাদই রস। রস এবং রসানুভূতি অভিন্ন সুতরাং রস সৃষ্ট হয় রসিক সহৃদয়ের মনে।

রসতত্ত্ববাদী আলঙ্কারিকেরা রসকে সুমধুর পানীয়কের বা উত্তম ব্যঞ্জনের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা'র মধ্যে একাধিক স্বাদু বস্তুর মিশ্রণে এক অপূর্ব আস্বাদ আনতে পারা যায়। এ থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে রসকে কোনও পাকশালায় প্রস্তুত করে' পাঠক-দর্শকের সামনে ধরা হচ্ছে এবং তিনি প্রস্তুত দ্রব্য আপন রুচি অনুযায়ী ভোগ করছেন। কিন্তু অভিনবগুপ্তের মত উদ্ধৃত ক'রে মম্মট বলেছেন "চর্বণানিষ্পত্যা তস্য নিষ্পত্তিরুপচরিতেতি কার্যোঽপ্যুচ্যতাম্"[৩০] চর্বণানিষ্পত্তির দ্বারা রসনিষ্পত্তির উদ্ভব হয়, সুতরাং রসকে কার্য বা ফলস্বরূপ বলা যায়। অর্থাৎ রস অন্যত্র প্রস্তুত হয়ে সহৃদয়ের সামনে ধরা নাই, তাঁকে চর্বণার সাহায্যে রস প্রস্তুত করে নিতে হ'বে, চর্বণা কারণ রস কার্য। কিন্তু লৌকিক ক্ষেত্রে কারণ ও কার্যের মধ্যে যে নিরন্তর সম্বন্ধ আমাদের জানা থাকে এ ক্ষেত্রে সে সম্বন্ধ জানা নাই, সে কারণে রস-উৎপত্তিকে বলা যায় অলৌকিক। বিশ্বনাথ বলেছেন "ব্যক্তোদধ্যাদিন্যায়েন রূপান্তরপরিণতো ব্যক্তিকৃত এব রসো ন তু দীপেন ঘট ইব পূর্বসিদ্ধো ব্যজ্যতে। তদুক্তং লোচনকারৈ—'রসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ত্বোদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ' ইতি।"[৩১] ব্যক্তি দ্বারা রূপান্তরিত হ'য়ে দধি ইত্যাদির মতন পরিণত হ'য়ে রস হয়, এমন নয় যে ঘটের মতন পূর্বসিদ্ধ বস্তু দীপের দ্বারা প্রকাশিত হ'ল। সে কারণে লোচনকার কর্তৃক উক্ত হয়েছে "রসসমূহ প্রতীত হয়, এ থেকে অন্ন পাক হচ্ছে এই ব্যবহার বুঝতে হ'বে।" "কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ" কোনও কোনও প্রমাতাগণ দ্বারা রস নিজশরীরবৎ অভিন্ন রূপে আস্বাদিত হয়, অর্থাৎ নিজের মধ্যেই উত্থিত হয়েছে এমন মনে হয়। বিশ্বনাথের মতে রস "কার্য" নয়।[৩৩]

শাস্ত্রবেত্তাদের অভিপ্রায় এই যে রসের পাকশালা দর্শক-পাঠকের অন্তরে এবং এই অমৃতোপম বস্তুটি প্রস্তুত করছে তাঁর নিজের চিত্তবৃত্তি, উপকরণ যুগিয়েছেন কাব্যনাটকের রচয়িতা, নট প্রভৃতি। এই ধারণা এখন প্রায় সর্বসম্মত যে রসের প্রস্তুতি হয় দর্শক-পাঠকের

চিত্তে অন্য কোথাও নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপকরণ সত্ত্বেও দর্শক-পাঠক রস প্রস্তুত ও রসগ্রহণ করতে পারেন না যদি তাঁর সে ক্ষমতা না থাকে, যে ক্ষমতা আছে ভ্রমরের—ফুলের মকরন্দকে মধুতে পরিণত করবার, যে ক্ষমতা আছে গাছের পাতার—সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ু থেকে মৌলিক পদার্থ নিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় খাদ্যরস প্রস্তুত ক'রে তাকেই জীবনধারণের কাজে লাগাবার। প্রভেদ এই যে মধু জমা হ'তে পার মৌচাকে, কার্বন জমা হ'তে থাকে গাছের শরীরে কিন্তু রস প্রস্তুতিমাত্রই ভোগ ক'রে নিতে হ'বে ধ'রে রাখা যায় না, যেমন বিদ্যুৎশক্তি জননমাত্রই কাজে লাগিয়ে ব্যয়িত করতে হয়, তা'কে সঞ্চিত ক'রে রাখা যায় না খুব সামান্য অংশ ছাড়া। "সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং আনন্দং"[৩৪] এই আনন্দ (কাব্য বোধের) পরমুহূর্তে রসাস্বাদ হ'তে উদ্ভূত। সে কারণে বলা হয়েছে রস নিত্য নয়, অসংবেদনকালে রসের অস্তিত্ব থাকে না।[৩৫] "অলৌকিক, নির্বিঘ্ন, সংবেদনাত্মক এক চর্বণার বস্তুকে গোচর করে, যতক্ষণ চর্বণা ততক্ষণই এই বস্তুর প্রাণ, এটি পূর্বসিদ্ধ নয়, তাৎকালিক, চর্বণার অতিরিক্ত কোনও সময়ে এ থাকে না, এ স্থায়ী লক্ষণ থেকে স্বতন্ত্র, এই বস্তুই রস।"[৩৬] "তৎকালসারৈবোদিতা ন তু পূর্বপরকালানুবন্ধিনী"[৩৭] রসের উদ্ভব শুধু বর্তমানেই, পূর্বকালের বা পরবর্তীকালের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। নাটক চলছে কাব্য পাঠ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে রস ভুক্ত হচ্ছে, দর্শক-পাঠক কর্তৃক, কাব্যনাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রস শেষ হচ্ছে, কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। যদি পরে তার স্মৃতি থাকে সেটা রসভুক্তি নয় রসোদ্গার, বৈষ্ণব কবিরা এই নামই নিয়েছেন।

বিদ্যুৎশক্তির সঙ্গে রসের তুলনা খাটে শুধু ক্ষণিকত্বের বিষয়ে, প্রভেদ আছে সঞ্চারণের বেলায়। বিদ্যুৎশক্তিকে স্থানান্তরিত করা যায়, রসকে স্থানান্তরিত বা পাত্রান্তরিত করা যায় না। স্থানান্তরিত হলেও বিদ্যুৎশক্তির সুফল বা কুফল ফলবেই যেখানেই সে যাক্ না কেন, হয় সে আলো জ্বালাবে মেশিন চালাবে কিম্বা আগুণ লাগাবে। কিন্তু কবিচিত্তের রস-ভাবনা, নটের অভিনয়-কৌশল ইত্যাদি সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই অরসিকের মনে রসোদ্রেক হয় না রস সঞ্চারিত হ'লে যা নিশ্চয়ই হ'ত। অতএব রস-প্রস্তুতি রসিকের অন্তরেই হয় রসকে যেমন সঞ্চিত করে রাখা যায় না, তেমনিই পাত্রান্তরিত করা যায় না।

যিনি রসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা এবং পূর্ণমাত্রায় উপভোক্তা তিনিই রসিক বা সহৃদয়। যেমন সব বৃক্ষলতা সব রকম রস প্রস্তুত করতে সমর্থ নয় তেমনিই মানব-মন-নির্বিশেষে সব রসের প্রস্তুতি ও উপভোগ সর্বত্র ঘ'টে ওঠে না। শুধু যথার্থ রসিকেরই প্রকৃত আত্তীকরণ ও রস-আয়ত্তির ক্ষমতা থাকে।

ভাব সৃষ্টি করেন কবি বা নাট্যকার, সেই ভাব পরিবহণ করেন

নট বা কাব্যগত চরিত্র, সেই ভাবের রসরূপে রূপান্তরণ হয় সহৃদয় কর্তৃক। কবি যেখানে নিজের কথা বলেন সেখানে তিনি ভাবের স্রষ্টা এবং বাহক দুই-ই। আমরা রস ও ভাবের পার্থক্য না বুঝে অনেক সময়ে বলি কবির সৃষ্ট রস, কিন্তু কবির রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা হয় সহৃদয়ের রসায়নাগারে, তিনি দেখেন ভাবটি তাঁর হৃদয়ে রসে পরিণত হল কিনা। যে প্রক্রিয়াকে ভরত বলেছেন "রস-নিষ্পত্তি", ভট্টনায়ক বলেছেন "ভোজকত্ব", সেই রূপান্তরণ সংঘটিত হয় সহৃদয়ের রসশালায়। তাঁর আছে দ্রুতি বা দ্রবীভবন শক্তি, যার বলে তিনি ভাবকে রসে পরিণত করে সেই রস সম্ভোগ করে' চমৎকারিত্ব এবং অনাবিল আনন্দ পান।

সহৃদয় বা দর্শক কোনও নাটকীয় চরিত্রের সহিত নিজের অভিন্নতা কল্পনা করতে পারেন না কারণ নটকীয় চরিত্র একাধিক শুধু নয় ভিন্নমানসিকও হ'তে পারে, সকলের সহিত সম-মতিত্ব হওয়া দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। নাটকীয় চরিত্রের সহিত অভিন্নতা কল্পনা করতে পারেন নট।

নাটকীয় চরিত্রের সুখদুঃখ স্বগতভাবে বা পরগত ভাবে আস্বাদিত হ'লে উভয় ক্ষেত্রেই রসের ব্যঘাত হয়; নিজের সুখদুঃখ মনে করলে অকারণ উত্তেজনা আসে, পরের মনে করলে ঔদাসিন্য আসে।

"তত এব ভীতোঽহং 'শত্রুর্বয়স্যো মধ্যস্থো বা' ইত্যাদি প্রত্যয়েভ্যোদুঃখসুখাদিকৃতহান্যাদিবুদ্ধ্যন্তরোদয়নিয়মবত্তয়া বিঘ্ন বহুলেভ্যো বিলক্ষণং নির্বিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যং সাক্ষাদিব হৃদয়ে নিবিশমানং চক্ষুষরিব বিপরিবর্তমানং, ভয়ানকো রসঃ। তথাবিধে হি ভয়ে নাত্মাত্যন্তং তিরস্কৃতো, ন বিশেষত উল্লিখিত। এবং পরোঽপি।"[৩৮] এইজন্যই 'আমি ভীত, এ ভীত' অথবা 'এ শত্রু, এ মিত্র, এ মধ্যস্থ' ইত্যাদি যে সমস্ত প্রত্যয় সুখদুঃখ জাগানো অন্য রকম জ্ঞানের উৎপত্তির নিয়মের জন্য বিঘ্নবহুল তাদের থেকে এই (প্রতীতি) স্বতন্ত্র এবং নির্বিঘ্ন প্রতীতির গ্রাহ্যবস্তু; এই (প্রতীতি) যেন সোজাসুজি হৃদয়ে প্রবেশ করে, যেন চোখের সামনে নানাভাবে ফিরতে থাকে, এইটাই ভয়ানক রস। এই রকম ভয় হতে সামাজিক নিজে একেবারে নির্লিপ্ত থাকেন না, আবার তার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িতও থাকেন না। অন্য (রসও) এই রকম। অর্থাৎ ভয়ের দৃশ্য দেখে যদি সামাজিকের ভয় হ'ত তাহ'লে শত্রুর কাছ থেকে পলায়ন-স্পৃহা এবং মিত্রের আশ্রয় কামনা থাকতো, কিন্তু সেসব কিছুই তার হয় না, তিনি অপক্ষপাতে অসংক্ষোভে দৃশ্যটি গ্রহণ করেন, কারণ তখন ভাব রসে পরিণত হয়েছে।

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে"[৩৯]

(রস) আস্বাদন কালে (এই ব্যাপার) পরের এবং পরের নয়,

আমার এবং আমার নয়, বিভাবাদির এইরূপ ভেদবুদ্ধি থাকে না। অর্থাৎ সামাজিক নির্লিপ্ত, neutral।

## স্থায়িভাব

রসের আবির্ভাব এবং ভোক্তা-নির্ণয় সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের আলোচনার পরে স্থায়িভাবের আশ্রয় বা আধার সম্বন্ধে মতভেদ যেন অকারণ ও অবাস্তব বলে মনে হয়। ব্যাভিচারি ভাবগুলি যে নাটকীয় চরিত্রের এবং অনুকরণ-হেতু নটের, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। স্থায়িভাব যদি রাজার মত হয় এবং ব্যাভিচারি যদি ভৃত্যের মত তার অনুগমন করে তা হলে স্থায়িভাব সেইখানেই থাকবে যেখানে ব্যভিচারি দৃষ্ট হয়। অভিনব গুপ্ত বলেছেন "তস্মাৎ স্থায়ীরূপাচিত্তবৃত্তি সূত্রস্যূতা এবামী ব্যভিচারিণঃ।..... স্বয়ং চ বিচিত্রার্থস্থায়িসূত্রং চ বিচিত্রয়ন্তোঽন্তরান্তরা .....।" [৪০] এই জন্যই এই ব্যভিচারিগুলি যেন স্থায়ি চিত্তবৃত্তির সূতায় গাঁথা ..... নিজেদেরকে ও বিচিত্র-অর্থময় স্থায়ি সূত্রটিকে বৈচিত্রময় করে। ব্যভিচারি ভাবগুলি যদি স্থায়িভাবের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী সংলগ্ন তাহলে স্থায়িভাবের উপস্থিতি সেখানেই কল্পনা করতে হবে যেখানে ব্যভিচারির অস্তিত্ব আছে। এই অবধারণার একটা বাধা এই যে দুটি ভাব যুগপৎ অবস্থান করতে পারে না, যতক্ষণ একটা ব্যভিচারিভাব প্রকট হচ্ছে ততক্ষণ সেখানে কোনও স্থায়ির স্থান নাই। যেহেতু কোনও ব্যভিচারির স্থান নাই দর্শক-পাঠকের চিত্তে, অতএব স্থায়িভারের অবস্থান এইখানেই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করা হয়েছে। ভৃত্যরা সদাসর্বদা দৃশ্যমান কিন্তু রাজা সবসময়ে লোকগ্রাহ্য নয় তাঁর দেখা ক্বচিৎ পাওয়া যায়, অতএব মনে করা হয়েছে যে স্থায়িভাব সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ সংস্কার বা বাসনার আকারে দর্শক-পাঠকের চিত্তে থাকে অবস্থা-বিশেষে প্রকট হয়।

বৈসাদৃশ্যের আর একটি কারণ এই হ'তে পারে যে রসতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেছেন যে স্থায়িভাব রসের উপাদান কারণ, যদিও স্পষ্ট ভাবে কেউই এই কথা বলেন নি। এই অনুমানের কারণ এই যে অনেকেই স্থির করেছেন যে যেখানে স্থায়িভাব আছে সেখানেই রস আছে বা থাকা উচিৎ। লোল্লটের মতে রস নাটকীয় চরিত্রের, শঙ্কুকের মতে নটের, অভিনব গুপ্তের মতে স্থায়িভাব দর্শক-পাঠকের—এ সব নির্ধারণের পশ্চাতে বোধ হয় এই তত্ত্বই ক্রিয়াশীল। যদি মনে করা যায় স্থায়িভাব রসের উপাদান কারণ নয় শুধু নিমিত্ত কারণ তা হলে স্থায়িভাব কাব্যনাটকে বা গ্রন্থের চরিত্রে এবং রসবোধ সহৃদয়ের চিত্তে হয় মানলে কোনও অসঙ্গতির উদ্বেগে উদ্বেজিত হ'তে হয় না। কিন্তু সেটা ঘটতে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে।

"যদ্যপি চৈষামপ্যন্যোন্যং গুণভাবোঽস্তি, তথাপি তত্তৎপ্রধানে রূপকে তত্তৎপ্রধানং ভাবতীতি রূপকভেদপর্যায়েণ সর্বেষাম প্রাধান্যমেষাং লক্ষ্যতে। অদূর ভাগাভিনিবিষ্ট দৃশাম্বেকস্মিন্নপি রূপকে পৃথক প্রাধান্যম"[৪১] যদিও একটির সঙ্গে অন্যটির (=পারস্পরিক) সম্পর্কে কোনও (স্থায়িভাবের) গৌণতা ঘটে তবুও যে নাটকে যে মুখ্য সেখানে সে মুখ্যই হয়। এই জন্য নাটক ভেদের পর্যায়ে এদেরই মুখ্যতা চোখে পড়ে। কাছে থেকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখলে কিন্তু এদের (= স্থায়িভাবের) পৃথক প্রাধ্যান্য দৃষ্ট হয়। এ থেকে মনে হয় সমগ্রভাবে দেখলে একটি নাটকে একটি স্থায়ীভাবের প্রাধান্য কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা আংশিক ভাবে দেখলে বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন স্থায়িভাব থাকতে পারে। অতএব স্থায়িভাব কাব্যনাটকের দৃশ্য বিশেষের বা পর্ববিশেষের বর্ণনীয় মুখ্য বিষয় বা প্রধান ভাব কিম্বা কোনও চরিত্রের তাৎকালিক মূল লক্ষণ।

এ পর্যন্ত দেখা গেল যে স্থায়িভাব নাটকের বস্তুবিশেষ, কিন্তু অভিনব গুপ্ত অন্যত্র বলেছেন স্থায়িভাব ব্যক্তিমাত্রেরই সুপ্ত স্পৃহা; তা যদি হয় তা হলে স্থায়িভাব নাটকীয় চরিত্র, নট, সামাজিক সকলেরই আছে। সকল প্রাণীরই জন্মগত ইচ্ছা থাকে সুখভোগ করবার এবং দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার, সকলেরই রিরংসা থাকে, প্রিয় বিচ্ছেদ হলে দুঃখ হয়, দুর্বলতা হেতু ভয় হয় ইত্যাদি। চিত্তবৃত্তি-বাসনা-শূন্য প্রাণী নাই, কোনও ভাব কারও বা অধিকমাত্রায় থাকে কারও কম, কারও ক্ষেত্রে উচিৎ বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কারও ক্ষেত্রে এর অন্যথা হয়। জন্ম থেকে এই স্থায়িভাব সকলের চিত্তে থাকে।[৪২]

বাসনা এবং সংস্কার পূর্বজন্মের ফলস্বরূপ চিত্তবৃত্তির অভিমুখিত্ব, যা অবচেতন মনে সুপ্ত ভাবে থাকে, একে বলা হয় "প্রাক্তনী", বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে যাকে inherited qualities বলা যায়। এ জীবনের বিদ্যাচর্চা বা অভিজ্ঞতালব্ধ চিত্তবৃত্তিকে বলা হয় "ইদানীন্তনী" বা acquired characteristics, যাকে আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না।

মানুষের রসাস্বাদন ক্ষমতা দুর্লভ, এই সহজ কথাটাকে আলঙ্কারিকরা পারিভাষিক শব্দ-প্রয়োগে বলেছেন যে সহৃদয় সামাজিকের মনে স্থায়িভাবগুলি বাসনার আকারে সূক্ষ্ম ভাবে না থাকলে তাঁর পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। বাস্তব ভোজনের বেলায় দেখা যায় সব খাদ্যপানীয়রস আস্বাদন করবার ক্ষমতা সকলের নাই, আমরা তার কারণ খুঁজতে যাই না। কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে রসোপলব্ধির ব্যাপারে যেখানে শুধু অরসিক বললেই চলে (অনেকেই এমন সখেদ উক্তি করেছেন) সেখানে আলঙ্কারিক তার হেতু খুঁজতে বাসনা সংস্কার প্রভৃতি পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল এনেছেন।

সকলেই যেমন রসিক সমঝদার হয় না, সকলেই কবি হয় না,

সকলের অভিনেতা হবার যোগ্যতা নাই। অতএব এই দুর্লভ অধিকার বা প্রবণতা বোঝবার জন্য সবক্ষেত্রেই কি পূর্বজন্মলব্ধ সংস্কার আছে মনে করতে হবে এবং তাকে "স্থায়িভাব" নাম দিতে হবে ? কবির ক্ষেত্রে "প্রতিভা" স্বীকার করেছেন সকলেই, সামাজিকের পক্ষে অভিনব গুপ্ত প্রতিভা স্বীকার করেছেন, তৎসত্ত্বেও তিনি এ ক্ষেত্রে সামাজিকের "স্থায়িভাব" আলোচনা করেছেন।

মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে রসশাস্ত্রের বাক্যগত কিছু মিল দেখা যায়। স্থায়ী এবং সঞ্চারী দুটি কথাই সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। যে কলিটি বারবার গাওয়া হয়, ফিরে ফিরে আসে, যা দিয়ে গান আরম্ভ ও শেষ হয় তাকে স্থায়ী বলা হয়। এটি সঙ্গীতেরই সর্বস্ব, বিবিক্ত হয়ে গায়কে বা শ্রোতায় প্রতিষ্ঠিত নয়, কাব্যনাটকের বেলায় এর অন্যথা হবে কেন ? সঙ্গীতে একটি বাদী স্বর রাজার ন্যায় বিরাজ করে, সম্বাদী অনুবাদী স্বর অমাত্য পরিচরের মতন, বিবাদী স্বর শত্রু-স্থানীয়। এক রাগিণীতে যেটা সম্বাদী বা অনুবাদী বা বিবাদী স্বর; অন্য রাগিণীতে সেটাই বাদী স্বর হতে পারে, অন্যগুলি তার সম্বাদী ইত্যাদি হতে পারে। বীর রসের যে কাব্যনাটকের স্থায়িভাব উৎসাহ তাতে যে বিস্ময় বা শোকের একেবারেই স্থান নাই তা নয়, গৌণভাবে আছে। তেমনিই অন্য স্থায়িভাবপুষ্ট নাটকে উৎসাহ গৌণভাবে থাকতে পারে। বাদীস্বর রাজার ন্যায় বিরাজ করে রাগিণীতে, অনুরূপ ভাবে বলা যায় স্থায়িভাব রাজার ন্যায় বিরাজ করে কাব্যনাটকে। নাটক-অভিনয় কালে যে ভাবটি নটের বা দর্শকের থাকে নাটক শেষ হ'লেও কি সেই ভাব চিরন্তন রূপে তাঁদের চিত্তে থাকে ? না সংসার-চিন্তায় ডুবে যায় ? কিন্তু রামের যে চরিত্র, রাবণের যে চরিত্র রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে তা শাশ্বত, তা চিরন্তন, তাদের পরিবর্তন নাই, তারাই "স্থায়িভাব" সংজ্ঞার প্রকৃত অধিকারী।

"তেন স্থায়িপ্রতীতিরনুমিতিরূপা বাচ্যা, ন রসঃ। অতএব সূত্রে স্থায়িগ্রহণং ন কৃতম্। তৎ প্রত্যুত শল্যভূতং স্যাৎ। *কেবলমৌচিত্যাদেবমুচ্যতে 'স্থায়ী রসিভূত' ইতি*"[৪৩] তাই বলতে হয় যে স্থায়ীকে বুঝতে পারা অনুমানস্বরূপ, কিন্তু রস তা নয়। এইজন্য সূত্রে "স্থায়ী" শব্দটি দেওয়া হয় নি; দিলে হয়ত মনে সন্দেহ হ'ত। "স্থায়ী রস হয়" এ কথা বলা হয় শুধু ঔচিত্যের খাতিরে। স্থায়ী যদি অনুমান মাত্র তা হলে নিশ্চয়ই সামাজিকের চিত্তে নাই কারণ সামাজিক নিজের কোনও ভাবকে অনুমান করেন না, নিশ্চিত রূপে জানেন, অনুমান করেন শুধু নটের বা নাটকীয় চরিত্রের ভাবকে। এই মত অনুসারে স্থায়ীর অনুমান হয় বিভাব-অনুভাবাদির দ্বারা যা প্রত্যক্ষ, বিভাব-অনুভাবাদি রস নির্মাণের জন্য যথেষ্ট, স্থায়ী উহ্য থাকলেও ক্ষতি নাই কারণ স্থায়ী অনুমেয়।

অভিনব গুপ্ত বলেছেন প্রধান স্থায়িভাবগুলি পুরুষার্থ নিষ্ঠ।[৪৪]

নাটক যদি কারও পুরুষার্থের সহিত জড়িত থাকে তাহলে সেটা নায়ক-নায়িকার। নাটক-দর্শনে কোনও সামাজিকের ধর্ম অর্থ কাম বা মোক্ষলাভ হয় না। বড়জোর এ সবের অধিগমের পন্থা দৃষ্ট হতে পারে। অতএব স্থায়িভাব নাটকের নায়ক-নায়িকার।

স্থায়িভাবের আস্পদ দর্শক-পাঠক এই যুক্তির বিপক্ষে বলা যেতে পারে দর্শক যখন প্রেক্ষাগৃহে আসেন, বা পাঠক যখন গ্রন্থ হাতে নেন, তখন মুক্তমনেই তা করেন কাব্যনাটক কর্তৃক বিভাবিত হবার আশায়; তাঁর কোনও পূর্বসংস্কার বা পক্ষপাত থাকলে তিনি কাব্যবিচার বিষয়ে নিরপেক্ষ হতে পারেন না। যদি নাটক-দর্শন বা কাব্য পাঠকালে কোনও একটি ভাব তাঁর চিত্তকে অধিকার করে, সেটা সম্ভব হ'তে পারে নাটকের বা কাব্যের প্রভাবে, কিন্তু সর্বকালে বিদ্যমান নয়টি স্থায়িভাবের অবস্থান তার চিত্ত জুড়ে আছে—এ যুক্তি অপ্রত্যয়ার্হ। অন্য দিকে নট যগন রঙ্গমঞ্চে আসেন তখন যে চরিত্রের তিনি অভিনয় করছেন তার স্থায়িভাবেই সম্পূর্ণ বিভাবিত হয়ে আসেন সুতরাং স্থায়িভাব তাঁরই।

ভাব একটি সাধারণ শব্দ, emotion অর্থে প্রযোজ্য, নট সহৃদয় প্রভৃতি যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহৃত হ'তে পারে, কিন্তু স্থায়িভাব একটি পরিভাষিক শব্দ, এর ব্যবহার বিশেষার্থে হওয়া উচিৎ। নাটকের যে প্রাণবৃন্ত থেকে দর্শকের চিত্তে রসের উদ্রেক হয় তা'কে যদি "স্থায়ী" আখ্যা দেওয়া হয়, তা'হলে সহৃদয়ের অন্তরে যে চিত্ত-প্রবণতা সুপ্তভাবে অবস্থান করে, কাব্যনাটকের অনুধাবন কালে শুধু উদ্বুদ্ধ হয়, তাকে "স্থায়িভাব" না বলে' অন্য কিছু আখ্যা দিয়ে অভিনব গুপ্ত অনভিপ্রায়িক অর্থবোধ থেকে মুক্তি দিতে পারতেন। কাব্যনাটকের অনুশীলন কালে যার বিচলতি নাই তার স্থিতিত্বকে স্থায়িভাব বললে কোনও বিপর্যয় হয় না, যে বৈসাদৃশ্যের সম্ভাবনা থাকে দর্শক-পাঠকের অন্তর্নিহিত সুসুপ্ত মনোবৃত্তিকে "স্থায়ী" ব'লে চিরস্থায়িত্ব দিলে।

বিশ্বনাথ বলেছেন রত্যাদি বাসনা ব্যতীত রসাস্বাদ হয়না[৪৫] কিন্তু এই বাসনাকে সহৃদয়ের স্থায়ী বলেন নি। তিনি এক একটি কাব্য নাটকের এক একটি স্থায়িভাব বলেছেন,[৪৬] কোনও ব্যক্তির স্থায়িভাব বলেন নি।

## রস-ভোগে কার্য-প্রবৃত্তি নাই

যদি কোনও নাটকের বিষয়বস্তু হয় রাম-রাবণের যুদ্ধ তা হলে সে নাটক হ'বে বীররসের, যার স্থায়িভাব উৎসাহ। পরস্পর দর্শনে উভয়েরই স্পৃহা পরস্পরকে হনন করা। রামরূপী নট এবং রাবণরূপী নট যে রঙ্গমঞ্চে তা করে না তার কারণ তারা জানে তারা

শুধু অভিনয় করছে, তা'হলে কি করে বলা যায় যে নট রাম বা রাবণের ভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত ? ভাবের প্রতিঘাতে নাটকীয় চরিত্র ক্রিয়াশীল বা ক্রিয়েচ্ছু, রামের ইচ্ছা রাবণের দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু নট সে ইচ্ছার অভিনয় করে মাত্র, রাবণের ভূমিকায় যে নেমেছে তা'র প্রতি ক্রোধ মৌখিক আক্রোশ লোক দেখানো, নটের অঙ্গভঙ্গী এমন সসাবধান যাতে অস্ত্র সত্য সত্যই রাবণের গায়ে না লাগে। কিন্তু আক্রমণ এবং দৈহিক আঘাত ছাড়া তার সব বিদ্বেষাত্মক বাক্য-ব্যবহার নটরা এমন নিপুণ ভাবে সম্পাদন করে যে মনে হয় তারা হননেচ্ছু চিরশত্রু। দর্শক যদি প্রকৃত রসিক হ'ন তাহলে রামকে বা রাবণকে আঘাত করবার কোনও স্পৃহা তাঁর থাকে না, তিনি স্থিরভাবে নিবিষ্টচিত্তে নটদের আঙ্গিক বাচিক অভিনয় নিরীক্ষণ করছেন, কবির রচনা এবং নটের অভিনয়ের ঔৎকর্ষ যাচাই করছেন। রামের উৎসাহে কর্মের প্রেরণা আছে সেটা ভাব; দর্শকের ঔৎসুক্যে কার্যপ্রবৃত্তি একেবারেই নাই, এই কার্মোদ্যমহীন নিস্পৃহ ঐকান্তিক সহমর্মিতা রস, দর্শক যার নিশ্চেষ্ট ভোক্তা। নাটকীয় চরিত্রের উদ্যত ভাব নটের মাধ্যমে দর্শকে পৌছে অনুত্তেজক রসে পরিণত হয়, কবির সর্জনা সমাপ্ত হয় রসের চর্বণায় বা আস্বাদনে, যেটা সব ক্ষেত্রেই আনন্দের। রামরাবণ দ্বেষভাব-বিভাবিত, তাঁর যুযুৎসু, আক্রোশী, রসভোগ তাঁদের জন্য নয়; অভিনেতার সে ভাব না থাকলেও নকল উদ্যম পরাক্রম আছে, তিনিও রসভোগী নয়। রসভোগ করেন নিরুদ্যম নিরাসক্ত দর্শক। দর্শক তন্ময় বা রামময় ন'ন্, তিনি মন্ময় আপনাতে আপনি নিবদ্ধ। ভাব এবং রসের প্রভেদ এই যে প্রথমটি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে কর্মে প্রেরয়িত করে, দ্বিতীয়টি চিত্তকে নিরাসক্ত করে নৈষ্কর্মক সহানুভূতি আনে। অতএব রস আছে সহৃদয়ের হৃদয়ে, ভাব বা স্থায়িভাব আছে নাটকীয় চরিত্রে, ছদ্মভাব আছে নটে।

ভাব চিত্তে আলোড়ন আনে, কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে আগুয়ান করে, অবাঞ্ছিতের থেকে বিমুখ করে, কিন্তু রসাস্বাদী চিত্ত সমভাবাপন্ন, রসমগ্নতা হেতু কারও প্রতি বিরোধ-বৈষম্য নাই। কাব্যনাটকের চরিত্রের যে ভাব সেটি লোক সংসর্গে লোক যাত্রা বিধানে সৃষ্ট তাই একে বলা হয় লৌকিক, কিন্তু এ থেকে দর্শকের মনে যে রসসৃষ্টি হয় সেটি লোকসংসৃত নয় নৈর্ব্যক্তিক, সে কারণে বলা হয় অ-লৌকিক। দর্শকের মনের নিভৃতে এই রসশালা, এ রস প্রস্তুত হওয়া মাত্র ভুক্তিত হচ্ছে, সে কারণেও অ-লৌকিক।

কাব্যের বেলায় কোনও নট নাই, কাব্যগত চরিত্রের ভাব সরাসরি পাঠকের মনে রসে পরিণত হয়। ঝঞ্ঝা তুষার প্রতিরোধ ক'রে এভারেস্টআরোহী যে-আসন্ন-দুর্দৈবের শঙ্কা নিয়ে দুর্গম পথ এক পা এক পা করে এগুচ্ছে, পাঠক বৈশাখ মাসে বাড়ীতে বসে সেই

আরোহণ পর্বের রস গ্রহণ করছেন্ মনে হচ্ছে হিমশীতল বাতাসে তাঁর হাত পা অবশ হয়ে আসছে পা ফেলে অগ্রসর হতে পারছেন না অথচ পা ফেলবার চেষ্টাও করছেন না, তিনি আরোহীদের জন্য পূর্ণমাত্রায় শঙ্কিত ব্যাকুল, তাদের হিতকামনায় মন্ত্র জপছেন যেন নিজেরই বিপদ উপস্থিত। কিন্তু এ ব্যাকুলতা আনন্দময় কারণ এতে কর্মের উত্তেজনা প্রেরণা অবকাশ নেই।

"সজ্জন-সভায় একবার শ্রীরামায়ণ পাঠকালে শ্রীহনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন-প্রসঙ্গ হইতেছিল, তাহার শ্রবণে তত্রত্য কোনও সহৃদয় ভক্ত ঐরূপ রসাবেশে লজ্জা-সঙ্কোচাদি পরিত্যাগে স্বয়ংও সমুদ্রলঙ্ঘন করিবার জন্য সভামধ্যে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।"[৪৭] যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনি হনুমানের ভাবে বিভাবিত পরমভক্ত হ'তে পারেন কিন্তু রসগ্রহণক্ষম সহৃদয় নয়, তা যদি হ'তেন তা'হলে হনুমানের লম্ফ অনুকরণ করবার বাসনা হ'ত না। এইখানে স্মরণ করি অভিনব গুপ্তের নির্দেশ যে নিজের সুখদুঃখ-বাসনাকে নাটকীয় চরিত্রের সহিত জড়িত করা এবং চঞ্চলতার কারণে চিত্তবিশ্রান্তি হারানো রসপোলব্ধির বিশেষ বিঘ্ন।

কোনও প্রথিতযশা নট এক দুর্বৃত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, দর্শকের মধ্যে ছিলেন বিদ্যাসাগর। প্রসিদ্ধি আছে দুর্বৃত্তের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর নটের দিকে চটি ছুড়েছিলেন রঙ্গমঞ্চের উপরে। দশকর্মা বিদ্যাসাগর পঠন-পাঠন দেশের ও দশের হিতসাধন করে' সময় পেতেন না, বোধ হয় যাত্রা নাটক ক্বচিৎ দেখে থাকবেন। নাটক দর্শনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস থাকলে তিনি অভিনেতার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তা'কে ফুলের মালা দিতেন, অবশ্য অভিনয় শেষ হওয়ার পরে।

অভিনেতা রামের সঙ্গে কার্যগত না হ'লেও ভাবগত তাদাত্ম্য অনুভব করেন, কিন্তু কত দিন তা সম্ভব ? যদি অভিনয় বহুদিন ধরে' অনুষ্ঠিত হয় তখনও কি সে তাদাত্ম্য বর্তমান থাকে, না তখন যন্ত্রবৎ অভ্যাসে পরিণত হয় ? নট যদি রামায়ণ পড়ে' রামচরিত্রে বিভাবিত হ'য়ে রামের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করেন তা হলে নাটকের উপস্থাপনে director বা পরিচালকের দরকার হ'ত না। পরিচালক নটকে ব'লে দেন কিভাবে অভিনয় করলে দর্শক ভাববে সত্যই রাম বুঝি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত, অর্থাৎ ব্যাপারটা কৃত্রিম, চাতুর্য-সাপেক্ষ। বিশ্বনাথ বলেছেন নট বা অনুকর্তা রসাস্বাদক হ'তে পারেন না কারণ তাঁর অভিনয় শিক্ষা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ[৪৮], অর্থাৎ স্বতঃউত্থিত নয়, নট অনুভবিত না হ'য়েও চমৎকার অভিনয় করতে পারেন। অবশ্য এও বলেছেন যে কাব্যার্থ-চিন্তনের দ্বারা নট যদি রামের স্বরূপতা প্রদর্শন করেন তা হ'লে তিনিও সামাজিক রূপে গণ্য হ'তে পারেন অর্থাৎ প্রতিভাবান নটের পক্ষে সাধারণ আরোপ খাটে না, যেমন

প্রতিভাবান কবির পক্ষে অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম খাটে না। সামাজিক বা সমালোচকের পক্ষে প্রতিভার প্রয়োজন, নাটক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনের অন্তঃস্থলে যুগপৎ অনুভূত হ'তে থাকে তিনি বাল্মীকির অপূর্ব রচনা উপভোগ করছেন, নটের কৌশলী উদ্ভাবনশীল অভিনয় দেখছেন। শুধু তাই নয় তিনি ব'লে দিতে পারেন কাব্য রচনার বৈশিষ্ট্য অভিনবত্ব কোথায় এবং নটের সু-অভিনয়-কলার কারণটি কি। এই প্রতিভাকে অভিনব গুপ্ত স্বীকার করেছেন। নাটকীয় ঘটনার স্থানকালীয় দূরত্ব হেতু এবং সাধারণীকরণের প্রভাবে ভাব নৈর্বক্তিক প্রকৃতি অর্জন ক'রে রস রূপে পরিণত হয়, তখন নাটকীয় চরিত্রের প্রেম ক্রোধ কারুণ্য দর্শককে উত্তেজিত করে না, প্রতিক্রিয়া জাগায় না, কর্মে প্রবুদ্ধ করে না, শুধু সমাহিত রসের উদ্রেক করে যা তিনি বিনা উত্তেজনায় ভোগ করেন। দেশকালপাত্রে ভাব আবদ্ধ, রামায়ণ বিশেষ দেশকালের বিশেষ ঘটনা নিয়ে লেখা, তা থেকে আমরা আজ অনেক দূরে, সেসব ঘটনার হর্ষবিষাদ দ্বেষদ্বন্দ্ব হানাহানি অনেক হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হ'য়ে এসে আমাদের মনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন উদার আনন্দ দেয়। লবকুশের গান ত্রেতা যুগের অযোধ্যার মধ্যে নিবদ্ধ নেই, এখন জনসাধারণে ব্যাপ্ত সকলের গেয়, বিশেষ ভাবদ্যোতনা আজ সাধারণীকৃত হয়ে সকলের সম্ভোগের রসবস্তু। এই কারণে কাব্যনাটকের ভয়াবহতা বা কারুণ্য পীড়াদায়ক নয় উপভোগ্য, করুণ দৃশ্যে দর্শক অশ্রুমোচন করলেও সেটা দুঃখের নয় রসতৃপ্তির। তিনি এখন জগৎ থেকে অপসৃত, নিরালম্ব, বাস্তবসংস্পর্শহীন। এ কারণে রসানুভূতি "বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যঃ ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ"[৪৯] "ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন অলৌকিকচমৎকারকারী।"[৫০] ব্রহ্মাস্বাদের বেলায় যেমন বিষয়-বৈবিধ্য পরিহার ক'রে অন্য-বিষয়-নির্লিপ্ত হ'য়ে একান্তমনে আপনাকে নিয়োজিত করা হয়, রসাস্বাদের বেলাতেও বহু থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অহং-নিরস্ত হ'য়ে রস-সমন্বয়ের একাত্ম আনন্দাভিভূতিতে চিত্তের পরিণতি হয়। রসাস্বাদে চিত্ত-বিক্ষেপের অবকাশ নাই। সমান উপভোগ্যতা হেতু সব রসের সমীকরণ ক'রে ভোজ শৃঙ্গার প্রকাশে বলেছেন রস একটাই। তাঁর মতে রসের উদ্দেশ্য এবং কার্য আত্মতৃপ্তি এবং সে কারণে রস একটা মনে করাই বাঞ্ছনীয় এবং রস অহঙ্কার জাতীয়। এই অহঙ্কার বা অভিমান সাংখ্যদর্শনের অহঙ্কারের অনুরূপ, যা অন্তঃকরণ সৃষ্টির আদি কারণ। এই একমাত্র রসকে ভোজ বলেছেন শৃঙ্গার, এটি শাস্ত্রোক্ত মধুর রস নয়, সকলের উচ্চে অর্থাৎ শৃঙ্গে অবস্থিত বলেই শৃঙ্গার।[৫০ক] এই শৃঙ্গার রস উৎপন্ন হ'তে পারে ৪৯ প্রকার ভাবের যে কোনওটি থেকে, স্থায়িভাব ৮, সাত্ত্বিক৮; ব্যভিচারী৩৩, সর্বশুদ্ধ৪৯।

বিশ্বনাথ মনে করেন সব রসের প্রাণ চমৎকারিত্ব অতএব সব

রসকেই এক বলা চলে।[৫১] অভিনবগুপ্ত বলেছেন "অস্মন্মতে তু সম্বেদনম্ এবানন্দঘনম্ আস্বাদ্যতে"[৫২] আমাদের মতে আনন্দঘন চেতনাই আস্বাদিত হয়।

কাব্যনটকে সংঘর্ষ, বেদনা, শোক, দুর্বৃত্তি, দুরাশয়তা, অত্যাচার প্রভৃতি থাকলেও তার সম্ভোগ সুখের হয় আরও একটি কারণে, দর্শক-পাঠকের প্রত্যাশিত হৃদয়ানুভূতির খোরাক কবি যথাপরিমাণে যুগিয়ে দেন প্রতিমুখে আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি ক'রে। দশরথ-কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাজ্যবঞ্চিত হ'য়ে রাম নির্দ্রোহে আজ্ঞা মেনে নিয়ে মহানুভবতা দেখালেন এবং এর প্রতিদানে তিনি উদার ব্যবহার পেলেন সীতা ভরত লক্ষ্মণের কাছে। বিমাতার দুর্ব্যবহার, নগরবাসীর নিষ্প্রতিষেধক মনোভাব, অরণ্যবাসের দুঃখকষ্ট বিলীন হয়ে গেল শুধু রামের নয় অন্য অনেকের আত্মত্যাগের মহিমায়। আওরঙ্গজেব বা সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে বা তাঁদের পার্শ্বদ অনুগতজনের ব্যবহারে মহদাশয়ের কোনও লক্ষণ নাই, এঁদের জীবন নিয়ে সার্থক নাটক লিখতে হ'লে অনেক মিথ্যা কথা লিখলে তবেই উপাদেয় হয়।

কাব্যপাঠে বা নাটক দর্শনে আমাদের মনে যে প্রকারের মনোবৃত্তি জন্মায়, প্রাত্যহিক জীবনে সে জাতীয় মনোবৃত্তির অপ্রতুলতা নাই, তীব্রতায় কমবেশি হ'তে পারে অবশ্য। অনুরাগ দ্বেষ হিংসা আদি মনোবৃত্তির আবির্ভাব আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তবর্তী কিন্তু এরা কি কাব্যরসের জনয়িতা ? বাস্তব জীবনে পুত্রের প্রতি মাতার বাৎসল্য, অপকারীর প্রতি বিদ্বেষ, আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ এ রকম বহু মনোবৃত্তিকে বলা যেতে পারে স্থায়িভাব, কেতাবে পড়া নয় রঙ্গমঞ্চে দেখা নয়, আমাদের প্রাত্যহিক প্রত্যয়ার্হ বিষয়। কিন্তু এসব থেকে যে রসোৎপত্তি হয় কোনও আলঙ্কারিক বলেন নি, এ কারণে বলেন নি যে এসব মনোভাবের সহিত কার্যের ইচ্ছা ও আগ্রহ জড়িত আছে, সন্তানকে আদর করার, অপকারীর প্রতি প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা আছে, অতএব সেখানে রসোৎপত্তির অবকাশ নাই।

কাব্যরসের আস্বাদনকে বলা হয়েছে অলৌকিক। কবি, নাটক, নট, রঙ্গমঞ্চ, ভাব ভাষা—সবই লৌকিক, এদের মিশ্রণে অলৌকিক পদার্থের সৃষ্টি হয় কি করে ? রসটা অলৌকিক নয় তার উৎপত্তিটা অলৌকিক, যেমন পুষ্পরসকে ভ্রমর মধুতে পরিবর্তিত করে অলৌকিক উপায়ে, বিজ্ঞান আজও তা আবিষ্কার করতে পারে নি। লৌকিক ক্ষেত্রে সুখে অনুরাগ দুঃখে বিরাগ উৎপন্ন হয়, কোনও বস্তু বা ব্যক্তি আকর্ষণ কেউ বা বিকর্ষণ আনে, কিন্তু যা যথার্থই রসোত্তীর্ণ তাতে থাকে শুধু আনন্দ, সীতাহরণ এবং সীতা উদ্ধার দুটিকেই রসপ্লুত চিত্ত সমান নিয়ন্ত্রিত উৎসাহে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়জ-প্রতিক্রিয়াহীন শুদ্ধ মানসাস্বাদের ফলে সব ভাব বিকারহীন একমাত্রতায় পরিণত

হয়, এ কারণেই ভোজ বলেছেন রস শুধু একটাই, এবং এ কারণেই ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনা চলে যেহেতু ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম-উপলব্ধি যেমন নেতি নেতি ক'রে হয় রস-উপলব্ধি তেমনই সকল মানসিক উত্তেজনাকে বাদ দিয়ে হয়। এ কারণে রসোৎপত্তি অলৌকিক। "তত্র সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদঃ বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা[৫৩] সর্বরসের আস্বাদই প্রায় শান্তরসের মত হয়, বিষয় থেকে চিত্ত-পরিনিবৃত্তির কারণে।

## প্রাতীতিক ভিত্তি

আমরা দেখেছি অভিনব গুপ্তের মতে বিঘ্ন দূর হ'লেই তবে রসানুভূতি হয়, এবং "সম্ভাবনা-বিরহ" একটি বিঘ্ন। এই বিঘ্ন দূর হ'তে পারে দর্শকের হৃদয়-সম্বাদ অর্থাৎ সমর্থন দ্বারা এবং লোক-সামান্য বিষয় অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ের অবতারণা দ্বারা। যদি অলোক-সামান্য বিষয় প্রদর্শন করতে হয় তা হলে কোনও প্রসিদ্ধ চরিত্রের, যেমন রামের অবতারণা করতে হয় যা'তে পুরাণ-প্রসিদ্ধি হেতু পূর্ণ প্রত্যয় থাকতে পারে দর্শকের মনে। এই কারণেই বলা হয় যে নাটক কোনও প্রসিদ্ধ বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখতে হ'বে যা'তে তার ব্যুৎপত্তি এবং উপদেশ সম্পূর্ণ নিরূপিত হয়।[৫৪]

"রামাদেস্তু তথাবিধম অপি চরিতম পূর্ব প্রসিদ্ধি পরম্পরোচিত-সম্প্রত্যয়োপারূঢ়ম অসত্যতয়া ন চকাস্তি।"[৫৫] কিন্তু যখন রামাদি বিষয় বর্ণিত হয় তখন সকল মিথ্যা বর্জিত হয় কারণ পূর্বপ্রসিদ্ধি ও পরম্পরা-কারণে নাটকীয় চরিত্র সম্বন্ধে দর্শকের প্রতীতি জন্মে।

অভিনব গুপ্ত আরও বলেছেন যে কোনও বর্তমান চরিত্রের অনুকরণ বিধেয় নয় কারণ সে ক্ষেত্রে দর্শক অভিনীত চরিত্রের রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত হবেন এবং সে কারণে নাটকীয় ভাব বা ঘটনার সহিত তন্ময়ীভাব অনুভব করতে পারবেন না, প্রীতির অভাব হেতু ব্যুৎপত্তিরও অভাব হ'বে। বর্তমান চরিত্রে ধর্মাদির কর্মফল সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ গোচর হ'বে এবং সে কারণে নাট্য প্রয়োগ ব্যর্থ হবে।[৫৬] রস-ভুঞ্জনের ব্যাপারে প্রীতীতি বা বিশ্বাসকে এমন একটি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে যে নূতনত্বের অনিশ্চিত আস্বাদের চেয়ে পাঠক-দর্শক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অধিক সম্মান দিতেন। যে ঘটনা অচির অতীতে ঘটেছে বা যা কবির কল্পনা-প্রসূত সে সম্বন্ধে লোকের মনোভাব নিরপেক্ষ বা তর্কাতীত নয়, কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র বা এমন ঘটনা যা সুদূর অতীতে ঘটেছে তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও সে মতভেদ সর্ব-লোকগ্রাহ্য হবে না, অতএব তার ভিত্তি দৃঢ় এবং প্রতীতিজন্য। ফলে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য ঐতিহ্যভিত্তিক পুরাতনীর উপরে যতটা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত নূতন উদ্ভাবনীর উপর তেমন নয়। এই

সীমাবদ্ধতার কারণে যে গতানুগতিকতা শিলীভবন এসেছে, প্রতিভার যথার্থ স্ফূরণে যে বাধা জন্মেছে তার জন্য আলঙ্কারিকের বিধান কতটা দায়ী এবং লোকরুচি কতটা, সেটা নির্ণয় করা আজ প্রায় অসাধ্য। অভিনব গুপ্ত বলেছেন বটে "স্বসাক্ষাৎকৃত আগমানু-মানশতৈরপি অনন্যথাভাবস্য স্বসম্বেদনাৎ"[৫৭] যে বস্তু সাক্ষাৎ অনুভবগোচর তা শত আগম ও অনুমান দ্বারা অন্যথা হ'তে পারে না আপন সম্বেদনা বা অনুভূতির কারণে, তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ নীতি স্বীকৃতি পায় নি।

## ভক্তিরস

অভিনব গুপ্ত প্রমুখ সনাতন আলঙ্কারিকদের মতে ভক্তি রস নয়, ভাবের কোঠায় পড়ে, রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে না। মম্মট ভাব সম্বন্ধে বলেছেন "রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঽঞ্জিতঃ ভাবঃ প্রোক্তঃ।"[৫৮] দেবাদির প্রতি রতি বা আসক্তি এবং তদ্বিষয়ক ব্যঞ্জিত ব্যভিচারিকে ভাব বলা যায়।

"রত্যাদিশ্চেন্নিরঙ্গঃ স্যাদ্‌দেবাদিবিষয়োঽথবা
অন্যাঙ্গভাবভাগ্ বা স্যান্ন তদা স্থায়িশব্দভাক্।"[৫৯]

রতি-আদি যদি অঙ্গহীন হয়, অথবা দেবাদিবিষয়ক হয়, অথবা অন্যের অঙ্গভাবভাক্ হয়, তা হলে স্থায়ি-পদবাচ্য হয় না।

"সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে।"[৬০]

প্রধান প্রধান সঞ্চারী ভাব, দেবতা-সম্বন্ধীয় রতি এবং যে স্থায়িভাব সবেমাত্র উদ্বুদ্ধ হয়েছে, এ সকলকে ভাব বলা হয়।

"ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়ীভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবতুমর্হতি অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে—ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপ-পত্তেঃ।"[৬১] যে ভক্তিরস ভগবানকে আশ্রয় ক'রে আছে, রোমাঞ্চ-অশ্রুপাতাদি দ্বারা প্রকাশিত হয়, হর্ষাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণ-সময়ে যা ভগভক্তের দ্বারা অনুভূত হয়, তা'কে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ভগবানের প্রতি অনুরাগরূপ ভক্তি স্থায়িভাব। অনুরাগের কারণে বৈরাগ্যের বিরুদ্ধতা হেতু এটা কোনও শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। বলা হয় দেবতাদিবিষয়ক অনুরাগ হেতু ভক্তি ভাবের অন্তর্গত হওয়াতে রসত্বের উৎপত্তি হয় না।

দেবতা-বিষয়ক রতিকে রস না ব'লে শুধুমাত্র ভাব বলার কারণ

আছে। বহুক্ষেত্রে ভক্ত হ'ন আর্ত, অর্থার্থী, যাচিতৃ, যাদের কামনা প্রার্থনা আছে ভগবানের কাছে, সুতরাং রসিক হওয়ার উপযোগী নিস্পৃহতা যাদের নাই। যে ভক্ত নিষ্কাম তারও আকুলতা আছে ভগবানকে পাবার, সাক্ষাৎকার লাভ করবার, এ রকম পরিপ্লুত অন্বেষাকুল মন রস গ্রহণের অন্তরায়। রসিকের মন রসে ভরপূর থাকে তাতে কোনও তরঙ্গ থাকে না, কিন্তু ভক্তের মন সর্বদা ভক্তিবিভাবে আলোড়িত, সুতরাং তিনি রসিকপদবাচ্য হ'তে পারেন না।

ভক্তের অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও মুক্তিলাভের অর্থাৎ সংসার-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতির উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এই নিষ্কৃতি লাভ ক'রে কোনও ভক্ত চান অক্ষয় বৈকুণ্ঠে বাস, কোনও ভক্ত চান চিরকালের জন্য শুধু অবাধে ভগবৎ-সেবার অধিকার। দুটিই উদ্দেশ্যমূলক্ মনোবৃত্তি, কোনও কিছুর প্রাপ্তির আশা; এবং সেই প্রাপ্তির জন্য মনোবেগ আছে কর্ম আছে, সে কারণে আলঙ্কারিকের মতে ভক্তি রস নয়। রসের প্রকারভেদ আছে, স্থায়িভাবেরও আছে, কিন্তু স্তরভেদ বা পরিমাণভেদ নাই যা ভক্তিশাস্ত্রের বেলায় আছে, রূপ গোস্বামী কৃষ্ণপ্রীতিকে বিভিন্ন কোঠায় সাজিয়ে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে তারতম্য এনেছেন—যথা ভাব, প্রেম, রাগ প্রভৃতি। অপরদিকে মুক্তিকামনা বা সেবাকামনা না ক'রে ভগবৎ-কথার অনুশীলনে যে আনন্দ তা বিষয়ী বা বিরক্ত জন সমান অধিকারে পেয়ে থাকেন, সেটি ভক্তি নয়, সেটি উদ্দেশ্য-রহিত প্রয়োজন-বহির্ভূত, সেটি রস-শাস্ত্রের শান্ত-শৃঙ্গারাদি যেকোনও রস। অভক্ত জনের এই রসাস্বাদে কোনও বাধা নাই।

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ নিগূঢ় সর্বাতিরিক্ত ব্যক্তিগত, এ সম্বন্ধ জনে জনে পৃথক। শুধু তাই নয়, এ সম্বন্ধ একান্ত আপন, এর অংশীদার কেউ নাই। পার্থিব জগতে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হ'তে পারে কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর পিতা, মাতা, ভাই, পুত্র, বন্ধু আছে তাদের সঙ্গে পৃথক সম্বন্ধ আছে, তারাও কোনও না কোনও প্রকারের দাবীদার, দাম্পত্য সম্বন্ধকে ঘনিষ্ঠ বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে; কিন্তু ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে বাধা ঘটাতে পারে এমন কোনও সম্বন্ধিত ব্যক্তি নাই, যেখানে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক নিবিড় সেখানে ভক্তের আর কোনও সম্পর্কের দুষ্প্রবেশ নাই। এইরূপ একান্ত সম্বন্ধ যাকে কোনও রূপে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় না, যার সাধারণীকরণ হতে পারে না, তাকে রসের বিষয়ীভূত ব'লে স্বীকার করা কঠিন। সনাতন রসশাস্ত্রে mysticism—এর স্থান নাই, যা ভক্তিশাস্ত্রে আছে।

সনাতন রসশাস্ত্র মতে ভাব উদিত হয় কাব্যনাটকের চরিত্রে, তাঁর কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় যে ভাবে যখন তিনি বিভাবিত তার আনুরূপ্যে, সদয় নির্দয় হার্দ্য অসূয়ক তাঁর সব রকম ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়

তাৎকালিক ভাবের দ্বারা। অপর দিকে রসভোগ করেন সামাজিক, তাঁর কোনও কর্মস্পৃহা নাই। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কৃষ্ণ, তাঁর পরিকর, প্রেয়সী, কৃষ্ণের ভক্ত, সকলেই রসের পাত্র, এবং সকলেরই অল্পবিস্তর কর্মে উৎসাহ আছে। অতএব এখানে রস ও ভাবে কোনও পার্থক্য নাই, বিভাজন কৃত্রিম। সনাতন রসশাস্ত্রীকে অনুবর্তন করলে বলতে হয় প্রকৃত ভক্তিরস আস্বাদন করতে পারেন এমন জন যাঁর কৃষ্ণকথায় অনুরাগ আছে, শুনে রসিত হ'ন, অথচ কোনও কর্মস্পৃহা নাই এমন কি সেবা বাসনাও নয়।

বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন "ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্"[৬৩], রত্যাদি বাসনা না থাকলে রসাস্বাদ হয় না। এখানে বাসনার সরলার্থ মানসিক প্রবণতা নেওয়া যেতে পারে প্রাক্তন প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয়তার মধ্যে না গিয়ে। পূর্বোক্তির সঙ্গে এর কোনও বিরোধ নাই। বাসনা এবং কর্মপ্রবণতা এক জিনিষ নয়। রতি বাসনা না থাকলে শৃঙ্গার-রস আস্বাদন সম্যক হয় না কিন্তু রতি-বাসনা যে সবক্ষেত্রে নারীসঙ্গমেই পরিসমাপ্ত হবে এটা নিয়ম নয়। কান্ট মনের তিনটি প্রকোষ্ঠ কল্পনা করেছিলেন তাদের একটি emotion বা মনোবেগ বা বাসনা এবং আর একটি will বা কর্মের ইচ্ছা; মনোবেগ সব ক্ষেত্রে কর্মোদ্যমে পরিণত হয় না, sublimation-এর প্রভাবে শিল্পসাহিত্যে, ধর্মাচরণে, বা অন্য মানসিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। যেখানে বাসনা আছে কিন্তু তাকে চরিতার্থ করবার জন্য কর্ম-প্রেরণা নাই সেখানেই আর্টের জন্ম।

মধুসূদন সরস্বতী ক্লাসিক আলঙ্কারিকদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন।

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদযোজ্যং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি॥"[৬৪]

দেবাদিবিষয়া রতি বলবান ব্যভিচারী রূপে ব্যঞ্জিত হয়ে ভাব নামে কথিত হয় রস রূপে নয়—এই যে কথা রসবেত্তারা বলেন, সে কথা জীবত্বনিবন্ধন পরমানন্দরহিত অন্য দেবতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যিনি পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাঁর প্রতি প্রযোজ্য নয়।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বোপদেব ভক্তিকে রস ব'লে স্বীকার করেন। বোপদেব লিখেছেন "......ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণোর্বিষ্ণু ...ভক্তনাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনাজনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ।"[৬৫] ব্যাসাদিবর্ণিত বিষ্ণুর ও বিষ্ণুভক্তগণের নবরসাত্মক চরিত্র শ্রবণাদি দ্বারা যে চমৎকার (ভাব) জন্মে তাহাই ভক্তিরস।

পরমব্রহ্মকে রসস্বরূপ ভাবে দেখবার প্রয়াস গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যরা যেমন করেছেন এমন আর কেউ নয়। "রসো বৈ সঃ"

তিনিই রস। সুতরাং তিনিই সকল রসের আকর বা মূল, তিনিই আদিরস। কৃষ্ণপরিকরদের কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই, এমন কি কৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কায় তাঁরা কাতর। এর ব্যখ্যায় কথিত হয়েছে যে এই ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনতা মায়ার প্রভাবে ঘটে নি, কৃষ্ণের মাধুর্যের আধিক্যে ঐশ্বর্যভাব অবলুপ্ত হয়েছে। অন্য কোনও ধর্মে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব-বিলোপের এমন প্রয়াস নাই, এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব।

রসতত্ত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধারণতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুবর্তন করেছেন, বিভাব অনুভাব সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ইত্যাদির সংজ্ঞা ভরতের অনুরূপ, কিছু প্রভেদ অবশ্য আছে। সর্বাধিক পার্থক্য স্থায়িভাব ও রসের বেলায়। স্থায়িভাব একটিমাত্র, কৃষ্ণবিষয়া রতি[৬৬], নিত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্তদের চিত্তে এবং সাধনসিদ্ধ বা জাতরতি সাধক ভক্তের চিত্তে। সেইরূপ রসও একটিমাত্র, ভক্তিরস, কৃষ্ণরতি যখন বিভাবাদির দ্বারা রস রূপে পরিণত হয় তখন ভক্তকর্তৃক আস্বাদিত হয়।[৬৭] বৈষ্ণব মতে "রস-শব্দের দুইটি অর্থ—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য তাহা রস—যেমন মধু, এবং যাহা আস্বাদক তাহাও রস—যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে ব্রহ্ম যখন রস তখন তিনি আস্বাদ্যও বটে এবং আস্বাদকও বটে। আস্বাদ্য রস রূপে তিনি পরম রসিক—রসিক, শেখর।"[৬৮] কৃষ্ণই পরম রসিক।

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।"[৬৯]

তিনি আস্বাদন করেন স্বীয় রূপগুণলীলাদি মাধুর্য এবং ভক্তের প্রেমভক্তির প্রাচুর্য। কৃষ্ণ যে রস আস্বাদন করেন সেটা নিশ্চয়ই ভক্তিরস নয়, কিন্তু তার কোনও নাম জানা নাই। ভাগবতে একজায়গায়[৬৯ক] বলা হয়েছে "ভগবান ভক্তভক্তিমান", ভক্তবৎসল অর্থে। দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের "ভবানীভর্তা" শব্দে চৈতন্য যে দোষ দেখেছিলেন, "ভক্ত-ভক্তিমান"— এও সেই দোষ বর্তমান, বোধ হয় সেই কারণেই শব্দটির প্রসার হয় নি। এই রস কোন্ স্থায়িভাব থেকে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তার কোনও ব্যাখ্যা নাই, অথচ বলা হয়েছে ভক্তি ছাড়া রস নাই।

ভরত বলেছেন বিভাব অনুভাব ব্যভিচারির সংযোগে রস-উৎপত্তি হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাবের মিলনে রস-উৎপত্তি হয়।[৭০]

ভাব ও রসের পার্থক্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ম্ম যশ্চমৎকারকারভূঃ
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ
ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা

ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে।"[৭১]
(বিভাব ব্যভিচারি ভাব প্রভৃতির) ভাবনাপথ অতিক্রম ক'রে সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যা চমৎকারাতিশয়রূপে অধিক আস্বাদিত হয় তাকে বলে রস। অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কর্তৃক (বিভাব ব্যভিচারি প্রভৃতির) ভাবনাযোগ্য চিত্তে গাঢ় সংস্কার দ্বারা যা ভাবিত হয় তাকে ভাব বলে। এই উক্তিতে কিছুই বিশদ হয় নি, শুধুই এইটুকু আভাসিত হয়েছে যে ভাবের অবস্থায় ভাবনার স্থান আছে, রস-আস্বাদনের ক্ষেত্রে তা নাই। মনে হয় এখানে ভাবনা ইমোশন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কর্যোৎপত্তির মূলে থাকে ইমোশন্, ভাবের ক্ষেত্রে কার্যের প্রেরণা আছে রসের ক্ষেত্রে নাই। এমন অর্থও হতে পারে যে রস যে-কোনও সহৃদয় আস্বাদন করতে পারেন, ভক্ত না হ'লেও ভক্তিরসের উৎকর্ষ অনপেক্ষভাবে উপভোগ করতে পারেন, কিন্তু ভাব উৎপন্ন হয় সেইখানেই যেখানে পূর্বসংস্কার আছে, অতএব শুধু ভক্তই ভক্তিসাহিত্যের ভাবে তন্ময়রূপে বিভাবিত হ'তে পারেন।

প্রাকৃত রসশাস্ত্রে রসোৎপত্তিকে অলৌকিক বলা হয়েছে। জীব গোস্বামী এ সম্বন্ধে বলেন[৭২] এই অলৌকিকত্ব সম্ভব হয় শুধু কৃষ্ণরতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃত কাব্যে যেটা হয় সেটা স্বাভাবিক নয়, কবিকৌশল হেতু প্রতীয়মান হয় মাত্র। কবিকর্ণপূর বলেন[৭৩] "এষ রসঃ প্রাকৃতো লৌকিকো মালতীমাধবাদিনিষ্ঠঃ অপ্রাকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠঃ।" প্রাকৃত রস লৌকিক মালতীমাধবাদির মতন, অপ্রাকৃত রস কৃষ্ণরাধাদিবিষয়ক। দেখা যাচ্ছে, ক্লাসিক আলঙ্কারিকরা যে যুক্তিতে অলৌকিকত্ব নিরূপণ করেছেন এখানে তা বর্জিত, এখানে লৌকিক সাহিত্যে ও দেবতাবিষয়ক সাহিত্যে ভেদরেখা টানা হয়েছে। জীব গোস্বামী একটি মর্মনিহিত পরম সত্য বলেছেন যে কাব্যরসসিদ্ধি হয় কবিকৌশলে। চমৎকারিত্বই কাব্যের প্রাণ এবং রসের শ্রেষ্ঠ উপকরণ এবং এই চমৎকারিত্ব সম্ভব হয় কবিকৌশলে। সাধারণ ভাবে বলা যায় এই প্রাণিধান প্রযোজ্য কি লৌকিক কাব্যে কি বৈষ্ণব কাব্যে।

রসোদয় কোন জনে হয় এ নিয়ে রসশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে আমরা দেখেছি, কিন্তু এ দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ নিরসন ক'রে গৌড়ীয় আচার্যরা বলেন যে ভগবদবিষয়ক রচনায় নাটকীয় চরিত্র (অনুকার্য), নট (অনুকর্তা) এবং সামাজিক—এদের সকলের মধ্যেই রসোৎপত্তি হতে পারে[৭৪] অর্থাৎ কৃষ্ণ, তাঁর নিত্যপরিকর এবং পার্থিব ভক্ত সকলেই রসের পাত্র। অবশ্য অনুকার্যে রস মুখ্যবৃত্তি এবং অনুকর্তায় রস গৌণবৃত্তি হতে পারে। এবং নট সামাজিক সকলেরই ভক্ত হওয়া প্রয়োজন।

এই রসতত্ত্বের সঙ্গে ভোজবর্ণিত রসতত্ত্বের অসামান্য সাদৃশ্য আছে, ভোজের মতে রস একটাই এবং রসের পাত্র কবি দর্শক-পাঠক, নট, নাটকীয় চরিত্র সকলেই।[৭৪ক] এঁরা সকলেই রসিক হতে পারেন।

ভোজ "সহৃদয়" শব্দ ব্যবহার করেন নি, যেমন করেন নি বৈষ্ণব আলঙ্কারিকরা। যিনি যথার্থ রসিক তিনি পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফলেই রস-আস্বাদন শক্তি পেয়েছেন, যেমন ভক্তির উদয় পূর্বজন্মের সুকৃতিতে হয়। এ সব তত্ত্বই বৈষ্ণব রসতত্ত্বে স্বীকৃত।

রতির কারণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদি।[৭৫] ভক্তের রতি একমাত্র কৃষ্ণরতি সুতরাং কৃষ্ণই ভক্তের রতির কারণ; অতএব কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তের রতির কারণ নয় শুধুই কৃষ্ণের রতির কারণ, কৃষ্ণ এখানে রসভোক্তা।

## মুখ্য ও গৌণ রস

ভক্তি একমাত্র রস এবং কৃষ্ণরতি একমাত্র স্থায়িভাব হলেও এদের বিভাগ আছে, পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস আর তার সংসর্গিত পাঁচটি মুখ্য রতি—

রস—শান্ত, দাস্য বা প্রীতিভক্তি, সখ্য বা প্রেয়োভক্তি, বাৎসল্য, মধুর বা উজ্জ্বল[৭৬]

রতি বা স্থায়িভাব—শান্তি বা শুদ্ধা, দাস্য, সখ্য বা মৈত্রী, বাৎসল্য, মধুরা বা প্রিয়তা।

এ ছাড়া সাতটি গৌণ ভক্তিরস এবং সাতটি গৌণরতি আছে। গৌণরসের নাম—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।[৭৭] অতএব অলঙ্কারশাস্ত্রের নয়টি রসই পাওয়া গেল যার মধ্যে দুটি মুখ্য। মুখ্যরস, গৌণরস সবই ভক্তিরস, মুখ্য এবং গৌণ রতির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক নইলে রস হয় না, ভগবৎ-প্রীতি-সম্বন্ধহীন হ'লে কোনওটি রসস্বরূপ হয় না। সাতটি গৌণরতি সাময়িকী "অনিয়তধারা"[৭৮] অর্থাৎ সর্বদা থাকে না, কদাচিৎ উদ্ভূত ও বিলীন হয়, অতএব এদের সঞ্চারী ভাব বলাই সঙ্গত।[৭৯] গৌণরতি মুখ্যরতির আশ্রিত, কোনও একটি মুখ্যরতিকে অবলম্বন না ক'রে উদিত হয় না।[৮০] শান্তরতি শমপ্রধান ব্যক্তিদের, যাঁরা বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ ক'রে আত্মানন্দে অবস্থান করেন, যাঁদের কৃষ্ণ-বিষয়ে পরমাত্মা-জ্ঞান ঐশ্বর্যজ্ঞান আছে যা মমতাবোধ-বর্জিত, যেমন তাপস ও মুনিগণের।[৮১] দাস্য রতিতে ভক্ত নিজেকে কৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন বলে মনে করেন, কৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য ব'লে অভিমান জন্মায়, কৃষ্ণের প্রতি আরাধ্য ভাব থাকে।[৮২] পুত্র কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার কৃষ্ণের প্রতি যে রতি তাকে গৌরবপ্রীতি বলে এবং এটি দাস্যরতির অন্তর্গত।[৮৩] কিন্তু জীব গোস্বামী একে বলেন প্রশ্রয়-ভক্তি।[৮৩ক] শান্তরতিতে হয় ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব বা সাক্ষাৎকার, আর দাস্যরতিতে ভগবৎ স্বরূপের দাস্যভাবে সেবার কল্পনা। যাঁদের মধ্যে এই ভাব জন্মায় যে তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে সমান, যাঁদের মধ্যে

পরস্পরে বিশ্রম্ভ বা গাঢ় বিশ্বাস আছে, যেখানে ব্যবহারে কোনও সঙ্কোচ সম্ভ্রম থাকে না, থাকে শুধু মমতা পরিহাস ও হাস্যের সম্পর্ক, তাঁদের সখ্যরতি।[৮৪] বাৎসল্য রতিতে কৃষ্ণের প্রতি অনুগ্রহ, লালনভাব, আশীর্বাদ ও পূজাপ্রাপ্তির ভাব প্রকাশ পায়, কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাড়ন ভর্ৎসনাদি করা যায়, সম্ভ্রম ভাব থাকে না।[৮৫] কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকান্তাদের পরস্পর সম্ভোগের আদি কারণের নাম প্রিয়তা বা মধুরা রতি, এর প্রধান গুণ নিজ অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণের সেবা।[৮৬] এই পঞ্চবিধা রতি যে-ক্রমে কথিত হয়েছে সেটি উত্তোরত্তর উৎকর্ষের সূচক। শান্তরতি ঐশ্বর্যজ্ঞানময়ী বাকি চারটি মাধুর্যপ্রধান। বৈকুণ্ঠে শান্তরস ছাড়া আর কিছু নাই।

প্রশ্রয় ভক্তি ছাড়া জীব গোস্বামী আরও দুটি শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। কৃষ্ণকে আশ্রয়জ্ঞানে যে ভক্তি তাকে বলেছেন আশ্রয়-ভক্তি। সখ্যরসকে বলেছেন মৈত্রীময়রস। এই অভিজ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদীর প্রীতি ও ভক্তিকেও অন্তর্ভূক্ত করা যায়, যা সখ্যের মধ্যে করা যায় না।

এই কয়টি ভক্তিরস এমন যে একব্যক্তিতে একাধিক রস সহাবস্থান করতে পারে, যেমন যুধিষ্ঠিরে আশ্রয়ভক্তি ও বাৎসল্য উভয়ই আছে, ভীমের আছে আশ্রয়-ভক্তি, বাৎসল্য, সখ্য।[৮৭]

এইসকল রস ও রতির বিষয় কৃষ্ণ। করুণরসের বেলায় ভগবদ্ভক্তি-রহিত ব্যক্তিও করুণরসের বিষয় হন।[৮৮] দানবীর, দয়াবীর, ধর্মবীর—এঁরা বীররসের অন্তর্ভূক্ত।[৮৯] এই বিভাগ অনুচিত হলেও বৈষ্ণব তাত্ত্বিকের সঙ্গে ক্লাসিক আলঙ্কারিকের সাদৃশ্য দেখা যায়।[৯০] কৃষ্ণের প্রতি শত্রুতাবশতঃ যে ক্রোধ, যেমন শিশুপালের, সেটি রসের বিষয় হতে পারে না। বিরহ করুণ রসের অন্তর্গত নয়, উজ্জ্বল রসের।

## বিভাব

"অস্মিন্নালম্বনাঃ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্তস্য চ বল্লভাঃ"[৯১] এই (মধুর ভক্তিরসে) আলম্বন কৃষ্ণ এবং তাঁর প্রেয়সীগণ।

"উদ্দীপনা বিভাবা হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ
কথিতা গুণ-নাম-চরিত-মণ্ডন-সম্বন্ধিনস্তটস্থাশ্চ।"[৯২]

হরি এবং তদীয় প্রিয়বর্গের গুণ নাম চরিত্র ভূষণ সম্বন্ধীয় এবং তটস্থ বিষয় সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলা হয়। এ সব থেকে প্রতীতি হয় যে কৃষ্ণ যেরূপ রসের আলম্বন এবং তাঁর রূপগুণ যেমন কৃষ্ণপ্রেয়সীদের কৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেয়সীরাও আলম্বন এবং তাঁদের রূপগুণ কৃষ্ণের রতির উদ্দীপন। কৃষ্ণ এবং রাধার উভয়ের অনুরাগ আছে পরস্পরের প্রতি, প্রসঙ্গ যেখানে রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ সেখানে কৃষ্ণ রসের

আস্বাদক রাধা আস্বাদ্য। রাধার অনুরাগ প্রসঙ্গে তিনি আস্বাদক কৃষ্ণ অস্বাদ্য। সম্পর্কটা উভয়তঃ প্রযোজ্য। এখানে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের রতিকে সর্বস্ব মনে করা হয় নি, প্রাধান্য পেয়েছে নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধ, তাই রাধার রূপগুণ কৃষ্ণের গোপী-বিষয়িনী রতির উদ্দীপন হিসাবে সমান সম্মান পেয়েছে। পদকর্তারা এই ভাবটিকে রচনায় উজ্জীবিত রেখেছেন।

কৃষ্ণের রূপ গুণ লাবণ্য নাম বেণুবাদন নৃত্যগীত ইত্যাদি উদ্দীপন, এ সবের মধ্যে বংশীরবের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। রাধিকার বেলায় উদ্দীপন তাঁর বয়ঃসন্ধি, নবযৌবন, বেশভূষা ইত্যাদি। প্রকৃতি-সম্বন্ধিত উদ্দীপনের কথা অল্প, চন্দ্রিকা মেঘ বসন্ত শরৎ বায়ু প্রভৃতিকে বলা হয়েছে তটস্থ উদ্দীপন অর্থাৎ গৌণ।[৯৩]

লৌকিক সাহিত্যের বেলায় রস-উৎপত্তি ও রস-ভোগের পাত্র সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হ'য়ে গিয়েছে যে বিভাবের কারণে বা সহায়তায় ভাবোৎপত্তি হ'তে পারে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর এবং যেহেতু নট অনুকর্তা অতএব পরোক্ষ ভাবে নটের; রসোৎপত্তি হ'তে পারে সহৃদয়ের চিত্তে। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে যেহেতু সকলেই রসভোক্তা হ'তে পারেন, অথচ রস একটাই, সে কারণে কিছু বৈকল্য উপস্থিত হয়েছে। রূপ গোস্বামী বলেছেন রতি-আস্বাদনের হেতু বিভাব, এবং বিভাব দুই রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন।[৯৪] আলম্বন কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত উভয়েই—রত্যাদির বিষয় ও আধার রূপে[৯৫]; টীকাকার আধারকে বলেছেন আশ্রয়। শব্দগুলি নূতন হলেও লৌকিক রসশাস্ত্রের বিরোধী নয়, কিন্তু প্রকৃষ্ট অনুধাবনের অন্তরায় হয়েছে এই নির্ধারণ যে বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে রতি একটিই—কৃষ্ণরতি, এবং রস একটিই—ভক্তিরস[৯৬], অতএব আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ ভিন্ন কেউ হ'তে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণভক্ত ভক্তিরসের এবং ভাবের (=স্থায়িভাবের) উভয়েরই পাত্র অর্থাৎ তাঁর হৃদয়েই ভাবোদ্রেক এবং রসোদ্রেক হয়। এই ভাব এবং ভক্তি শুধু কৃষ্ণের প্রতি হ'তে পারে, রাধার প্রতি বা অন্য কোনও পরিকরের প্রতি কোনও জীবভক্তের রতি হ'তে পারে না, কারণ বলা হয়েছে যে রতি শুধু কৃষ্ণরতি, অন্য কারও প্রতি প্রযোজ্য নয়।

বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে সকলেই রসভোক্তা বা রসাস্বাদক হ'তে পারেন, কৃষ্ণও পারেন। জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন[৯৭] কৃষ্ণের সজাতীয় মহাভক্তবিশেষ আলম্বন। বলেন নি যে আশ্রয়-আলম্বন, অতএব মনে করা যেতে পারে এই ব্যক্তিবিশেষ রাধা এবং তিনি বিষয়-আলম্বন হ'তে পারেন। সারা বৈষ্ণব কাব্য জুড়ে এর সমর্থন মেলে, সেখানে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগের সঙ্গে সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রবল অনুরাগের ধারা। কৃষ্ণের এই প্রেমভাবের নাম কি? এটি কোন জাতীয় রতি? কৃষ্ণ যে রস আস্বাদন করেছেন সেটা নিশ্চয়ই ভক্তিরস নয়,

পরমদেবতা কৃষ্ণের পক্ষে ভক্তিরস আস্বাদন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ ভক্তের ভক্তিভাব দেখে হৃষ্ট তৃপ্ত হ'তে পারেন কিন্তু তাঁর চিত্তবৃত্তিকে ভক্তিভাব বলা যায় না। ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের এই ভাবকে কোথাও বা বলা হয়েছে শক্ত্যানন্দ কিন্তু রসশাস্ত্রের পরিভাষায় কোনও একটি রস বলাই সমীচীন। কিন্তু এ রসের কোনও নাম নাই, এ ভক্তিরস নয়; এ স্থায়িভাবের কোনও নাম নাই, এ কৃষ্ণরতি নয়।

পরিস্থিতি এই যে রাধা আলম্বন অর্থাৎ কৃষ্ণের ভাবোদয়ের বা রতি উদয়ের কারণ, অথচ তিনি শুধু আশ্রয়-আলম্বন অর্থাৎ ভাব বা রতি তাঁকে আশ্রয় ক'রে বর্তমান আছে, তাঁর দিকে প্রেষিত হচ্ছে না। তিনি রতি-উদয়ের কারণ শুধুই কৃষ্ণের পক্ষে, কোনও পরিকর ভক্ত বা জীব ভক্তের পক্ষে নয়। এই রতি থেকে যে রসের উদয় হয় সেটা কৃষ্ণের চিত্তে উদিত হয়, তার কোনও নাম নাই। গোস্বামীরা সাহিত্যকর্মের সূচীশিল্পে যেমন পারদর্শী তেমনিই তাকে বিশ্লেষণের শতবিভক্তিতে প্রত্যেকটি সূত্রে পৃথক করেছেন, কিন্তু তাঁরা এই ব্যত্যয়ে নজর দেন নি। জীব গোস্বামীর দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু তিনি কৌশলে দায়মুক্ত হয়েছেন এই ব'লে যে কান্তার পূর্বরাগ ভক্তিরস কিন্তু কান্তের পূর্বরাগ উদ্দীপন।[৯৮] এ ব্যবস্থা রসশাস্ত্রের দিক থেকে সুষম হয় নি। জীব গোস্বামী অন্যত্র বলেছেন "ভক্ত অনুকর্তায়ও ভগবৎ-বিষয়ক রসোদয় হইয়া থাকে।.........কিন্তু ভগবৎ-ভক্তি হইতে ভক্ত-বিষয়ক ভগবদ্-রস প্রায়ই উদিত হয় না, কারণ তাহা ভক্তিবিরোধী। তজ্জন্য ভগবদ্-রসের অনুকরণও করা হয় না।"[৯৮ক] রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রীতিরসের শুধু একটা নাম পাওয়া গেল ভগবদ্-রস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সুবৃহৎ রসশাস্ত্রে এর বেশী কোনও আলোচনা নাই।

এই ত্রুটি কাব্যের দিক থেকে যতই দুর্ব্যাখ্যেয় হোক না কেন, তত্ত্বের দিক থেকে ততটা দুর্জ্ঞেয় নয়। রাধা এবং অন্যান্য পরিকর ভক্ত কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক শক্তি ও শক্তিমানের সম্পর্ক, আর সমস্ত সম্পর্ক আভিমানিক। সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির সম্পর্কটাই প্রধান, আর সব গৌণ, অতএব কোনওটি যদি নামহীন হয় তা হলে ক্ষতি সামান্য। কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত যুক্ত হয়ে চৈতন্যরূপ মিলিতবিগ্রহ হ'লেন তখন কৃষ্ণের এ উদ্দেশ্য ছিল না যে নিজের প্রেমিকা রাধার চোখে জগৎ নিরীক্ষণ করেন, উদ্দেশ্য ছিল শুধু স্বমাধুর্য আস্বাদন এবং নিজের প্রতি রাধার প্রেম যে কি প্রকারের তার অনুভূতি লাভ। সুতরাং উদ্দেশ্যটি বিশ্ববোধের তাগিদে নয়, সমূহ আত্মকেন্দ্রিক। এই মিলিত-বিগ্রহ চৈতন্য কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান, সুতরাং এখানেও কৃষ্ণভক্তিরসের প্রাধান্য, রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমভাবের নিদর্শন নাই বললেই হয়।

## অনুভাব, সঞ্চারীভাব

অনুভাবের সংজ্ঞা নাট্যশাস্ত্রের অনুমত, "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ"[৯৯], অনুভাব চিত্তস্থ ভাবের অববোধক বা পরিচায়ক। অন্যরূপে বলা যায় চিত্তস্থ ভাব বা মানসিক উত্তেজনা-জনিত বহির্বিকারের নাম অনুভাব। কতকগুলি অনুভাব যেমন নৃত্য-গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য ইত্যাদি সাধারণ ভক্তে, দেখা যায়।[১০০] জৃম্ভা (হাইতোলা), অঙ্গমোটন (আড়ামোড়া ভাঙ্গা) ইত্যাদি শান্তভক্তিভাবের অনুভাব।[১০১] কৃষ্ণকান্তাদের অনুভাব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব প্রকরণে। সাত্ত্বিক ভাবকে (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়) অন্যান্য অনুভাব থেকে পৃথক মনে করা হয়। একস্থলে সাত্ত্বিক ভাবকে ভাব ব'লে স্বীকার করা হয় নি, ভাবের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে ৪১—৩৩টি ব্যভিচারিভাব এবং হাস্য প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাব, সাত্ত্বিক ভাবের নাম এখানে নাই।[১০২] কিন্তু অন্যত্র আটটি সাত্ত্বিক ভাব এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ভাবের সংখ্যা রাখা হয়েছে ৪৯।[১০৩] সাত্ত্বিক ভাবের নানাপ্রকার সুক্ষ্ম বিভাজন রূপ গোস্বামী করেছেন যথা ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত ইত্যাদি। "সাত্ত্বিক" ভাব সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন, কিন্তু বৈষ্ণবীয় মতে এই "সত্ত্ব" রজঃ-তমঃ-হীন গুণবিশেষ নয়, কৃষ্ণরতি দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে বলা হয় সত্ত্ব এবং এইরূপ চিত্ত-জনিত ভাব সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব যে স্বতঃস্ফূর্ত, বুদ্ধিযোগে বা চেষ্টার ফলে জনিত বা নিবারিত হ'তে পারে না সেটা স্বীকৃত।

সঞ্চারী বা ব্যভিচারি ভাবকে সমুদ্র তরঙ্গের সহিত তুলনা করা হয়েছে[১০৪], তরঙ্গ যেমন সমুদ্রে উৎপন্ন হয়ে তা'কে সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি ক'রে সমুদ্রেই লীন হয়ে যায়, ব্যভিচারী ভাব সেই রকম স্থায়িভাবকে বৃদ্ধি ক'রে তা'তেই বিলীন হ'য়ে যায়। প্রভেদ এই যে সমুদ্র সাময়িক ভাবে স্ফীত হয়, স্থায়িভাবের সমৃদ্ধি স্থায়ী হয়। অতএব এগুলি স্থায়িভাবেরই অনুষঙ্গ বা সহায়ক। উপমা যোগ্যতর হয় যদি ব্যভিচারি ভাবকে সঙ্গীতের সম্বাদী বা অনুবাদী স্বরের সহিত তুলনা করা হয়, এরা প্রধান না হ'য়েও বাদীস্বরকে সহায়তা ক'রে সঙ্গীত সম্পদ বৃদ্ধি করে।

অভিজাত অলঙ্কারশাস্ত্রের ৩৩টি ব্যভিচারিভাবের সবগুলিই স্বীকৃত; শুধু মধুর রসে উগ্রতা ও আলস্য ব্যতিরেকে আর সবগুলি গৃহীত হয়েছে।[১০৫] এই তালিকার পরেও রূপ গোস্বামী কিছু সংযোজন করেছেন যেমন ভাবসন্ধি—সজাতীয় কিম্বা দুটি ভাবের মিলন[১০৬], ভাবশাবল্য—এক ভাব দমন ক'রে অন্য ভাবের উৎপত্তি[১০৭], ইত্যাদি।

## রস-নিষ্পত্তি

অভিজাত আলঙ্কারিকরা যেমন ভক্তিরসকে রস ব'লে স্বীকার করেন না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ তথাকথিত প্রাকৃত কাব্যনাটকের রতি বা স্থায়িভাবের রস-সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না, একমাত্র ভগবৎ-বিষয়ক রতিই রস রূপে পরিণত হতে পারে। প্রাকৃত রসসম্ভোগ সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ-লব্ধ হ'লেও ভক্তিরসের যথার্থ আস্বাদন এমন চিত্তে সম্ভব নয়, সেজন্য চাই মায়িক-গুণ-রহিত চিত্ত। এমন চিত্তের দ্বারা আস্বাদনকেই এঁরা যথার্থ রসাস্বাদন ব'লে মনে করেন।

জীব গোস্বামী বলেছেন "তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম। তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি।"[১০৮] অতএব লৌকিক বিভাবাদিরও রসজনকত্ব বিশ্বাস করা যায় না। (উক্ত প্রক্রিয়ায় যদি কোনও) রস জন্মায় তা হ'লে সেটা বীভৎস রস—এইটাই সিদ্ধ হয়।

বৈষ্ণবাচার্যের রস-নিষ্পত্তির অবধারণা আলঙ্কারিকের বিপরীত। আলঙ্কারিকের মতে সহৃদয় নিস্পৃহ নির্বিকার চিত্তে রসভোগ করেন, তার ভাবাবেগ কর্মস্পৃহা নাই, এই নৈষ্কর্মেই তাঁর চিত্তপ্রসাদ। এই কারণে তাঁদের মতে ভক্তি রসের মধ্যে পরিগণিত নয় কারণ এখানে আছে স্পৃহা—হয় মুক্তির, নয় ভগবৎ—সাক্ষাৎকারের, নয় সেবার; এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির তীব্র আগ্রহ দুর্মর বাসনা থেকে জন্ম নেয় পূজা অর্চনা উপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক ভক্তিঅঙ্গ। বৈষ্ণবের কাছে এই কর্মপ্রেরণা, এই ভক্তিরূপী উৎসাহ, এই তীব্র ভাগবতী রতিই প্রকৃত রসের উৎস। নাট্যশাস্ত্র-অনুমোদিত বীর-রৌদ্র ইত্যাদি রস, যাদেরকে ভক্তি শাস্ত্রে গৌণ ভক্তিরস বলা হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রেও নির্বিকারত্ব নাই, কারণ এরাও মুখ্যভক্তিরসের অনুমোদক রূপে সক্রিয়।

যাঁরা কৃষ্ণপরিকর তাঁদের চিত্তে কৃষ্ণরতি নিত্য বিরাজিত এই তি ভক্তিরসে পরিণত হ'য়ে সেবা বাসনা জাগায়। মরদেহে এমন সেবা সম্ভব নয় তাই জাতরতি বা জাতপ্রেম সাধক ভক্ত অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলার আনুকূল্যে কৃষ্ণসেবা করছেন ব'লে চিন্তা করেন, সে ক্ষেত্রেও রসাস্বাদন সম্ভব।

ভক্তি-সম্পর্কিত এবং ভক্তি-বর্হির্ভূত দুটি ক্ষেত্রের রসাস্বাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে তথাকথিত প্রাকৃত অর্থাৎ ভক্তি-বহির্ভূত কাব্যনাট্যের বেলায় সামাজিকের কোনও সক্রিয় অংশ নাই, তিনি শুধুই নাটক প্রত্যক্ষ ক'রে বা কাব্যপাঠ ক'রে তা থেকে রস লাভ করেন। বৈষ্ণব ভক্তের বেলায় নাটক দর্শন বা কাব্যপাঠ আবশ্যিক নয়, তিনি নিজের কল্পনা বলে কৃষ্ণলীলা মানসে প্রত্যক্ষ ক'রে তা'তে অংশ গ্রহণ করেন। সম্ভব হলে এই দেহেই লীলাপরিকর হতে তিনি চান। প্রাকৃত কাব্যনাটকের বেলায় সামাজিক যেকোনও রস

উপভোগ করতে পারেন কিন্তু ভক্তের বেলায় এ ক্ষমতা সীমায়িত, তিনি ভক্তিরস বিনা অন্য কিছু আস্বাদন করতে পারেন না।

যে রস অপর রসের ইষ্টও করে না অনিষ্টও করে না, তাকে বলা হয় অপর রসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন বা neutral রস। রস এবং ভাব অনুচিত বা অন্যায্য ভাবে প্রবৃত্ত হলে বলা হয় রসাভাস ও ভাবাভাস।[১০৯] আপাততঃ রস রূপে প্রতীয়মান হলেও রসের লক্ষণে যাচাই করলে যদি বিকল বা হীন প্রতিপন্ন হয় তা হ'লে রসাভাস হয়।[১১০] স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির বিরোধ বা বিরূপতা হ'লে রসত্ব সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যে অযোগ্য অন্য রসের সম্মিলনে বা অনুচিত বিভাবাদির প্রভাবে রস-আস্বাদনের যে ব্যাঘাত জন্মায় তাকে রসাভাস বলে।

## অলৌকিকত্ব

যাঁরা ভক্তি-বর্হির্ভূত বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের উপাদান প্রাকৃত হলেও তা থেকে রসাস্বাদনকে তাঁরা অলৌকিক বলেন, আমরা দেখেছি। কয়েকটি চরিত্রের সহাবস্থানে, ঘটনার ঔদ্দেশিক সমাবেশে, সংলাপের কুশলতায়, অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে লেখক আপন অনুভূতি অপরে সঞ্চারিত করেন, কিন্তু যে উপায়ে করেন সেটি অবিশ্লেষণীয় অসংবেদ্য, এবং সে কারণে অলৌকিক। যে পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য দেশকালের সুদূর বাধা অতিক্রম ক'রে শুষ্ক ভাষার সাহায্যে অন্য এক ব্যক্তির সংবেদনশীল মনোভাবের সামিল হয় সে পদ্ধতি ব্যাখ্যার অতীত, শিক্ষার অনায়ত্ত বলেই অলৌকিক। মনে হয় এখানে অলৌকিক বা লোকোত্তর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে যে লোকব্যাখাত বা সর্বলোকায়ত্ত নয়।

কিন্তু ভক্তিবাদীর কাছে কৃষ্ণলীলা মর্ত্যে ঘটলেও অলৌকিক, ভক্তের মনে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ-জনিত অতএব অপ্রাকৃত, ভক্তিরস এবং রসাস্বাদন-প্রক্রিয়া অবশ্যই অলৌকিক। যে বৃত্তান্ত অবলম্বনে বৈষ্ণবের তত্ত্ব ও কাব্য রচিত সেটি কৃষ্ণের দেবলীলা নয় নরলীলা-সংক্রান্ত, তা'তে অতিবল প্রভৃতি যা-কিছু অপার্থিব গুণ কৃষ্ণের আছে সেসব ঐশ্বর্যের ভাবনা ভক্তের নয়, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিস্মৃত হয়ে মাধুর্যের দিকটাই দেখবার অনুজ্ঞা আছে ভক্তের প্রতি। অতএব অলৌকিকত্বের প্রবেশপথ বন্ধ, কিন্তু এই মাধুর্যের প্রভাবেও বন্য পশু শান্ত হয়, যমুনার জল স্তব্ধ হয়, দেবতারা স্বর্গ হ'তে লীলা দেখেন। তবে ভক্তজন এসবকে অলৌকিক বললেও অভাজন আমরা কাব্যের অতিশয়োক্তি বলে থাকি। কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ লৌকিক লীলা বলেই প্রতিভাত হয়।

লোকোত্তর ভাব যদি কিছু থাকে সেটা তাঁর লীলায় নাই আছে

কাব্যে। এবং কাব্যরসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলঙ্কারিক যা বলেছেন তা সাধারণ আখ্যানকাব্যে এবং ভক্তিকাব্যে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।
লোকোত্তরচমৎকার প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।"[১১১]

সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, অন্য জ্ঞেয় বিষয়ের স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদতুল্য অলৌকিক বিস্ময়-স্বরূপ; কোনও কোনও প্রমতাগণের দ্বারা এই রস স্ব-শরীর হ'তে অভিন্ন রূপে আস্বাদিত হয়। অর্থাৎ রসের প্রসুতি নিজের মধ্যেই বুঝতে হবে। চমৎকার অর্থে চিত্তের বিস্ফার বা বিস্তার, যার ফলে অনির্বচনীয় অনুভুতি সম্ভব হয়।

ঈশ্বর-ভক্তির গোচর নিদর্শনের মধ্যে যদি সমর্পিত হৃদয়-নিবেদন শ্রেষ্ঠ হয় তা হ'লে বৈষ্ণবকবির অঙ্কিত রাধার একনিষ্ঠ আত্মদানের অপ্রতিম চিত্রে ভক্তির শ্রেষ্ঠ আর্বিভাব ঘটেছে। ভাবের যথাযথ রূপায়ণ ও সম্যক পরিস্ফুটন যদি উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের একটি নির্ণায়ক বস্তু হয় তা হ'লে বৈষ্ণব কবিতার গাঢ়তম ও নিখাদ ভাবব্যক্তি এই সাহিত্যকে গৌরব-চিহ্নিত করে। অলৌকিকত্ব কৃষ্ণলীলায় নাই, আছে বৈষ্ণব পদাবলীতে।

"নাগরী করল তাহে ঘনরস দান
রাধামোহন-পহুঁ অমিয় সিনান।"

নাগরী নাগরকে যে আনন্দদান করলেন সেটা লোকবোধ্য, সে কারণে পার্থিব, রাধামোহন প্রভৃতি কবিরা আমাদেরকে যে রসামৃতে স্নাপিত করলেন তার প্রক্রিয়া আমাদের বুদ্ধির অতীত ব'লে অলৌকিক।

## রস-শাস্ত্র-গ্রন্থ

সখ্য বাৎসল্যাদি রসের পোষক ভাব-অভিব্যক্তির মধ্যে বহুপ্রকারের বিভাজন আছে, এটি আমাদের চিরন্তন প্রবণতা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপ গোস্বামী এই সব উপবিভাগের বর্ণনা করেছেন, দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অনুভাব, ব্যাভিচারি ভাব, উদ্দীপন প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা আছে এই গ্রন্থে। মধুর রসের রস-প্রকরণ-শাস্ত্র রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি। পণ্ডিতরা বলেন এমন আলোচনা ইতিপূর্বে রসশাস্ত্রের অন্য গ্রন্থে আছে যেমন রুদ্রভট্টের শৃঙ্গারতিলক, ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশ, সারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশ, সিংগভূপালের রসার্ণব সুধাকর, ভানু দত্তের রসমঞ্জরী ও রসতরঙ্গিনী। কিন্তু প্রভেদ এই যে এই সব রচনাগুলির উপজীব্য নর-নারীর প্রেম আর রূপ গোস্বামীর বর্ণন-বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম,

"মধুরাখ্যো ভক্তিরসঃ" ।[১১২] সখ্য, বাৎসল্যাদির আলোচনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ছাড়া আর কোথাও নাই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে সমগ্র রস-প্রকরণ বর্ণিত ব্যঞ্জিত হয়েছে মানবিক প্রেমের ভাষায় যদিও শৃঙ্গার এখানে সীমায়িত কৃষ্ণ ও তাঁর প্রেমিকাদের মধ্যে, সহৃদয়ের স্থান নিয়েছেন ভক্ত, রস গ্রহণ করেন শুধুই ভক্ত নয় কৃষ্ণও, অর্থাৎ আখ্যানের নায়ক নিজে। যেহেতু রসের প্রকারভেদ নাই অতএব যে রস কৃষ্ণ-পরিকর আস্বাদন করেন সেই রসের আস্বাদন পান জীবভক্ত। কিন্তু জীবভক্ত প্রেমভক্তির বেশী অগ্রসর হতে পারেন না, আমরা পরে দেখব।

## নায়ক-নায়িকা

নায়ক কৃষ্ণ নিত্যকিশোর। উজ্জ্বলনীলমণি আরম্ভ হয়েছে নায়ক-ভেদ-প্রকরণ দিয়ে। নায়কের মুখ্য ভেদ চারটি—

(১) ধীরোদাত্ত—দৃঢ়ব্রত, গম্ভীরাশয়, বলবান, আত্মশ্লাঘাশূন্য।
(২) ধীরোদ্ধত—রোষপূর্ণ, অহঙ্কারী, মাৎসর্যপূর্ণ, আত্মশ্লাঘী।
(৩) ধীরশান্ত—বিনয়ী, বিবেচক, ক্লেশসহিষ্ণু, শান্তপ্রকৃতি।
(৪) ধীরললিত—প্রেয়সীর বশ, বিদগ্ধ, পরিহাসপটু।

এগুলি নায়ক চরিত্রের সাধারণ লক্ষণগত বা গুণকর্মগত ভেদ। নায়িকার প্রতি তাঁর মনোভাবের নিরিখে অন্য চার রকম ভেদ বর্ণিত হয়েছে—

(১) অনুকূল নায়ক—এক নায়িকাকে আশ্রয়কারী। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের প্রতি এই সংজ্ঞার্থের প্রয়োগ উপযুক্ত মনে করেছেন এই ব'লে যে কৃষ্ণ যখন রাধাকে দর্শন করেন তখন অন্য নায়িকাসঙ্গের কথা তাঁর স্মৃতিতে থাকে না।[১১৩] এমন অর্থবিস্তারের ফলে প্রায় সকলেই অনুকূল নায়ক হতে পারেন।

(২) দক্ষিণ নায়ক—অন্য নারীতে আসক্ত হয়েও পূর্ব নায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম, দাক্ষিণ্য ত্যাগ করেন না, অথবা অনেক নায়িকা থাকলেও যিনি তাঁদের সকলের প্রতি সমান ভাব পোষণ করেন।[১১৪]

(৩) শঠ নায়ক—নায়িকার সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলেন, অন্যত্র ভীষণ অপ্রিয় কার্য করেন এবং নিগূঢ় অপরাধ করেন।[১১৫]

(৪) ধৃষ্ট নায়ক—অন্য নারীর ভোগচিহ্ন অভিব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও যিনি নির্ভয় এবং যিনি মিথ্যাকথনে দক্ষতা প্রকাশ করেন।[১১৬]

কবি-আলঙ্কারিকের খুশীমত বিভাজন কত সূক্ষ্ম ও কৃত্রিম হ'তে পারে তার নিদর্শন ঃ "প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার – ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত, ইহারা প্রত্যেকে পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ ভেদে দ্বাদশভেদ; ইহারা আবার পতি ও উপপতি ভেদে ২৪ প্রকার হয়। তাহারাও পুনঃ প্রত্যেকে অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট ও শঠ ভেদে

সাকল্যে ৯৬ প্রকার নায়ক হয়" ।[১১৭] প্রধান বিভাগগুলির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সবগুলিই কৃষ্ণ, মনে হয় ৯৬ প্রকার নায়কের দৃষ্টান্ত নিত্যকিশোর কৃষ্ণ হ'তে পারেন, ধৃষ্ট, শঠ, মিথ্যাবাক্যে দক্ষ, অপ্রিয় কার্যকারী সবসমেত। ভক্তের মনোরঞ্জনের জন্য কৃষ্ণকে বহু রূপ ধারণ করতে হয়েছে।

নায়িকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে বয়স স্বভাব লজ্জা মান বিলাসেচ্ছা প্রভৃতি ভেদে; তিন শ্রেণীর নায়িকা চিহ্নিত হয়েছে—

(১) মুগ্ধা নায়িকার নবীন বয়স, নবজাগ্রত কামভাব সত্ত্বেও রতিবিষয়ে বামতা, প্রিয়ের প্রতি অপ্রিয় ভাষে অশক্তি, মানে অপটুতা, অতিশয় সলজ্জতা ।[১১৮]

(২) মধ্যা নায়িকার লজ্জা এবং মদন ভাব সমান, প্রকাশমান তারুণ্যের জন্য গর্ব, কিঞ্চিত প্রগল্‌ভতা, মান বিষয়ে কখনও কোমলতা কখনও কর্কশতার প্রকাশ ।[১১৯] রস-প্রকরণে মধ্যা নায়িকার উৎকর্ষ বিবেচিত হয়।

(৩) প্রগল্‌ভা নায়িকার পূর্ণ তারুণ্য, সম্ভোগে ঔৎসুক্য, ভাবপ্রকাশে পটুতা, চেষ্টা ও ভক্তিতে অতি-সামর্থ্য, মানে কর্কশভাষিতা ।[১২০]

মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা নায়িকার ত্রিবিধ ভেদ বিহিত হয়েছে মানের মানদন্ডে, আমাদের শাস্ত্রে প্রেমকলহ এতটা মান্যতা পায়—

(১) ধীরা—যে মধ্যা নায়িকা অপরাধকারী প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি সহকারে উপহাস বাক্য বলেন ।[১২১] যে প্রগল্‌ভা নায়িকা সম্ভোগ বিষয়ে ঔদাসিন্য এবং কপটতা পূর্বক নায়কের প্রতি আদর দেখান ।[১২২]

(২) অধীরা—যিনি সরোষে পরুষবাক্যে নায়ককে নিরসন করেন[১২৩] বা তাড়না করেন ।[১২৪]

(৩) ধীরাধীরা—যিনি অশ্রুপাত করেন এবং প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন। ইনি ধীরা ও অধীরার মধ্যবর্তী রূপ ।[১২৫]

স্বীয়া এবং পরকীয়া ভেদে নায়িকা দ্বিবিধ। "কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধামতাঃ"[১২৬], পরকীয়া দুই রকমের কন্যকা ও পরোঢ়া। অর্থাৎ বিবাহ সম্বন্ধ না থাকলেই পরকীয়া।

কান্তারতি ত্রিবিধ, অবশ্য সব রতিই কৃষ্ণের প্রতি—

(১) সাধারণী—অতিশয় গাঢ় নয়, কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনে উদ্ভব হয়, মূল কারণ সম্ভোগেচ্ছা[১২৭], উদাহরণ কুব্জা

(২) সমঞ্জসা—গাঢ়রতি, কৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণ হ'তে আর্বিভূত হয়, কৃচিৎ সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, এই রতি পতি-পত্নী-সম্বন্ধ-নিরূপিত ।[১২৮] কখনও কখনও কৃষ্ণ-সুখেচ্ছার আনুগত্য-জনিত প্রেম-স্বসুখবাসনা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়, সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতি হ'তে পৃথক রূপে অবস্থান করে। কিন্তু সাধারণতঃ এই শ্রেণীর রমণীর পক্ষে

কৃষ্ণসুখবাসনা এবং সম্ভোগেচ্ছার সামঞ্জস্য আছে ব'ল একে সমঞ্জসা রতি বলা হয়। উদাহরণ রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষী।

(৩) সমর্থা—গাঢ়তম, সর্ববিস্মারণকারী, স্বতঃই কিম্বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ বিষয় হ'তে উৎপন্ন, ইহাতে কিঞ্চিত বিশেষ প্রকারের সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতির সহিত সম্মিলিত হয়।[১২৯] রমণীর সম্ভোগেচ্ছা থাকলেও কৃষ্ণরতির সহিত সর্বতোভাবে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় ব'লে সেটি পৃথক ভাবে প্রতীত হয় না, সমস্তই কৃষ্ণসুখার্থে সাধিত হয়ে থাকে। প্রেমের জন্য রমণী কুলধর্মাদি সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। ভগবানকে বশীভূত করতে সমর্থ হয় ব'লে একে সমর্থা রতি বলা হয়। উদাহরণ—ব্রজগোপী।

সাধারণী রতি প্রেম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সমঞ্জসা অনুরাগ পর্যন্ত, সমর্থা রতি ভাবের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে পারে।[১৩০]

নায়িকার বিবিধ বিভাজনের গুণ-মিশ্রণে ৩৬০ প্রকার নায়িকা সম্ভব হ'তে পারে। এবং কৃষ্ণের বেলাতেও যেমন, একা রাধিকাই ৩৬০ অবস্থায় বিদ্যমান হ'তে পারেন।[১৩১]

## কাম ও প্রেম

অভিজাত (classical) সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কামকে অন্তর্ভুক্ত করতে কবিদের বাধে নি, নায়ক-নায়িকার বিরহ-বেদনাকে সর্বত্র মদনের শর কামজ্বালা প্রভৃতি বলা হয়েছে তা'তে প্রেমের মানহানি হয় নি। কারণ এঁরা বিদেহ প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন না, মনে করতেন দেহসম্ভোগ প্রেমের একটি অঙ্গ, সত্য প্রেম যেখানে আছে সেখানে সঙ্গমলিপ্সা দোষের নয়, পরন্তু স্বাভাবিক। ভাগবতে[১৩২] স্পষ্টভাবেই গোপীদের প্রেমকে কাম নামে অভিহিত করা হয়েছে, প্রেম ও কামের মধ্যে ভেদরেখা নিরূপিত হয় নি। রাসলীলার অন্তর্গত কামক্রীড়াকে ভাগবত অস্বীকার করেন নি তবে বলেছেন এর অনুধ্যানে কামভাব বিদূরিত হয়; কি প্রক্রিয়ায় এমনটি সম্ভব হয় তার কোনও ইঙ্গিত নাই, বোধ হয় ভক্তিরসের উৎসরণে তুচ্ছতার সব বিবর পূর্ণ হ'য়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। ভাগবতের অনুসরণে রচিত গ্রন্থে কৃষ্ণের আকর্ষণ-শক্তি শুধু কামের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এমন কি মাতামহী বৃদ্ধা পদ্মাবতীও কৃষ্ণের গোপবেশ দেখে কামপীড়িত হয়েছিলেন।[১৩৩] "কাম" কথাটির পূর্বানুক্রম হীনপর্যায়ভুক্ত মনে হওয়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যরা অভিনব ব্যাখ্যায় দোষহরণের চেষ্টা করেছেন। রূপ গোস্বামী কামের পবিত্রতর সংজ্ঞা দিয়েছেন—

"সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্
সদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ

ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজিতে
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্
তত্তৎ ক্রীড়া-নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।"১৩৪
"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।"১৩৫

কামরূপা ভক্তি তাকেই বলে যেখানে স্বীয় সম্ভোগতৃষ্ণার উদয়েও কেবল কৃষ্ণসুখের জন্যই উদ্যম দৃষ্ট হয়। এই (কামরূপা ভক্তি) ব্রজদেবীদের মধ্যেই সুপ্রসিদ্ধ ভাবে বিরাজমান্। এঁদের প্রেমবিশেষ কোনও মাধুরী প্রাপ্ত হয়ে সেই সেই ক্রীড়ার কারণ হয় ব'লে পণ্ডিতরা একে "কাম" শব্দে অভিহিত করেন। গোপরামাদের প্রেমকে কাম বলাই প্রথা। অর্থাৎ নামে "কাম" হ'লেও এতে সর্ব কর্মপ্রচেষ্টা কৃষ্ণসুখের জন্যই সাধিত, এই কামভাবে একটি বিশেষ মাধুরী আছে যা অন্য কোনও প্রেমে নাই। ইঙ্গিত এই যে কৃষ্ণপ্রেমের বেলায় "কাম" শব্দটির বিশেষার্থ আছে, যা অন্য কোনও প্রেমে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই বিশেষ সংজ্ঞা শুধু গোপীদের বেলাতেই খাটে, কৃষ্ণকে লম্পট-চূড়ামণি বলতে এঁদের বাধে নি, এমন কি এই বিশেষণে এঁদের গর্ববোধ হয়। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের সখাদের যে তালিকা দিয়েছেন তা'তে ভক্তিশাস্ত্রের চেয়ে কামশাস্ত্রের আনুগত্যই অধিক মনে হয়, চেট্ বিট্ বিদূষক পীঠমর্দ প্রভৃতি বিবিধ কামকলাবিদ্ ধূর্তচরিত্র তাঁর সহচর। পদকর্তারা এঁদের নীরবে উপেক্ষা করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ভাগবতের মতে রাসলীলার অনুধ্যানে লোকের মন থেকে কামভাব দূরীভূত হয়১৩৬, রূপ গোস্বামীর মতে১৩৭ রাসলীলা দর্শন ক'রে দেববধূদের মদনাবেশ হয়েছিল। দেবীরাও যে-রিপু দমন করতে অসমর্থ, সামান্য মানুষের বেলায় আশা করা হয়েছে সে রিপু স্বতঃই নির্জিত হবে।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে গোকুল কামবীজমন্ত্রসঙ্গত১৩৮, কৃষ্ণপ্রেয়সী রমা কামবীজ পরাশক্তি।১৩৯

কৃষ্ণদাস কবিরাজও গোপীপ্রেমের বেলায় কামকে প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন—

"সহজ গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম।"১৪০

উদ্দেশ্যার্থ এই যে কাম-ক্রীড়ার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে ব'লে গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ গোপীপ্রেম স্বরূপতঃ কাম নয়। এই প্রেম স্বার্থলেশহীন, অতএব কাম নামে অভিহিত হ'লেও একে প্রেম বলাই সঙ্গত।

পদকর্তাদের এমন বিভাজন-স্পৃহা নাই, তাঁরা তাত্ত্বিকদের অনুসরণ না ক'রে কবি-প্রসিদ্ধির বশবর্তী হ'য়ে মিলনের আত্যন্তিক স্পৃহাকে কন্দর্প-বিকার রূপেই বর্ণনা করেছেন।

## ভাগবতী প্রীতি

ভাগবতী প্রীতির ক্রমিক বিবর্তন স্তর এই রকম—রতি বা ভাব, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ( ও মহাভাব )। রতি বা ভাবকে "প্রীত্যঙ্কুর"ও বলা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাব ও মহাভাবকে পৃথক ধ'রে নয়টি স্তর সাব্যস্ত করেছেন[১৪১], অথচ উভয়ের ভেদরেখা নির্ণয় করেন নি। কিন্তু রূপ গোস্বামী উভয়কে এক ধ'রে মোট আটটি স্তর মেনেছেন।[১৪২]

প্রাচীন বিধানকর্তারা অত্যন্ত বিভাগপটু ছিলেন, ক্ষুরধার বিভাজনে সকল বিষয়কে শতখণ্ডিত করেছেন, নির্ধারণগুলি বিভাগে-উপবিভাগে লাঞ্ছিত, আধুনিক রসগ্রাহীর চোখে এর সার্থকতা সীমায়িত। বিশেষণের প্রকোষ্ঠ-বদ্ধতার চেয়ে ক্রিয়ার বহুরূপী বিশেষ্যের প্রতি আজ আমাদের অনুরাগ বেশী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যরাও শ্রেণী-বিভাগ-স্পৃহায় কারও চেয়ে উন্ নন্, কিন্তু রতি, ভাব ও প্রেম এই শব্দগুলিকে একাধিক অর্থে বা পর্যায়ে ব্যবহার ক'রে বোধ-দুরূহতা সৃষ্টি করেছেন, নূতন শব্দ ব্যবহার করলে যা হবার সম্ভাবনা ছিল না। সাধারণতঃ এ তিনটি শব্দ প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন শান্তরতি, দাস্যভাব, কান্তাপ্রেম। আবার পারিভাষিক অর্থে রতি কৃষ্ণপ্রীতির আবির্ভাবের প্রথম স্তর বা "প্রেমাঙ্কুর", এবং রসের স্থায়িভাব। ভাব কৃষ্ণপ্রীতির আবির্ভাব বুঝায় ( =রতি ), তা ছাড়া অনুরাগের পরবর্তী এক উন্নত স্তর বুঝায়। ভাবের একটি তৃতীয় রূপ আছে, "হাব ভাব হেলা" এই ত্রয়ী অনুভাবের একটি হ'ল ভাব। প্রেম বিশেষ অর্থে প্রীতিক্রমের দ্বিতীয় স্তর বুঝায়। আচার্যদের সূক্ষ্মদর্শিতা যে পরিমাণে ছিল অনর্থ-সম্ভাবনার দূরদর্শিতা তেমন ছিল না।

রস-শাস্ত্রের আদর্শে বিচার করতে হ'লে—যে আদর্শ বৈষ্ণব রসবেত্তারা মেনেছেন—উপরোক্ত ভাব ও প্রেম থেকে আরম্ভ ক'রে মহাভাব পর্যন্ত স্তরগুলিকে স্থায়িভাব কৃষ্ণরতির উপবিভাগ না মনে ক'রে উপায় নাই, এই স্তরের যেকোনওটি থেকে রসোৎপত্তি হ'তে পারে, অবশ্য ভক্তিরসের উৎপত্তি।

যে লক্ষণ বস্তুতে সর্বদা অবস্থিত থাকে এবং যা দিয়ে বস্তুর উপাদান এবং তাত্ত্বিক রূপ জানা যায় তাকে বলে স্বরূপ লক্ষণ, এই লক্ষণ বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে।[১৪৩] ভাগবতী প্রীতির এবং তার সব কয়টি বিভাগের স্বরূপলক্ষণ এই : এরা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি ( প্রকৃতি ) এবং এদের মধ্যে থাকে ভগবানের প্রীতিবিধানের বাসনা ( আকৃতি )। যে লক্ষণ সদা বর্তমান থাকলেও শুধু প্রভাব ও কার্য দ্বারা জানা যায় সেটিকে বলে তটস্থ লক্ষণ বা বহির্লক্ষণ। ভাগবতী-প্রীতির আবির্ভাবের তটস্থ লক্ষণ দেওয়া হয়েছে

ভাগবতে ।[১৪৪] বিভিন্ন ক্রমের তটস্থ লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্, নীচে কিছু তটস্থ লক্ষণ এবং ক্রমগুলির বোধার্থ সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হ'ল ।

(১) রতি বা ভাব—কৃষ্ণমাধুর্যের অনুভব হেতু উল্লাসের আধিক্য, একমাত্র ভগবানেই তাৎপর্য অন্য সকল বস্তুতে তুচ্ছজ্ঞান, মানশূন্যতা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ অতি অল্পমাত্র সময়ও বৃথা ব্যয়িত না করা, নাম গানে ও লীলা শ্রবণে রুচি ইত্যাদি এর চিহ্ন ।[১৪৫]

(২) প্রেম—সাধকের চিত্ত সম্যকরূপে মসৃণ, প্রীতি-আদির হ্রাস-শঙ্কা-রহিত হ'য়ে বদ্ধমূল এবং কৃষ্ণবিষয়ে অতিশয় মমতাসম্পন্ন । ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় না ।[১৪৬] যার মনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে তার বাক্য ও আচরণের মর্ম বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বুঝতে পারেন না, পারেন শুধু ভক্তিরসের মর্মজ্ঞ ।[১৪৭]

(৩) স্নেহ—প্রেমের পরাকাষ্ঠা বশতঃ চিত্ত দ্রবীভূত, বিচ্ছেদ—অসহিষ্ণু এবং প্রেমোপলব্ধির কারণে উজ্জ্বল; এ অবস্থায় দর্শনাদির দ্বারা লালসা পরিতৃপ্ত হয় না ।[১৪৮]

(৪) মান—নূতন মাধুর্যের অনুভব এবং তৎসহ কৌটিল্য । এই কৌটিল্য বা বক্র ব্যবহার শুধু বাহিরে, ভিতরে দাক্ষিণ্যের অভাব নাই ।[১৪৯]

(৫) প্রণয়—প্রধান লক্ষণ বিশ্রম্ভ অর্থাৎ প্রিয়ের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস ।[১৫০] অভেদমননের ফলে সঙ্কোচের অভাব হয় । স্পষ্টতঃ সম্ভ্রমের প্রাপ্তি-যোগ্যতা থাকলেও যেখানে সম্ভ্রমের লেশ থাকে না এমন রতিকে প্রণয় বলে ।[১৫১]

(৬) রাগ—অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ । প্রণয়োৎকর্ষবশতঃ অতিশয় দুঃখও কৃষ্ণসম্বন্ধ হেতু সুখ রূপে চিত্তে অনুভূত হয় এবং প্রাণব্যয়েও কৃষ্ণের প্রীতিসাধন করবার বাসনা তীব্রতর ভাবে থাকে ।[১৫২] অবশ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে দুঃখ বরণ করা যায় তা-ই সুখসম প্রতিভাত হয়, অন্য দুঃখ নয় । রাগের মূল অর্থ আশ্রয় ক'রে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং মঞ্জিষ্ঠা রাগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়েছে, এ পাকা রং কিছুতেই ছাড়ে না ।

(৭) অনুরাগ—যে রাগ নবনবায়মান হ'য়ে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায় ।[১৫৩] এতে প্রেমতৃষ্ণা কখনও উপশম হয় না বরং ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । এর অন্য লক্ষণ পরস্পরের বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহেও কৃষ্ণস্ফূর্তি অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন ।[১৫৪] বিদ্যাপতি বলেছেন "সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিয়ে নিতি যাহা নূতন হোয় ।" অনুরাগ ত্রিবিধ—রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও অভিসারানুরাগ ।

(৮) ভাব—

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্য-দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ।"[১৫৫]

অনুরাগ নিজের দ্বারা অনুভবিত ও প্রকাশিত হ'য়ে যা'কে আশ্রয় করে তা'কেই অনুরূপ অনুরক্ত করে, এমন অবস্থাকে ভাব বলা হয়। অর্থাৎ এটি প্রেমের প্রসরণশীল সংক্রামক অবস্থা, সর্ববিস্মৃত হ'য়ে নিজ অস্তিত্ব অবলুপ্ত ক'রে কৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ লীনতা। সংক্রামক বলা যায় এই জন্য যে নিকটবর্তী সকলকেই স্পর্শ করে।

(৯) মহাভাব—এই উন্মাদক অনুরাগ শুধু রাধা ও গোপীগণেই সম্ভব। তাঁরা বিধাতাকে নিন্দা করেছেন চক্ষুর পলক নির্মাণের জন্য, কেননা নিমেষপাতে কৃষ্ণদর্শনে বিঘ্ন জন্মে। তাঁরা কৃষ্ণের সম্মুখাবস্থাতেও দুঃখের আশঙ্কা ক'রে বিলাপ করেন। কৃষ্ণে আসক্তিবশতঃ তাঁরা স্বীয় দেহ, পরকাল ইহকাল সব বিস্মৃত হ'ন।[১৫৬] মহাভাবের প্রভাবে ব্রজনারীরা কৃষ্ণের সঙ্গে এমন তাদাত্ম্য বোধ করেন যে রাসলীলা কালে কৃষ্ণ অন্তর্ধান করলে তাঁরা কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করেছিলেন।[১৫৭] দীর্ঘকালের মিলন অল্পক্ষণ এবং অল্পক্ষণের মিলন দীর্ঘদিন ব'লে প্রতীয়মান হয়।

মহাভাব দুই প্রকার, মোদন ও মাদন। মোদন—রাধাকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল প্রকাশিত হয়।[১৫৮] এটি উভয়ের সমকালিন উল্লাস অতএব সম্ভোগ কালের অবস্থা। মোদন শুধু রাধিকার যূথস্থ গোপীদের মধ্যেই সম্ভব।[১৫৯] বিরহ দশায় মোদন মোহন নামে অভিহিত হয় এবং এই ভাব প্রায়শঃ রাধিকাতেই উদিত হয়।[১৬০]

দিব্যোন্মাদ—মোহনের একটি অনুভাব দিব্যোন্মাদ, বিরহ-কাব্যে বহু ভাবে বর্ণিত কবিদের প্রিয় বিষয়। মোহনাখ্য ভাবের ভ্রান্তি-সংশ্লিষ্ট এক বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে।[১৬১] মন যখন বিরহে কাতর, দয়িতকে পাবার চিন্তায় বিভ্রান্ত, তখন দয়িতের উপস্থিতির অনুকূলে সমূহ কল্পনা করে, সত্য-মিথ্যার ভেদনির্ণয় করবার ইচ্ছা বা শক্তি তখন নাই। কৃষ্ণ যখন সুদূর প্রবাসে তখনও তিনি ব্রজে আছেন মনে ক'রে রাধার অভিসার বাসকসজ্জা প্রভৃতি ক্রিয়াসাধন দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বিচিত্র কল্পনায় রাধা কৃষ্ণ সম্বন্ধে যা কিছু দেখেন বা মনে করেন, বাস্তব হ'তে তা ভিন্ন।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য ও অভিনিবেশ ক্ষয়িত বা বিলুপ্ত হ'য়ে চিত্তবৈবশ্যজনিত ভ্রমাত্মক বৈচিত্রীর সূচনা করে, এই বৈবশ্যকে কায়িক বা আচরণগত হ'লে উদ্‌ঘূর্ণা এবং বাচনিক বা বাক্যগত হ'লে চিত্র-জল্প বলে।[১৬২] কৃষ্ণ ব্রজে প্রত্যাগমন করেছেন এই মিথ্যা প্রতীতিতে বাসকসজ্জা রচনা প্রভৃতি কার্য উদ্‌ঘূর্ণা এবং ভ্রমরকে কৃষ্ণের দূত ভেবে ভ্রমরের প্রতি রাধিকার বাক্য-প্রয়োগ (ভাগবতের ভ্রমর গীতা) চিত্রজল্পের উদাহরণ।

মাদন—সর্বপ্রকার ভাবোদ্গমের উল্লাস যুগপৎ যাতে আছে, হ্লাদিনীর সারভূত সেই পরাৎপর প্রেমের নাম মাদন যা শুধু রাধিকাতেই সম্ভবে।[১৬৩] মাদন চিত্তের মত্ততা নির্দেশ করে। টীকায়

জীব গোস্বামী বলেছেন মাদনাখ্য মহাভাব "দিব্যমধুবিশেষবন্মত্ততা-কর" দিব্যমধুপানজনিত মত্ততার ন্যায় মত্ততা সৃষ্টি করে। ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে সুরাপান-জনিত মত্ততার তুলনা সুফীরা করেছেন, মনে হয় তার প্রভাব এখানে আছে।

"যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ
যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা।"[১৬৪]

মাদন যোগেই ( অর্থাৎ মিলনকালেই ) বিচিত্র রূপ ধারণ করে, তখন নিত্যলীলারূপ বিলাস সকল সহস্র প্রকারে বিরাজ করে। বিয়োগ কালে বিচিত্রতা না থাকতে পারে কিন্তু মাদনের যে উদয় হ'তে পারে না তা বলা হয় নি, সুতরাং মিলনকালে বিচ্ছেদানুভূতিজনিত উৎকণ্ঠা এবং বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের মিলনসুখানুভব, এ সব মাদনের "সর্বভাবোদ্গমোল্লাস"-এর বহির্ভূত নয়।

উপরে প্রেমানুরাগের বিবর্তনের যে ক্রম দেওয়া হয়েছে তা অব্যতিক্রম্য নয়, জীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে সামান্য হেরফের করেছেন, এগুলির অগ্রপশ্চাৎ উদ্ভব ক্রমভঙ্গ ক'রে হ'তে পারে, পূর্বরাগে মান-প্রণয়ের অবকাশ নাই, তদ্ব্যতিরেকেও এ অবস্থায় রাগের উদয় হ'তে পারে।[১৬৫]

বৈষ্ণব দর্শনের একজন নিষ্ণাত ব্যক্তির মন্তব্য—"স্নেহ হইতে মোদন পর্যন্ত সমস্ত স্তরই শ্রীকৃষ্ণে এবং সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণে আছে; ব্রজসুন্দরীগণ এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত প্রেমের বিষয়। আবার প্রেমের এই সমস্ত স্তর শ্রীকৃষ্ণেও আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত স্তরের ( মোদন পর্যন্তের ) আশ্রয়ও বটেন। কিন্তু প্রেম-বিকাশের শেষ স্তর যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা শ্রীকৃষ্ণে নাই (শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই নাই")।[১৬৬]

যদি মনে করা যায় যে স্নেহ-মান-প্রণয় প্রভৃতি স্থায়িভাব কৃষ্ণরতির উপবিভাগ যার উদয়ে ব্রজসুন্দরীদের মনে কৃষ্ণসেবার বাসনা জন্মে এবং যা থেকে ভক্তিরসের উদয় হয়, তা হলে এগুলি কৃষ্ণের চিত্তে উদয় হ'তে পারে না, কৃষ্ণ এ সবের আশ্রয় হ'তে পারেন না, কারণ এর উদয়ে কৃষ্ণের মনে গোপীদেরকে সেবা করার বাসনা উদয় হওয়া বা তাঁদের প্রতি ভক্তির সঞ্চার হওয়া একান্ত অসঙ্গত। অতএব গোপীদের বা রাধার প্রতি কৃষ্ণের যা মনোভাব তার বিভিন্ন স্তরের পৃথক নাম দেওয়া উচিৎ।

## বিপ্রলম্ভ

উজ্জ্বল রস দুই প্রকার, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অপ্রাপ্তি-জনিত বিরহ-ভাব হ'ল

বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ভাব সম্ভোগের উন্নতিকারক, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।[১৬৭] বিপ্রলম্ভ চার প্রকার— পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগ অযুক্তাবস্থার বিরহবোধ, যখন মিলনাকাঙ্ক্ষা জেগেছে অথচ মিলন হয় নি; বাকি তিনটি যুক্তাবস্থার অর্থাৎ মিলনপ্রাপ্তির পরের অবস্থার। লক্ষ্য করবার বিষয় বিরহ করুণরসের অন্তর্গত নয়, শৃঙ্গার রসের।

সনাতন অলঙ্কারশাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ চার প্রকারের—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ।[১৬৮] যুবক-যুবতীর একজন পুনরায় জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে লোকান্তরে গেলে যখন অন্যজন বিষণ্ণ হয় তখন করুণ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার হয়। পুনর্জীবনের নৈশ্চিত্য রাখতে হয়েছে একে শৃঙ্গার রসের শ্রেণীভুক্ত করবার জন্য, কারণ মরণ যদি চরম পরিণতি হয় তা হ'লে করুণ রস হয়, শৃঙ্গার রস নয়। কালিদাস বাণভট্ট বিলাপজাতীয় যে রচনা করেছেন তা'তে মরণকে চরম মেনেই করেছেন, পুনর্জীবিত হ'বার নিঃশংসতায় তা'কে কৃত্রিম অবিশ্বাস্য করেন নি, অতএব এ গুলি করুণ রসের রচনা। পুনর্জীবন হয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটা কাব্যপ্রযুক্তির অতিরিক্ত। আলঙ্কারিকের এই কৃত্রিম নির্দেশ না মেনে করুণ বিপ্রলম্ভের পরিবর্তে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে নেওয়া হয়েছে প্রেমবৈচিত্ত্য, এর সম্ভাব্যতা পার্থিব জগতে বিরল হ'লেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদের কারণস্বরূপ হয়েছে।

মান-জনিত প্রণয়-কলহে উভয়পক্ষেরই বিরহ ভাব হ'তে পারে। মান উপশমের প্রক্রিয়া সাম, ভেদক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা এবং রসান্তর।[১৬৯] মনে করিয়ে দেয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিহিত শত্রুবশের প্রক্রিয়া—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড। সাম=প্রিয়বাক্য রচনা। ভেদ=ভঙ্গিক্রমে স্বমাহাত্ম্য খ্যাপন বা সখী দ্বারা নায়িকাকে দোষারোপ পূর্বক হিতকথন। দান=ভূষণাদি প্রদান। নতি=চরণে পতন। উপেক্ষা=অন্য উপায় ব্যর্থ হ'লে অবজ্ঞা। রসান্তর=অকস্মাৎ ভয়াদির উদ্ভব যেমন মেঘগর্জন। পদকর্তারা এর সবগুলিই পরীক্ষা করেছেন। মানের তিনটি প্রকার—লঘু, মধ্যম এবং মহিষ্ঠ বা দুর্জয় মান, শেষেরটি কবিদের প্রিয়।

মানের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"আহেরিব গতিঃ প্রেমণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি"[১৭০]

প্রেমের গতি সাপের গতির ন্যায় স্বভাবতঃই কুটিল, অতএব যুবক-যুবতীর মনে মানের উদয় হয় সহেতু বা নির্হেতু। মনে হয় এই আপাত-সুবচনের সৃষ্টি হয়েছে রাধার ব্যবহার-বৈষম্যের সমাধান করতে, এক সময়ে তিনি এমন উদার যে সখীদের নিয়োগ করেছেন কৃষ্ণের সহিত বিহার করতে, আবার অন্য সময়ে মান করেছেন যখন কৃষ্ণ কোনও গোপীর প্রতি মন দিয়েছেন; অথচ রাধার স্বসুখেচ্ছা নাই,

আছে শুধুই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা! এই জটিলতার সমাধান হ'তে পারে যদি অহেতুক মানের সম্ভাব্যতা থাকে প্রেমের কুটিলতা বশতঃ।

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়।

× × × × ×

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম।
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।"[১৭১]

লক্ষ্য করবার বিষয় উজ্জ্বলনীলমণিতে মান দু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। চার প্রকার বিপ্রলম্ভের একটি হ'ল মান, এর প্রসঙ্গ আছে শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে, একটি উপ-পরিচ্ছেদ জুড়ে (মান প্রকরণ)। সেখানে মানের সংজ্ঞার্থ—

"দাম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।"[১৭২]

নায়ক-নায়িকা (নির্জনে) একত্র থাকলেও এবং অনুরক্ত হ'লেও যেখানে অভিপ্রেত আলিঙ্গন দর্শনাদির প্রতিবন্ধক থাকে তাকে মান বলে। মান দ্বিবিধ—সহেতু ও নির্হেতু। প্রতিপক্ষ নায়িকার প্রতি ঈর্ষা-প্রসূত যে বিরূপতা নায়কের প্রতি থাকে তাকে বলা হয় সহেতু মান; ঈর্ষা সত্ত্বেও যদি প্রেম থাকে তবেই মান সম্ভব হয়। প্রতিপক্ষ-নায়িকাসম্বন্ধিত নয় এমন মানকে নির্হেতু মান বলা হয়েছে, আসলে এ মান হেতুহীন নয়, আগমনে বিলম্ব কিম্বা অন্য সামান্য কারণ থেকে উদ্ভূত কোনও একটা ছল ধ'রে অভিমান করা।

মানের উৎপত্তি অন্য নায়িকার প্রতি ঈর্ষায়, কিন্তু উজ্জ্বলনীল-মণিতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় কৃষ্ণের বহু প্রেয়সী এবং কৃষ্ণ সকলের প্রতি অনুরক্ত, রাধিকা বা অন্য যূথেশ্বরীরা তাঁদের সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ঈর্ষাবোধের অত্যন্ত অভাব, তাঁরা এ বিষয়ে অবাস্তব রূপেই উদার। এমন পরিবেশে মান কি ক'রে সম্ভব হয়? মনে হয় সঙ্কেত স্থানে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ণের পক্ষে সেটা না রাখা কিম্বা অসতর্কতায় কৃষ্ণের মুখে বিপক্ষীয় নায়িকার নাম বা প্রশংসা শোনা (যাকে বলে গোত্রস্খলন) রমণীর মানের হেতু হয়, কৃষ্ণের অন্য রমণীর, বিশেষতঃ স্বপক্ষীয়া রমণীর সহিত মিলন মানের কারণ নয়। রাধার জ্ঞাতসারে বা অনুমোদনে কৃষ্ণের অন্য রমণীসঙ্গ দোষের নয়,

অজ্ঞাতসারে করাটাই প্রবঞ্চনা। চুরি ক'রে খেলেই গিন্নি চটে যান, চাইলে যত চাও ততটাই পাওয়া যায়।

বলা হয়েছে গাঢ় প্রেম না থাকলে মানের উদয় হ'তে পারে না, সে কারণে কৃষ্ণরতি বিকাশের সোপানে মানকে বেশ উঁচু কোঠায় রাখা হয়েছে। ব্রজ গোপীদের সম্বন্ধে বলা মুশ্‌কিল তবে নরনারীর বেলায় দেখা যায় মান-অভিমান দাম্পত্য জীবনের একটা সাধারণ ব্যাপার, এটা উচ্চস্তরের প্রেমাবির্ভাবের চিহ্ন নয়। প্রতিপক্ষ নায়িকা-জনিত মান প্রেমের পক্ষে অবশ্যই ক্ষতিকর।

মানের দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আছে—

"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্

যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে।"[১৭৩]

স্নেহ যেমন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হ'য়ে নবীন মাধুর্য আনয়ন ক'রে (বাহিরে) কৌটিল্য ধারণ করে তা'কে মান বলা হয়। প্রথমোক্ত সংজ্ঞা থেকে এর পার্থক্য শুধু এই যে এখানে নূতন মাধুর্যের উল্লেখ আছে, মনে হয় বহিস্থ কৌটিল্য কৃত্রিম বলেই এই মাধুর্য। মজে' যাওয়া প্রেমকে জাগানোর জন্যই এই মানের প্রয়োজন, যাকে বলে "কেঁদে মান যেচে সোহাগ" সে এই শ্রেণীর। পূর্বেকার "নির্হেতুক" মানের সহিত এর সাদৃশ্য আছে। এমন মান নায়কের সম্পূর্ণ উপভোগ্য এবং আশুপ্রশমনীয়, কিন্তু পূর্বকথিত সহেতুক মানের বেলায় দুর্জয় মান সম্পূর্ণ উপভোগ্য না হতেও পারে, যদিও রাধিকার মত উত্তমা নায়িকা আহার ত্যাগ করেন নি, আত্মহত্যার চেষ্টা করেন নি, গোসাঘরে যান নি অবশ্য কুঞ্জবনে বোধ হয় গোসাঘর ছিল না।

এক বিষয়ে মানের গুরুত্ব শতকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়, আমরা দেখব রাধার মান এবং কোপভাবের উদ্ভব থেকেই যথার্থ কাব্য সুরু হ'ল, তার আগে দীর্ঘসূত্রে গাঁথা শ্লোক ছিল বটে কিন্তু সেসব শ্লোক রসকাব্যের পদ পায় নি।

প্রেমবৈচিত্ত্য, অর্থাৎ প্রেমজনিত বিচিত্ততা বা চিত্তের অস্বাভাবিক, অসংলগ্ন ব্যবহার। যথা, প্রেমোৎকর্ষ—স্বভাববশতঃ প্রিয়তমের সন্নিধানে অবস্থিত থেকেও বিরহবোধের আর্তি।[১৭৪]

প্রবাস—পূর্বে মিলিত হয়েছেন এমন নায়ক-নায়িকার দেশান্তরে গমন বশতঃ যে ব্যবধান জন্মে তা'কে এবং তজ্জনিত বিরহকে প্রবাস বলে। প্রবাস দ্বিবিধ—(১) অদূরে গমন হেতু, যেমন দৈনিক গোচারণের জন্য কৃষ্ণের অনুপস্থিতি; (২) সুদূর প্রবাস, যেমন কৃষ্ণের মথুরা প্রয়াণ। মথুরা প্রয়াণ বিষয়ক পদাবলীকে মাথুরও বলে। প্রবাস ঘটবে এই আশঙ্কা, বর্তমানে ঘটছে, বা অতিতে ঘটেছে এখন তার স্মৃতিচারণ—এই ত্রিবিধ বর্ণনার ভেদে প্রবাসকে বলা হয় ভাবী, ভবন্ এবং ভূত বিরহ।

বিরহাবস্থায় নায়ক-নায়িকা দশটি দশা অতিক্রম করেন, পূর্বরাগ

মান এবং প্রবাসের বিরহে সামান্য হেরফের দেখা যায়; সুদূর প্রবাসজনিত দশাগুলি এই—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব (=কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু।[১৭৫]

## সম্ভোগ

মুখ্য সম্ভোগ চার প্রকার—

(১) সংক্ষিপ্ত—পূর্বরাগের পরে প্রথম সম্ভোগ, লজ্জা ভয় অসহিষ্ণুতা হেতু এ সম্ভোগ সন্তোষজনক হয় না।

(২) সংকীর্ণ—মানের পরে সম্ভোগ। একে তুলনা করা হয়েছে তপ্ত ইক্ষু চর্বনের সঙ্গে, যার আস্বাদনে উষ্ণতা ও মিষ্টতা যুগপৎ থাকে, কারণ মানের পরে মিলন আনন্দ-বিষাদময়, যেহেতু মিলনকালেও নায়ক কর্তৃক বঞ্চনার স্মৃতি নায়িকাকে পীড়া দিতে থাকে।

(৩) সম্পন্ন—অদূর প্রবাসের পরে মিলন।

(৪) সমৃদ্ধিমান—যেখানে পরাধীনত্ব হেতু নায়ক-নায়িকার পরস্পর দর্শন দুর্লভ সে স্থলে সম্ভোগের সুযোগ থাকলে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয়, এ কথা রূপ গোস্বামী বলেছেন।[১৭৬] জীব গোস্বামীর মতে সুদূর প্রবাস-জনিত বিরহের পরে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সম্ভব, এবং পারতন্ত্র্যের অবসানেই এমন সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সম্ভব। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে পারতন্ত্র্যের কারণেই সুদূর প্রবাসের পরে মিলন দুর্লভ, সুতরাং পারতন্ত্র্যই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের মর্যাদার হেতু। দ্বারকার মহিষীদের কৃষ্ণমিলনে পারতন্ত্র্য নাই সুতরাং সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের উৎকর্ষ নাই।

স্বপ্নাবস্থায় সম্ভোগকে গৌণ সম্ভোগ বলে। বৈষ্ণব মতে স্বপ্নঘটিত ব্যাপার মিথ্যা নয় সত্য।

বিপ্রলম্ভ অবস্থায় পরস্পরকে পাবার ভাবনা ও বাসনা তীব্রতর হয়, সেজন্য এই অবস্থা রসপুষ্টিকর এবং বিপ্রলম্ভের পরে যে সম্ভোগ হয় সেটা অধিক আনন্দকর। স্বকীয়া কৃষ্ণমহিষীদের বিরহ নাই, পরকীয়া গোপীদের আছে, অতএব শেষের ক্ষেত্রে সম্ভোগ সমৃদ্ধতর; পরকীয়া রসের উৎকর্ষের এটি একটি কারণ।

"সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈ্যব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"[১৭৭]

মিলন এবং বিরহ উভয়ের মধ্যে বিরহ বরণীয়, মিলন নয়। মিলনে একা সেই (প্রেয়সী) কিন্তু বিরহে ত্রিভুবনই (প্রেয়সী) ময়। পদকর্তারা মিলনের চেয়ে বিরহ-বিষয়েই রস-বিস্তার করেছেন অধিক, কারণ মিলনকালে মানস-ক্রিয়া দেহকেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ে, এমন মনের ভাব-সম্পদ বর্ণনার সম্ভাবনা সীমায়িত, অন্য দিকে বিরহের সময়ে প্রিয় বা প্রেয়সীর চিন্তায় প্রেমভাব বিশ্বব্যাপ্ত হয়, যার বর্ণনার সুযোগ প্রকারে সংখ্যাতীত।

## মিলনের উদ্যোগ

পরকীয়া প্রেমে যে বাধা কলঙ্ক-সম্ভাবনা গোপনতা চাতুরী বিপদবরণ প্রভৃতি বৈচিত্র আছে সেগুলিকে আলঙ্কারিক আটটি পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন—অবশ্য নায়িকার দিক থেকে। সকল বর্গবিভাগের মধ্যে এগুলিই কবিদের সমধিক প্রিয়।

(১) অভিসার—সঙ্কেত স্থানে প্রিয়ের সহিত মিলনের জন্য গোপনে গমন। কৃষ্ণের অভিসারের চেয়ে রাধার অভিসার বর্ণনাই কবিপ্রসিদ্ধ। রাধার অভিসার বর্ণিত হয়েছে দিবাভাগে, জ্যোৎস্না রাত্রিতে, অন্ধকার বর্ষা-রাত্রিতে। দুর্গমতার এবং কষ্টসহিষ্ণুতার কষ্টিপাথরে প্রেমের প্রগাঢ়তার পরিচয়-স্বরূপ বর্ষা-অভিসার কবিদের সর্বাধিক প্রিয়।

(২) বাসকসজ্জা—প্রিয়তমের আগমনের আশায় নায়িকার নিজদেহ এবং গৃহ সুসজ্জিতকরণ এবং প্রিয়ের আগমন-পথ নিরীক্ষণ।

(৩) উৎকণ্ঠিতা—সঙ্কেত স্থানে প্রিয়তম যথাসময়ে না আসার কারণে উৎসুক ও চিন্তিত নায়িকা।

(৪) বিপ্রলব্ধা—সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় সঙ্কেত স্থানে অনাগমন কারণে ব্যথিত বঞ্চিত ক্ষুণ্ন নায়িকা।

(৫) খণ্ডিতা—যে নায়িকার প্রিয়তম সঙ্কেত কালে না এসে প্রাতঃকালে দেখা দেন অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন নিজদেহে ধারণ ক'রে। কাব্যবিচারে এই শ্রেণীর কবিতা সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট।

(৬) কলহান্তরিতা—যে নায়িকা অপরাধী নায়কের মানভঞ্জনের সকল চেষ্টাকে ক্রোধভরে নিরস্ত ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'রে পরে অনুতাপ করেন।

(৭) প্রোষিতভর্তৃকা—যে নায়িকার কান্ত দুরদেশে গিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি বিরহিণী।

(৮) স্বাধীনভর্তৃকা—যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হ'য়ে তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নায়ক সর্বদা তাঁর নিকটে অবস্থান করেন, এবং আদেশমত নায়িকাকে সজ্জিত করেন। পদকর্তারা বুঝেছিলেন পরকীয়া প্রেমে এমন সুযোগ সামান্যই মেলে, সে কারণে এ সম্বন্ধীয় পদ অতি অল্প।

এই বিভাজন বিশ্বনাথের সম্মত। পদকর্তারাও এগুলি মেনেছেন, তবে খণ্ডিতার পরে মানের দীর্ঘ প্রসঙ্গ রেখেছেন। কোনও অবোধ্য কারণে অভিসার' বাসকসজ্জা প্রভৃতি পর্যায়ে মানকে রাখা হয় নি উজ্জ্বলনীলমণিতে। তার আগে জয়দেব বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা ও মানকে এই অনুক্রমে এক শ্রেণীতে রেখেছেন, রাধিকা মিলনের জন্য কষ্ট স্বীকার ক'রে প্রস্তুত হয়ে এলেন কিন্তু কৃষ্ণ বঞ্চনা করলেন। এইটাই মানের স্বাভাবিক স্থান কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে

অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে—এক নয় দুই জায়গায়। মান বর্ণিত এবং বিশদীকৃত হয়েছে প্রথমে স্থায়িভাব প্রকরণে (৭১ হ'তে ৭৭)—রতি প্রেম স্নেহের অব্যবহিত পরেই মানের স্থান করা হয়েছে তার পরে আছে প্রণয় রাগ প্রভৃতি। আবার মান এসেছে বিপ্রলম্ভ প্রসঙ্গে পূর্বরাগের পরেই (মান ৩১ হ'তে ৫৬)। মানকে গুরুত্ব দিতে স্নেহ প্রেমের অনুষঙ্গে পুনরুল্লেখ করণের হেতুস্বরূপ টীকাকার বলেছেন "স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে মানত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর কোন স্থানে স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয় রূপে পরিণত হয়। অতএব প্রণয় ও মান এই দুইয়ের পরস্পর কার্যকারণতা আছে, এ কারণ পৃথক রূপে বিশ্রম্ভের উদাহরণ করা হইল।"[১৭৮] অনুমান করা যায় মানের এমন উচ্চ মর্যাদা সুরু হয়েছে জয়দেবের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" থেকে, যখন স্বয়ং ভগবান মানভঞ্জনের জন্য এক গোয়ালিনীর পায়ে ধরলেন।

মানিনী গোপীরা কৃষ্ণকে যে সব অভিধানে সম্বোধিত করেছেন তার নমুনা "কিতবেন্দ্র, মহাধূর্ত, রতহিণ্ডক (=রতিচৌর), কামুকেশ, পাটচ্চর (=বাটপাড়)।"[১৭৯] ভক্ত মনে করেন নি যে এতে কৃষ্ণের সম্মানহানি হয়েছে।

কৃষ্ণৈকগতপ্রাণা রাধিকার যেসব মান, বাম্য কুটিলতা প্রভৃতি দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে এ সব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছার পরিপন্থি, কিন্তু তা নয়, কৃষ্ণ এ সব উপভোগ করেন—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।"[১৮০]

বৈষ্ণব কবি "মান"কে যথাস্থানে রেখেছেন অর্থাৎ খণ্ডিতার পরেই, এবং যথা-অর্থে নিয়েছেন, অন্য নায়িকার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ দেখলেই রাধার অসূয়া ও ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে, মদীয়তা ভাব এখানে সম্পূর্ণ সক্রিয়, কোনও ব্যবহার-বৈষম্য নাই। তিনি কোনও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেন নি, বরং দু-এক জায়গায় শ্লেষবাক্যে পরিহাস করেছেন। নির্হেতুক মানে বলা হয় কোনও কারণ নাই বা কারণাভাস আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে মানের একটা কারণ থাকবেই, কারণটা তুচ্ছ বা কৃত্রিম হতে পারে। পদকর্তারা কারণাভাস মানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কৃষ্ণের দর্পন-স্বরূপ স্বচ্ছ মসৃণ বক্ষে নিজের ছায়া দেখে অন্য নায়িকা কৃষ্ণের বক্ষলগ্ন কল্পনা ক'রে রাধার মান। এটিকে কবিসময় বলে গণ্য করলে এমন কোনও নির্হেতুক মানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যেখানে শুধুই চপলতা বশে বা প্রেমিকের ক্ষীণায়মান প্রেমকে উজ্জীবিত করতে নায়িকা অকারণ মানের অবতারণা করেছেন।

কৃষ্ণৈকপ্রাণ রাধার বা অর্পিত-চিত্ত নাগরীর মনোভাব চৈতন্য ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
-মদর্শনাম্মর্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো*
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।"[১৮১]

পাদলিপ্ত (এ দাসীকে) আলিঙ্গন দ্বারা উপমর্দনই করুন, অথবা অদর্শনে মর্মাহত করুন, অথবা সেই লম্পট যেখানে-সেখানে বিহার করুন, তিনিই আমার নাথ অন্য কেউ নয়। এই শ্লোকে মদীয়তা ভাব নাই, মানের অবকাশ নাই। চৈতন্য রাধাভাবে এ শ্লোক উচ্চারণ করেন নি, করেছেন সাধারণ ভক্ত ভাবে। রামানন্দের কাছে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে কৃষ্ণ যদি রাধাকে অন্য গোপীদের ন্যায় দেখেছেন তা হলে রাধার বৈশিষ্ট্য কোথায়? অতএব রাধাভাব এখানে ব্যক্ত হয় নি।

"কিবা তেহোঁ লম্পট শঠ, ধৃষ্ট, সকপট
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য॥"[১৮২]

যে নায়িকা নিজেকে স্বরূপশক্তির অংশ রূপে এবং সমস্ত ব্যাপারটিকে লীলা রূপে দেখবার দার্শনিক মনোভাবগ্রস্ত বা যে সাধক-ভক্ত মানস-বৃন্দাবনে লীলার অনুধ্যান ক'রে পূর্ণ ভক্তির অভিব্যক্তি-স্বরূপ প্রেমকে স্বার্থবর্জিত মানাভিমানহীন রূপে ব্যঞ্জিত দেখতে ভালবাসেন, তাঁদের পক্ষে উপরোক্ত মনোভাব হয়ত সহনীয় এমন কি কাম্য। কিন্তু কোনও প্রাণবন্ত প্রেম-উপাখ্যানে এমন উদার আত্মবিলোপী নিঃসত্ত্ব নিরধিকার প্রেম সম্ভব নয়, এমন প্রেমের বিস্তারে আখ্যান নিঃস্বাদ নিরস হ'য়ে যায়। পদকর্তা মহাজনরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের রাধা অন্য নায়িকার সহিত কৃষ্ণের মিলন মাত্রেই অসহিষ্ণু কোপনারূপে ঈর্ষাপরায়ণ, তিনি নাচের পুতুল নয়, জীবন্ত নায়িকা।

## সখা ও সখী

কৃষ্ণের সখাদের মধ্যে প্রধান যাঁরা তাঁদের বলা হয় প্রিয়-নর্মসখা। এঁরা আত্যন্তিক রহস্যকার্যে লিপ্ত থাকেন, দৌত্য করেন, প্রণয়কলহে মধ্যস্থতা করেন, এঁরা সখীভাবসমাশ্রিত অর্থাৎ কৃষ্ণ ও

* পাঠান্তর "নাগরো"

তৎপ্রেয়সীগণের মিলন সংঘটনের জন্য তৎপর।[১৮৩] কৃষ্ণের কেলিসময়ে উপস্থিত থেকে এঁরা সেবাপর।[১৮৪] প্রিয়নর্মসখাদের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বল প্রধান। মিলনকালে প্রিয়নর্মসখাদের উপস্থিতি বৈষ্ণব-কবি সযত্নে পরিহার করেছেন। এঁদের পরে আছেন প্রিয় সখারা যাদের মধ্যে শ্রীদাম সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৮৫] তার নিচে আরও দুটি শ্রেণী আছে, সখা ও সুহৃদ।

কৃষ্ণের সহিত প্রেমলীলার অধিকার শুধু ব্রজগোপীর, কারণ মহাভাব শুধু তাঁদেরই। এঁদের স্বসুখবাসনা নাই, সুতরাং কৃষ্ণের সহিত মিলনের আগ্রহ নাই, যদি মিলন হয় সেটা কৃষ্ণের সুখবাসনা হেতু। কিন্তু একটি শ্লোকে[১৮৬] কৃষ্ণকে হরিণের সঙ্গে এবং ব্রজগোপীকে ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রেমকেও কি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা বলা যেতে পারে?

গোপীরা কয়েকটি যূথে বিভক্ত, যূথের সর্বপ্রধানকে বলা হয় যূথেশ্বরী। এক যূথে যে-সমস্ত গোপীরা অবস্থান করেন তাঁরা যূথেশ্বরীর স্বপক্ষে, অবশ্য তাঁদের প্রেম যূথেশ্বরীর সমান নয়। যাঁরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন তাঁরা পরস্পরের বিপক্ষ, যেমন রাধা ও চন্দ্রাবলী, এঁরাই কৃষ্ণের মুখ্য নিত্যপ্রিয়া।[১৮৭] স্বভাবতঃই রাধার সখীরা চন্দ্রাবলীর সখীদের বিপক্ষে। পরস্পর-কলহ যূথেশ্বরীরা ততটা করেন না যতটা তাঁদের সখীরা করেন।

যূথেশ্বরীর অধীনে আছেন সখী ও মঞ্জরী। "প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিণীসখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটী"[১৮৭], প্রেমলীলাবিহারের সম্যক বিস্তারকারিণীকে সখী বলে, তিনি বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটিকা। সখীরা স্বীয় অঙ্গদানাদি দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, অনেক সময়ে রাধার ইচ্ছাতেই করেন[১৮৮], কিন্তু সখীর অনুগতা মঞ্জরীর এ অধিকার নাই, তাই তাঁরা রাধাকৃষ্ণের বিলাস সময়ে কাছে থেকে সেবার আনুকূল্য করেন, এ সময়ে সখীরা নিকটে থাকেন না। সখীর সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী, মঞ্জরীর সেবা আনুগত্যময়ী, এঁরা কিঙ্করী ভাবে সখীর আনুকূল্যে সেবা করেন। সখীরা স্বরূপশক্তি, সাধনসিদ্ধা গোপী সখী হ'তে পারেন না; স্বরূপশক্তি বা সাধন সিদ্ধা জীবশক্তি উভয়েই মঞ্জরী হ'তে পারেন। সখীদের মধ্যে পরমপ্রেষ্ঠ সখীরাই প্রধান, এঁরা সংখ্যায় আটজন, ললিতা বিশাখা চিত্রা প্রভৃতি। এঁদের নাম প্রথমে পাওয়া যায় রূপ গোস্বামীর রচনায় এবং পদ্মপুরাণে। অবস্থাবিশেষে এঁরা কৃষ্ণ বা রাধা কোনও একজনের পক্ষপাত অবলম্বন করেন বা উপদেশ দেন। বৈষ্ণব পদাবলীতেও এঁদের এই ভূমিকা। মঞ্জরীদের মধ্যে প্রধান রূপমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি।

প্রেমনির্বাহের সহায়ক ও সংঘটক রূপে আছেন দূতী—কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণপ্রেয়সীদের। দূতী দ্বিবিধ—স্বয়ংদূতী এবং আপ্তদূতী। মিলনের জন্য অতিশয় ঔৎসুক্য বশতঃ যাঁর লজ্জা দূর হয়েছে এবং

যিনি নিজেই মিলন-অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাঁকে স্বয়ং দূতী বলা হয়। এই অভিপ্রায়-প্রকাশ বাক্য দ্বারা বা অঙ্গভঙ্গী কটাক্ষাদি দ্বারা হ'তে পারে। যে ক্ষেত্রে প্রকাশ বাচিক সে ক্ষেত্রে কবিরা প্রায়ই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষার ব্যপদেশে নায়িকার গূঢ়ার্থ-প্রকাশ-ক্ষম বাক্-চাতুর্য সৃষ্টি করেছেন, যদিও সূক্ষ্মতার অভাব আছে। "কটাক্ষে"র নূতন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যা অপাঙ্গ-দৃষ্টি অর্থে প্রযুক্ত নয়, নেত্র-তারকার গতাগতি-স্থিতি এবং বৈচিত্র্যের সহিত বিবর্তনকে বলা হয়েছে কটাক্ষ, কলাভিজ্ঞের সাখ্যানুসারে।[১৮৯] মনে রাখতে হ'বে অঙ্গভঙ্গী চেষ্টাকৃত হলে তবেই তা দূতীর স্বাভিযোগের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু যদি কৃষ্ণানুরাগের ফলে ভাবোদয়ের অনুষঙ্গে স্বভাবতঃই অঙ্গভঙ্গী প্রকটিত হয় তা হ'লে তা স্বয়ংদৌত্য হবে না, হ'বে অনুভাব। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করেন না এবং যিনি স্নেহবতী এবং বাক্যপ্রয়োগে নিপুণা তাঁকে আপ্তদূতী বলা হয়।

দূতীর যেসকল গুণ থাকা উচিৎ, বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন[১৮৯ক] সেগুলি এই—কলাকৌশল, উৎসাহ, ভক্তি, অপরের মনোভাব বুঝবার শক্তি, স্মৃতিশক্তি, মাধুর্য, হাস্যকৌতুক বুঝবার ক্ষমতা এবং বাগ্মিতা। মালবিকাগ্নিমিত্রের রাণী ধারিণীর অনুকরণে বলতে ইচ্ছা করে এমন সর্বাঙ্গীণ গুণপনা প্রেমের দৌত্যকার্যে ব্যয়িত না ক'রে কূটনৈতিক দৌত্যকার্যে নিয়োজিত করলে রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ হ'ত।

বৃন্দা এবং পৌর্ণমাসী গোপীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা এবং সম্মানিতা, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেয়সীর প্রেম, কলহ, দুর্বিপাকে এঁদের দেখা যায় সাহায্য বা নিষ্পত্তি করতে। প্রমীলারাজ্যে এঁরা কুলপতি স্থানীয়া। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের অধ্যাপক সন্দীপনি মুনির মাতা, সন্দীপনি মুনির ছেলে মধুমঙ্গল কৃষ্ণের বয়স্য। অতএব পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের ঠানদিদি সম্পর্কীয়া, কৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন সমাধান করেন। রাধার তরফে অনুরূপ চরিত্র বড়ায়ি, বড়ু চণ্ডীদাসের উদ্ভাবন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিনি যে রকম দুমুখো ব্যবহার করেছেন তারপর থেকে কবিরা তাঁর নাম করেন নি।

দূতী প্রসঙ্গে কিছু অসঙ্গতি আছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়েছে রাধার বা অন্য নায়িকার বা সখীর কৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে কোনও স্বসুখ-বাসনা নাই, কৃষ্ণের সুখই তাঁদের একমাত্র বাসনা। এর সমর্থনে দেখা যায় যে এক দিকে রাধা সখীদের নানা ছলে পাঠান সঙ্গম-হেতু কৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণের প্রীত্যার্থে, অন্য দিকে সখীদের কামনা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন। অতএব কৃষ্ণের কাছে রাধা-কর্তৃক দূতী পাঠানোর কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না, কারণ দূতী পাঠানোর উদ্দেশ্যই হ'ল আপনার মিলন-বাসনার বিজ্ঞাপন, নিজের সুখের জন্য বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য না হ'লে দূতীর মারফৎ আবেদন

জানানোর উদ্দেশ্য কি ? রাসলীলায় গোপীরা নিজেরাই ছুটে গিয়েছিলেন, দূতী পাঠাবার দরকার হয় নি। কিন্তু যেখানে নায়িকা দূতী পাঠিয়ে নায়ককে আহ্বান জানাচ্ছেন মিলনের জন্য, সেখানে ঈপ্সা বা লিপ্সা আছে অথচ সেটা নিঃস্বার্থ, এমন কল্পনায় যুক্তির অন্তরায় আছে। বৈষ্ণব পদকর্তারা এমন অব্যাখ্যেয় কৃত্রিম বিধান মানেন নি, রাধা যে কৃষ্ণ-মিলন-বাসনা অকপটে প্রকাশ করেছেন তা কৃষ্ণ-সুখ-সচেতন নয়। দূতী কখনও বা রাধাকে বঞ্চিত ক'রে আদিষ্ট কার্যসাধন না ক'রে কৃষ্ণের সম্ভোগের বস্তু হয়েছে, সে ক্ষেত্রে রাধা সন্তুষ্ট হন নি। বৈষ্ণব-পদাবলী যুগল প্রেমের উৎকৃষ্ট কাব্য, সমগ্র কাব্য জুড়ে কৃষ্ণরাধাই নায়ক-নায়িকা, যে-কেউ এই প্রেমের কক্ষাপথে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি প্রেম সহায়ক যদি না হ'ন তা হলে তিনি ঈর্ষা-বিদ্বেষের পাত্রী, এঁদের স্বপক্ষে না হ'লে তিনি বিপক্ষীয়। সব মিলে এই বিরহ-মিলন গাথা হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির অপর্যুদস্ত সরল অথচ সান্দ্রতম প্রকাশ।

## অন্যান্য প্রকারভেদ

রূপ গোস্বামী সাধারণতঃ ভরতমুনির অনুর্বতন করলেও ভক্তিরসের আনুকূল্যে উপযোজিত, পল্লবিত, বহুলীকৃত করেছেন বহু স্থলে। ব্যভিচারি-ভাব প্রকরণের শেষাংশে একাধিক ভাবের যুগপৎ অবস্থান ও পারস্পরিক অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। অনুভাব শৃঙ্গার-রস-সীমায়িত এবং কৃষ্ণপ্রেম-সম্মত, তা সত্ত্বেও অনুভাব প্রকরণে এমন বিষয়ের দীর্ঘ সঙ্কলন আছে যা ভক্তচিত্তের পরিচায়ক নয়। বলা হয়েছে গোপীদের বেলায় অনুভাবের চারটি মূল বিভাগ—অলঙ্কার, সাত্ত্বিক, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক।[১৯০] কৃষ্ণ-বিভাবিত হ'য়ে প্রেমিকার যে-চিত্তবিকার হয় তারই লক্ষণ-সমূহকে বলা হয়েছে অলঙ্কার। প্রকারভেদে এগুলিকে অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে, যদিও এদের কতকগুলি স্বভাবতঃই উদ্দীপন-বিভাবের অঙ্গীভূত হওয়া উচিৎ। যে দুই শ্রেণীর অনুভাবকে উদ্ভাস্বর ও বাচিক বলা হয়েছে, সেগুলি গৌণ এবং কৃত্রিম ব'লে মনে হয়। কৃষ্ণের রূপদর্শনে বা বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদের নীবিবন্ধ শিথিল হ'য়ে যায়, এটি উদ্ভাস্বর অনুভাব, এটি সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক অতিশয়োক্তি, যেমন পুত্রদর্শনে মাতার স্তন হ'তে দুগ্ধক্ষরণ। বিস্তৃত আলোচনা আছে উজ্জ্বলনীলমণি ও প্রীতিসন্দর্ভে।

স্থায়িভাব প্রকরণে রতি-উৎপত্তির কারণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে, এ-গুলি উদ্দীপন-বিভাবের অঙ্গ হ'লেও এখানে নূতন ক'রে বর্ণিত হয়েছে, যেহেতু এখানে কারণের সঙ্গে তার ফলটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা স্থায়িভাবের পুষ্টির সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ দৌত্যকার্যকে

স্থান দিতে হবে, ভরতের বর্গীকরণে যার নাম না থাকায় তার নিশ্চিত স্থান-নির্দেশনা অনুমানের বিষয়। এ কারণে একে স্থায়িভাব প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অভিনব রূপায়ণে সমৃদ্ধ হয়েছে এমন কতকগুলি সাধারণ বাক্য এবং কাব্যে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত কতকগুলি বাক্য রূপ গোস্বামীর রচনা থেকে নীচে দেওয়া হ'ল—

"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্‌ভূষণাদিনা
যেন ভূষিতবদ্‌ভাতি তদ্রূপমিতিকথ্যতে।"[১৯১]

দেহে কোনও ভূষণাদি না থাকলেও যার দ্বারা অঙ্গসকল ভূষিতের ন্যায় দৃষ্ট হয় তাঁকে বলে রূপ।

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে।"[১৯২]

মুক্তাফলের মধ্য থেকে নির্গত তরল কিরণের মত অঙ্গে (যে কান্তি) প্রতিভাত হয় তাকে লাবণ্য বলা হয়।

"যদ্‌ গতাগতিবিশ্রান্তিবৈচিত্র্যেণ বিবর্তনম্‌
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞাস্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে"[১৯৩]

নেত্রতারকার যে গতাগতিবিশ্রান্তিরূপ চমৎকার বিবর্তনবৈচিত্র্য রসজ্ঞরা তাকে কটাক্ষ বলেন। নেত্রতারকা দৃষ্টিকোণে গিয়ে দর্শনীয়কে অনুপলমাত্র দেখে চকিতে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের ভঙ্গী ফুটে উঠেছে এই dynamic অভিজ্ঞায়।

অনুভাবের প্রকারভেদ আছে। এর কতকগুলি নায়িকার প্রেমবিকাশের লক্ষণ, কতকগুলি রমণীর চরিত্রগত স্বাভাবিক চিহ্ন। এই তালিকা এবং ব্যাখ্যান বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুরূপ[১৯৪]—

অঙ্গজ—ভাব, হাব, হেলা

অযত্নজ—শোভা, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ধৈর্য ইত্যাদি

স্বভাবজ (অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রযত্ন হ'তে উৎপন্ন)—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, ললিত, বিকৃত ইত্যাদি।

ভাব—রতির উদয়ে নির্বিকার চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া হয় তাকে বলে ভাব।[১৯৫] "ভাব" বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহু-অর্থ-ভারাক্রান্ত বহুরূপী শব্দ।

হাব—গ্রীবার তীর্যকতায় এবং ভ্রূ-নেত্রাদির বিকাশে বাসনার অধিকতর প্রকাশ।[১৯৬]

হেলা—হাব অপেক্ষা সম্ভোগেচ্ছার অধিক রূপে সূচনা[১৯৭]

লীলা—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ব্যক্তির অনুকরণ।[১৯৮] এই সংজ্ঞায় বৈসাদৃশ্য কিছু নাই, ঈশ্বর মানুষের অনুকরণে যা কিছু করেন তাকেও লীলা ব'লে থাকি।

বিভ্রম—দয়িতের সহিত মিলন-সময়ে আবেগবশতঃ হারমাল্যাদির অযথা স্থানে ধারণ।[১৯৯]

কিলকিঞ্চিত—হর্ষ হেতু গর্ব অভিলাষ রোদন হাস্য অসূয়া ভয় ও ক্রোধের একই সময়ে সংমিশ্রণ।[২০০]

কুট্টমিত—নায়কের উপক্রমে নায়িকা প্রীত হ'লেও যে কপট ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন।[২০১]

বিকৃত—লজ্জা মান ঈর্ষা বশতঃ বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করার অক্ষমতা হেতু শুধু চেষ্টায় পর্যবসিত হয়।[২০২]

অবহিত্থা—কোনও কৃত্রিম ভাবের দ্বারা যথার্থ ভাবের বা অনুভাবের গোপন।[২০৩]

অভিমান—বহু মনোজ্ঞ বস্তু থাকলেও একটি বিশেষ বস্তুর প্রার্থনা-নিশ্চয়।[২০৪] অন্যত্র আছে অভিমান=ভঙ্গিক্রমে স্বপক্ষের উৎকর্ষ বর্ণনা।[২০৫] একটি শব্দের নানা অর্থে বিবরণ এখানেও ভ্রান্তিকর।

ত্রাস ও ভয়—পূর্বাপর বিচার ব্যতিরেকে যে মনঃকম্প সহসা গাত্রোৎকম্প ঘটায় তাকে "ত্রাস" এবং পূর্বাপর বিচারজনিত হ'লে তাকে "ভয়" বলে।[২০৬]

বিলাস—গমণ, অবস্থান, উপবেশনাদির এবং মুখ-নেত্রাদির কর্মসকলের প্রিয়সঙ্গজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য।[২০৭]

উদ্ভাস্বর, নীবিস্খলন প্রভৃতি কতকগুলি অনুভাব বর্ণিত হয়েছে যেগুলি রূপগোস্বামীর সংযোজন।

## উল্লেখপঞ্জী

১। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭
২। ছান্দোগ্য উপনিষদ ১/১/৩
৩। অলঙ্কার কৌস্তুভ, পঞ্চম কিরণ
৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভক্তিসামান্য ১
৫। সাহিত্যদর্পণ, ৩/১
৬। ঐ ৩/১৭৮
৭। ধ্বন্যালোক ১/৯ বৃত্তি, লোচন টীকা
৮। Ranicro Gnoli, The Aesthetic Experience according to Abhinava Gupta, pp. 15, 64
৯। রাজশেখর, কাব্যমীমাংসা, চতুর্থ অধ্যায়, পদবাক্যবিবেক
১০। Gnoli p. xxviii
১১। Gnoli pp. 3, 31
১২। Gnoli pp. 4, 34
১৩। Gnoli pp. 5, 36
১৪। Gnoli pp. 5, 36, 37
১৫। Gnoli pp. 8, 9, 44, 45
১৬। Gnoli pp. 9, 46

১৭। Gnoli pp. 11, 50
১৮। Gnoli pp. 11, 12, 53-56
১৯। ধ্বন্যালোক, লোচন টীকা, দ্বিতীয় উদ্দ্যোত ৪
২০। Gnoli pp. 12, 58
২১। Gnoli p. 16
২২। Gnoli p. 71
২৩। অভিনব গুপ্তের রসভাষ্য, অবন্তীকুমার সান্ন্যাল পৃঃ ২৯
২৪। Gnoli p. 76
২৫। Gnoli pp. 25, 102
২৬। Gnoli pp. 17, 77
২৭। Gnoli pp. 17, 78
২৮। Gnoli pp. 20, 90
২৯। Gnoli pp. 18, 79
৩০। মম্মট, কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস
৩১। বিশ্বনাথ, সাহিত্যদর্পণ ৩/১
৩২। ঐ ৩/২
৩৩। ঐ ৩/২২
৩৪। মম্মট, কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস
৩৫। বিশ্বনাথ, সাহিত্য দর্পণ ৩/২৩
৩৬। Gnoli pp. 24, 96
৩৭। ধ্বন্যালোক, লোচন টীকা, প্রথম উদ্যোত ১৮
৩৮। Gnoli pp. 15, 68
৩৯। বিশ্বনাথ, সাহিত্যদর্পণ ৩/১৩
৪০। Gnoli pp. 22, 42
৪১। Gnoli pp. 20, 86
৪২। Gnoli pp. 21, 91
৪৩। Gnoli pp. 24, 97
৪৪। Gnoli pp. 20, 85
৪৫। বিশ্বনাথ, সাহিত্যদর্পণ ৩/৮
৪৬। ঐ ৩/১৮০
৪৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়ীভাব, ৭৫-৭৬, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা
৪৮। বিশ্বনাথ, সাহিত্য দর্পণ, ৩/১৯, ২০
৪৯। ঐ ৩/২
৫০। মম্মট, কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস
৫০ক। Bhojas Sringarprakash by V. Raghavan p. 450
৫১। বিশ্বনাথ, সাহিত্যদর্পণ ৩/২/৩

৫২। Gnoli p. 87
৫৩। অভিনব গুপ্ত, অভিনবভারতী
৫৪। Gnoli pp. 17, 78
৫৫। ধ্বন্যালোক, লোচন টীকা, তৃতীয় উদ্যোত ১৪
৫৬। Gnoli p. 79 Notes
৫৭। Gnoli pp. 19, 83
৫৮। কাব্যপ্রকাশ ৪/১২
৫৯। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকা ৪/৩৫
৬০। বিশ্বনাথ, সাহিত্যদর্পণ ৩/২১৭

৬২। জগন্নাথ, রসগঙ্গাধর, প্রথমাননে রসভেদ
৬৩। সাহিত্যদর্পণ ৩/৮
৬৪। ভক্তিরসায়ন ২/৭৫-৭৬
৬৫। বোপদেব, মুক্তাফল ১১/১
৬৬। ভ-র-সি, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ২, ৮৭
৬৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব ৫, প্রীতিসন্দর্ভ ১১০
৬৮। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা পৃঃ ৩১৭
৬৯। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৫৮
৬৯ক। ভাগবত ১০/৮৬/৫৯
৭০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৮১
৭১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ১০৪, ১০৫
৭২। প্রীতিসন্দর্ভ ১১০
৭৩। অলঙ্কারকৌস্তভ, পঞ্চম কিরণ
৭৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ৮০, টীকা প্রীতিসন্দর্ভ ১১১
৭৪ক। Bhoja's Sringarprakash p. 461
৭৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ৬০
৭৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ৮৮
৭৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ৮৯
৭৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ৩৩
৭৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর, মৈত্রী-বৈর-স্থিতি ২৩
৮০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ২৯, ৪৪, ৪৫
৮১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, শান্তভক্তি ১০
৮২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব ২১
৮৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, প্রীতভক্তি ৬৬
৮৩ক। প্রীতিসন্দর্ভ ২২৩
৮৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব, ২৩

৮৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব, ২৪
৮৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়িভাব, ২৫
৮৭। প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪
৮৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর, করুণভক্তি ৩
৮৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর, বীরভক্তিরস ২
৯০। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ ৩/২০৬
৯১। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ৩
৯২। উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্দীপন প্রকরণ ১
৯৩। উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্দীপন প্রকরণ ২৯
৯৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব ১৪
৯৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব ১৫
৯৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব ৫
৯৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব ১৩৫, টীকা
৯৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পশ্চিম, মধুরভক্তি ১৩, টীকা
৯৮ক। প্রীতিসন্দর্ভ ১১১
৯৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, অনুভাব ১
১০০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, অনুভাব ২
১০১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, শান্তভক্তি, ২১
১০২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ব্যভিচারি, ১০৯, ১১০
১০৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, স্থায়ী ৫০, ৫১
১০৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ব্যভিচারি, ৩
১০৫। উজ্জ্বলনীলমণি, ব্যভিচারিভাব প্রকরণ ১
১০৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ব্যভিচারি,১০২
১০৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ব্যভিচারি, ১০৬
১০৮। প্রীতিসন্দর্ভ ১১০
১০৯। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ ৩/২১৯
১১০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর, রসাভাস ১, টীকা
১১১। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ ৩/২
১১২। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ৩
১১৩। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ১৯
১১৪। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ২০, ২১
১১৫। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ২২
১১৬। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ২৩
১১৭। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ২৪, ২৫
১১৮। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ৮, ৯
১১৯। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ১১
১২০। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ১৭
১২১। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ১৩

১২২। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ১৯
১২৩। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ১৪
১২৪। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ২০
১২৫। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ১৫, ২১
১২৬। উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া প্রকরণ ১২
১২৭। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ২২
১২৮। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ২৪
১২৯। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ২৬, ২৭
১৩০। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ১২২, ১২৩
১৩১। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রকরণ ৪৬, ৪৭
১৩২। ভাগবত ৭/১/২৯, ৩০
১৩৩। বৃহৎ ভাগবতামৃত ১/৭/৪৮
১৩৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৭৮, ৭৯
১৩৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব সাধনভক্তি ৭৯-এ উদ্ধৃত
১৩৬। ভাগবত ১০/৩৩/৪০
১৩৭। উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্দীপনবিভাব প্রকরণ ২০
১৩৮। ব্রহ্মসংহিতা ৪
১৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ১২
১৪০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২১৫
১৪১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৭৭, ১৭৮
১৪২। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৩১
১৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/৩৫৭
১৪৪। ভাগবত, ১১/২/৪০, ১১/৩/৩১-৩২
১৪৫। প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪, চৈতন্যচরিতামৃত, ২/২৩/২০-৩৬
১৪৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ১; পশ্চিম, প্রীতিভক্তি, ৪৪; উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৩৫
১৪৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৩/৩৯
১৪৮। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৪৩; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, প্রীতিভক্তি, ৪৫
১৪৯। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৫১
১৫০। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৫৫
১৫১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, প্রেয়োভক্তি ৫৯
১৫২। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৬২
১৫৩। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৭৫
১৫৪। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৭৬
১৫৫। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৭৮
১৫৬। ভাগবত ১১/১২/১২
১৫৭। বিষ্ণু পুরাণ ৫/১৩/২৫-২৮; ভাগবত ১০/৩০/১৪-২৩

১৫৮। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ১৭৩
১৫৯। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৯০
১৬০। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৯১, ৯৪
১৬১। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৯৫
১৬২। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৯৭, ১০১
১৬৩। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ১০৩
১৬৪। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ১১৫
১৬৫। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ১১৮
১৬৬। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা পৃঃ ৩৪৩
১৬৭। উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ ২
১৬৮। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ, ৩/১৮৫
১৬৯। উজ্জ্বলনীলমণি, মান ৫৯
১৭০। উজ্জ্বলনীলমণি, মান ৫৬
১৭১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২০৭, ২০৮, ২১২, ২১৩
১৭২। উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ ৪৩
১৭৩। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৭১
১৭৪। উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ, প্রেমবৈচিত্ত্য ৭৭
১৭৫। উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ, প্রবাস, ৮৮
১৭৬। উজ্জ্বলনীলমণি, মুখ্যসম্ভোগ প্রকরণ ১৬
১৭৭। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্য-দর্পণ-ধৃত বচন (১০/৩৫)
১৭৮। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৮৩, টীকা
১৭৯। উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ, মান ৭৪-৭৬
১৮০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২৬,
১৮১। উজ্জ্বলনীলমণি, ব্যভিচারি প্রকরণ ৭৯; পদ্যাবলী ৩৩৭; চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ২০/৪৭
১৮২। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২০/৫১-৫২
১৮৩। উজ্জ্বলনীলমণি, সহায়ভেদ প্রকরণ ৭; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, প্রেয়োভক্তি ২২, ২৩, ৫১, ৫২
১৮৪। উজ্জ্বলনীলমণি, সহায়ভেদ প্রকরণ ৭
১৮৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, প্রেয়োভক্তি ২১
১৮৬। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকা প্রকরণ ১৭
১৮৭। উজ্জ্বলনীলমণি, সখী প্রকরণ ১
১৮৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২১২, ২১৩
১৮৯। উজ্জ্বলনীলমণি, দূতীভেদ প্রকরণ ১৫
১৮৯ক। সাহিত্যদর্পণ ৩/১৩২
১৯০। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ৫৭
১৯১। উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্দীপন প্রকরণ ১৩

১৯২। উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্দীপন প্রকরণ ১৪
১৯৩। উজ্জ্বলনীলমণি, দূতীভেদ প্রকরণ ২৫
১৯৪। সাহিত্যদর্পণ ৩/৯৯ এবং পরবর্তী
১৯৫। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ৬; প্রীতিসন্দর্ভ ৩১৮
১৯৬। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ৭; প্রীতিসন্দর্ভ ৩১৯
১৯৭। প্রীতিসন্দর্ভ ৩২০
১৯৮। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ১৬; উদাহরণ ভাগবত ১০/৩০/৩, ১৪-২৩; গীতগোবিন্দ ষষ্ঠ সর্গ, ১২শ গীত ৪
১৯৯। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ২০
২০০। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ২২
২০১। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ২৪
২০২। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ২৭
২০৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ব্যভিচারি, ৪৫
২০৪। উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ ৭
২০৫। উজ্জ্বলনীলমণি, হরিবল্লভা প্রকরণ ১০
২০৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, ব্যভিচারি, ২২; ২/৪/৫৮
২০৭। উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাব প্রকরণ ৬৭

## ॥ ৫ ॥
# সাধন তত্ত্ব

### ভক্তের প্রকার ভেদ

ভক্তের প্রকার ভেদ মনে না রাখলে শুদ্ধ "ভক্ত" কথাটির প্রয়োগে বা বোধে বহু বিপ্রতিপত্তি ও অযথার্থতা আসা সম্ভব, কারণ এই প্রভেদ অত্যন্ত গভীর বনিয়াদি। প্রকার ভেদ এইরূপঃ১—

(১) নিত্যসিদ্ধ ভক্ত—অনাদিকাল হ'তে ভগবানের নিত্যপরিকরগণ। এঁরা স্বরূপ শক্তির মূর্তবিগ্রহ, নিত্য ও আনন্দস্বরূপ, অনন্যনিরপেক্ষ, এঁদের কোনও সাধন করতে হয় নি। সেবার মূল অধিকার এঁদেরই। বসুদেব-দেবকী, নন্দ-যশোদা আসলে কৃষ্ণের পিতামাতা নয়, কারণ পরব্রহ্মের পিতামাতা থাকতে পারে না। এটা এঁদের অভিমান বা অভিনয় মাত্র, মায়িক বলা চলে না কারণ মায়ার প্রভাব এঁদের উপরে নাই, বলা যেতে পারে যোগমায়িক।

(২) ভগবৎ-কৃপাসিদ্ধ ভক্ত—এঁরা জীবশক্তি, কোনও সাধনানুষ্ঠান ব্যতীত ভগবৎ-কৃপায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, যেমন বলি, শুকদেব।

(৩) সাধন-সিদ্ধ ভক্ত—এঁরাও জীবশক্তি তবে সাধনের প্রভাবে এবং স্বরূপ-শক্তির অনুগ্রহে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে বৈকুণ্ঠবাসকামী এবং মোক্ষ-স্পৃহাহীন সেবাকামী, দুই শ্রেণীই আছেন। পূর্বজন্মে যাঁরা ঋষি বা দেবকন্যা ছিলেন তাঁরাও এই শ্রেণীতে গণ্য।

(৪) সাধক-ভক্ত—বা জীবভক্ত, যাঁর মনে কৃষ্ণরতি উদ্বুদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ জাতরতি, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন হ'তে পারেন নি। এঁরা পৃথিবীবাসী।

রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী শুধু নিত্যসিদ্ধ পরিকররা, দেহ দ্বারা সেবা শুধু তাঁরাই করতে পারেন। যে জীব ভগবানকে সেবা করতে ইচ্ছুক, স্বরূপ-শক্তিই তা'কে কৃপাপূর্বক সেবার অধিকার দেন। উপরোক্ত (২) বা (৩) শ্রেণীর ভক্ত কৃপাপ্রাপ্ত হ'য়ে পরিকরত্বের অধিকার পেয়েছেন ব'লে এঁরা নিম্নশ্রেণীর। অবশ্য ভগবৎ-ধামের সব পরিকরই অপ্রাকৃত, চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বময়।

প্রস্তুত সাধনা-প্রসঙ্গ চতুর্থ শ্রেণীর ভক্তের বেলাতেই প্রযোজ্য।

## ভক্তির প্রকার ভেদ

ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় ভক্তি। উপনিষদে ভক্তির উল্লেখ আছে।[২]

জ্ঞানমার্গে ভগবৎ-প্রাপ্তি অধিকতর ক্লেশকর[৩], কিন্তু ভক্তি মার্গে ভগবানের প্রীতিবিধান করা ক্লেশজনক কার্য নয়।[৪]

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্
হৃষিকেণ হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"[৫]

সকল উপাধি হ'তে মুক্ত হয়ে, তৎপর এবং নির্মল হয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষিকেশের সেবাকে ভক্তি বলা হয়।

"নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি"[৬], নারদের মতে তাঁহাতে (= ভগবানে) সমস্ত কর্মের অর্পণ এবং তাঁহার বিস্মরণে যে পরম ব্যাকুলতা (তাকেই ভক্তি বলে)। মমতাকে ভক্তি বলা হয়েছে, "অনন্য মমতা বিষ্ণৌ"।[৭] "ভক্তিরস্য ভজনম্। তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেন এব অমুষ্মিন মনসঃ কল্পনম্"[৮], ভজনই ভক্তি; ইহকালের এবং পরকালের সুখবাসনা পরিত্যাগ ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে মন সমর্পণই ভজন। "স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে"।[৮ক]

ভক্তিযোগের অধিকারী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"[৯]

(কারও) কৃপায় আমার কথায় যার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়েছে এবং যে অত্যন্ত বিরক্তও নয় অত্যন্ত আসক্তও নয় তার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধ। অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের মাঝামাঝি যিনি আছেন তিনিই ভক্তিসাধনের উপযোগী। নিরাসক্ত অবস্থা আত্যন্তিক ভক্তির অনুকূল নয়, কারণ চিত্তের শান্তি ভক্তিভাবের বিরোধী, ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্বেলতাই ভক্তির জনয়িতা। শ্রেষ্ঠভক্তি অভিলাষশূন্য। তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হ'ন যিনি সত্ত্বকেও জয় করেছেন নিরপেক্ষতা অর্থাৎ প্রত্যাশাহীনতার দ্বারা।[১০] সর্বত্র তাঁকে দর্শনই গোবিন্দে একান্ত ভক্তি[১১]।

যে ভক্তি জ্ঞান বা কর্মের সহিত মিশ্রিত তা'কে "জ্ঞানমিশ্রা" বা "কর্মমিশ্রা" ভক্তি বলে। রামানুজের মতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় ভক্তি, ভক্তির উৎপত্তিতে জ্ঞান ও কর্মের সহযোগিতা আছে। গৌড়ীয় মতে মিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠা ভক্তি নয়, গৌণীভক্তি।

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"[১২]

অন্য অভিলাষ-বিহীন, জ্ঞান কর্মাদির সংস্পর্শহীন, কৃষ্ণপ্রীতির

অনুকূল যে অনুশীলন তা-ই উত্তমা ভক্তি। অতএব উত্তমা ভক্তিতে শুধু থাকে কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে সেবা-বাসনা, স্বীয় সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার স্থান নাই। এমন ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তিও বলা হয়। এখানে কর্ম অর্থে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান-অনুরূপ কর্ম অভিপ্রেত, শুভকর্মও কৃষ্ণভক্তির বাধক, "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম / সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম"[১৩]; কিন্তু ভগবানের পরিচর্যাদি "কর্মের" অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরোক্ত রূপ গোস্বামীর শ্লোকের টীকায় জীব গোস্বামী "জ্ঞান" প্রসঙ্গে লিখেছেন যে এখানে জ্ঞান অর্থে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বুঝায় ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান বুঝায় না, কারণ ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু ভাগবতে[১৪] বলা হয়েছে যে ভক্তের ভগবান-সম্বন্ধে জ্ঞানবাসনা নাই তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন[১৫] গোপীরা কৃষ্ণকে পরম কান্ত ব'লে জানতেন, ব্রহ্ম ব'লে জানতেন না, তা হলে তাঁদের সংসার-নিবৃত্তি কি ক'রে হ'ল। শুকের উত্তর সংক্ষিপ্ত ও সারবান, তিনি বললেন শিশুপাল যদি শত্রুতা ক'রে মুক্তিলাভ ক'রে থাকে তা হ'লে গোপীরা করবে না কেন। বলা হয়েছে কৃষ্ণের স্বরূপ-অনভিজ্ঞা গোপীরা কৃষ্ণকে জারবুদ্ধিতে কামনা করেও ব্রহ্মলাভ করেছিল।[১৬] অর্থাৎ কৃষ্ণভজনায় অনুরাগ বিরাগ যে কোনও তীব্র চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন আছে, জ্ঞানের বা বাহ্য-বিচারের প্রয়োজন নাই। "যারা আমার প্রকার বা স্বরূপ জেনে বা না জেনে আমাকে অনন্যাভক্তিতে ভজন করে তারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত"[১৭]।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বিচারহীন প্রশ্নহীন অন্ধভক্তি, যখন ভগবান সম্বন্ধে কিছুই জানবার ইচ্ছা নাই, শুধুই তাঁকে পাবার ইচ্ছা। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি চৈতন্যের অনুমোদিত। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, যে অর্থোপলব্ধি না করেই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় শুকবৎ পাঠ করত এবং রথারূঢ় অর্জুনকে কৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন এই চিত্র কল্পনা ক'রে ভক্তিভাবের আনন্দ পেত। চৈতন্য বললেন শুধু এমন জনেরই গীতাপাঠে অধিকার আছে[১৮]।

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।"[১৯]

যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করেছেন এবং আমাতে ভক্তিযুক্ত, এতাদৃশ (ভক্তি-) যোগীর পক্ষে ইহলোকে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ
যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।"[২০]

হে অজিত! যাঁরা আপনাকে জানবার প্রয়াস না ক'রে ভক্তগণের

নিকটে থেকে তাঁদের মুখে আপনার কথা শ্রবণ ক'রে এবং কায়মনোবাক্যে তার প্রভাবেই জীবন ধারণ করেন, প্রায়শঃ তাঁরাই আপনাকে জয় করেন।

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথাস্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌।"২১

হে বিভো! যা'রা সর্বমঙ্গলাধার ভক্তিসাধনে অনাদর দেখিয়ে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের আশায় (সাধনের) ক্লেশ স্বীকার করে, তাদের কেবল ক্লেশস্বীকারমাত্র সার হয়, তুষে আঘাত করলে যেমন (তণ্ডুলপ্রাপ্তি) হয় না।

"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ
যত্র সন্তি দ্রবচ্ছিত্তকম্পাশ্রু পুলকোদ্গমাঃ।"২২

উপনিষদ শ্রবণও হরিকথামৃত হ'তে অনেক দূরে, যে (হরিকথা শ্রবণে) চিত্ত দ্রব হয় এবং অশ্রুকম্পপুলকাদির উদ্ভব হয়।

"যোগী সন্ন্যাসী জ্ঞানী অন্য দেবে পূজ কেনি
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম কর্ম দুঃখ সুখ যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥"২৩

"জৈমিনি, সুগত (বুদ্ধ), নাস্তিক, নগ্ন (মহাবীর), কপিল ও অক্ষপাদ (গৌতম)—এই ছয় জন হেতুবাদী, যেসকল নরাধম এদের মতানুসারে চলে তারাও হেতুবাদী। অতএব তাদেরকে মন্ত্রদান করবে না।"২৪ অতএব বিচারলব্ধ জ্ঞান পরিত্যজ্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য উত্তমা ভক্তিকে স্থানে স্থানে অভিহিত করেছেন শুদ্ধা, কেবলা, অনন্যা, আত্যন্তিক ব'লে—বিভিন্ন দৃষ্টির বা রুচির আনুগত্যে; আসলে এদের মধ্যে প্রভেদ সামান্য, মূলতত্ত্ব এই যে এই ভক্তি অহৈতুক, অকাম, বাসনাহীন। ভাগবতের নির্গুণাভক্তি প্রকারে অনুরূপ।

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্‌।"২৫

কৈবল্যজ্ঞান বা ব্রহ্মবিষয়ক স্থির জ্ঞান সাত্ত্বিক, বৈকল্পিক অর্থাৎ দুটি সম্ভাবনার মধ্যে বিচারদ্বারা নিরূপণ-যোগ্য জ্ঞান রাজস, প্রাকৃত জ্ঞান অর্থাৎ যেখানে বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া নাই এমন instinctive জ্ঞান তামস এবং মদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ ব'লে খ্যাত। নেতিবাচক বিচারে দাঁড়ালো এই যে নির্গুণ জ্ঞান নির্জ্ঞানের সমান। নির্গুণ ভক্তি জ্ঞানশূন্যা ভক্তি।

"তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্‌
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ।"২৬

এই নরদেহ লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভূত গুণসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে বিচক্ষণ লোক আমাকে ভজনা করুক। অতএব শুদ্ধাভক্তি ও নির্গুণ ভক্তি সমার্থক[২৭]।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উত্তমা ভক্তি হ'তে নিকৃষ্ট, কারণ তত্ত্বালোচনায় অধিক মনঃসংযোগ করলে ভজনের চেয়ে তত্ত্বের প্রতি ভক্ত অধিকতর আকৃষ্ট হ'তে পারে, তা'তে ভক্তের চিত্তবিক্ষেপ হ'বার সম্ভাবনা। ভজনের জন্য ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের সহিত সেব্য-সেবক ভাবই যথেষ্ট তার অধিক জ্ঞানের আবশ্যক নাই, অবিদ্যার নিবৃত্তির সঙ্গে বিদ্যার নিবৃত্তির প্রয়োজন, ভগবানকে নির্বিচারে গ্রহণ করাই ভক্তিশাস্ত্রে বিধি।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ঃ

"জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ।
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে
সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা।"
"রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসমন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।"[২৮]

ভক্তিমার্গে প্রবেশের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ঈষৎ উপযোগিতা আছে প্রথম দিকে; এদেরকে ভক্তির অঙ্গ মনে করা উচিৎ নয়। সাধুগণের মতে এই দুটির কারণে ক্রমশঃ চিত্তকাঠিন্য ঘটে, অতএব সুকুমারস্বভাবা ভক্তিই (ভক্তিমার্গে প্রবেশের) হেতু (বা দ্বার স্বরূপ)। হরিভজনে যে জনের রুচি হয়েছে, তাঁর বিষয়াশক্তি গুরুতর হ'লেও প্রায়শঃ বিলীন হ'য়ে যায়। অনাসক্ত চিত্তে বিষয়ে যথাবহিত হ'য়ে (অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠান হেতু যেটুকু সঙ্গতির প্রয়োজন তার ব্যবস্থা ক'রে) কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে আগ্রহ তাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে।

যুক্তবৈরাগ্য তুলনীয় গীতার একটি শ্লোকের[২৯] সঙ্গে, যাকে শঙ্করাচার্য বলেছেন গীতার সারভূতার্থ। শুধু কৃষ্ণের জন্য কর্ম ছাড়া অন্য কর্মের বিধান নাই, কৃষ্ণ ছাড়া ভক্তের আর কোনও সঙ্গ বা আসক্তি নাই। যুক্তবৈরাগ্যের বিপরীত শুষ্কবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য।

উপরোক্ত রূপ গোস্বামীর শ্লোকের টীকায় জীব গোস্বামী বলেছেন "তত্তদ্‌ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেকত্বাচ্চ"[৩০], ভগবৎ-তত্ত্বাদির সম্বন্ধে জ্ঞানালোচনায় ভক্তির বিঘ্ন হয়। ভাগবতে[৩১] আছে শুদ্ধসত্ত্ব দেবতা ও অমলাত্মা ঋষিগণের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত দুর্লভ, কোটি কোটি মুক্ত সিদ্ধগণের মধ্যেও নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অতি দুর্লভ, বোধ হয় তাঁরা সম্পূর্ণ নির্জ্ঞান হ'তে পারেন নি ব'লে

ভক্তির উদয় হয় নি।

জ্ঞান এবং বৈরাগ্য ভক্তিসাধনার জন্য অনুপযোগী কারণ চিত্তকাঠিন্য সৃষ্টি করে, ভক্তিভাবের জন্য আবশ্যক এমন বিদ্রুত চিত্ত যা সহজে রসাবিষ্ট হ'তে পারে, কারণ কৃষ্ণভক্তি রসপ্রধান। যেখানে শ্রেষ্ঠ ভক্তি রাগানুগা, যেখানে কৃষ্ণের বিলাস-লীলার অনুধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধনা, সেখানে বৈরাগ্যের স্বীকৃতীতে বচনবিরোধ হয়। সেজন্য কথিত হয়েছে শুধু প্রথম 'অবস্থায় এই অবাঞ্ছিত শুষ্ক জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তিমার্গে প্রবেশের সহায়। অনুমান করা যেতে পারে এই কাঠিন্যগুণই সে অবস্থায় সহায়ক, কোনও কিছুকে পরিহার করবার কর্তন করবার জন্য কঠিন বস্তু আবশ্যক। যা-কিছু পূর্বসংস্কার ভক্তির অন্তরায়—শুষ্কতর্কাদি বিরূপ মনোভাব, নাস্তিক্য, কর্ম্মজনিত ফলের ভোগবাসনা—সে সমস্ত দূর হ'লে তবেই ভক্তি-রোপণের ভুমি প্রস্তুত হ'তে পারে, তার পরে উৎখাতের জন্য কঠিন খনিত্রের পরিবর্তে ফলানোর জন্য জলসেচনের প্রয়োজন। এ কারণে প্রাথমিক আংশিক উপযোগিতা থাকলেও জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নয়।

বলা হয়েছে ভক্তিই ভক্তিমার্গে প্রবেশের হেতু।[৩২] প্রথমটি সাধনভক্তি, দ্বিতীয় ভক্তি পরমলভ্য পুরুষার্থ, আমরা পরে দেখব। একদিকে কৃষ্ণভক্তি লীলানুধাবন হেতু বিলাস-বিষয়ক, তারজন্য চাই প্রেমার্দ্র হৃদয়, কোনও প্রকারের চিত্তকঠোরতা এমন হৃদয়ের পরিপন্থি; অন্য দিকে ভগবানে উদ্দিষ্ট নয় এমন যেকোনও বিষয়ে আসক্তি শুদ্ধভক্তির অন্তরায়; তাই এঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিষয়াসক্তি বৈরাগ্যের দ্বারা দূর হ'তে পারে না, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই হ'তে পারে। এবং এতদর্থে প্রয়োজন বৈরাগ্যের নয় শরণাগতির। যুক্তবৈরাগ্যের ফলে শরণাগত চিত্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিলাস-বিষয়ে অবগাহিত হ'য়েও অনাসক্ত থাকতে পারে। সর্ব বিষয়ে-অনাসক্তি-রূপ শুষ্ক-বৈরাগ্যের পরিবর্তে একমাত্র-কৃষ্ণবিষয়ে-আগ্রহান্বিত যুক্তবৈরাগ্য শ্রেয়।

"জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ"।[৩৩] যম নিয়ম শৌচাদিও ভক্তির অঙ্গ নয়, ভক্তির ফলে আপনিই উপস্থিত হয়।[৩৪] চৈতন্য নিজের জীবনে শমদমাদির চর্যা করেন নি, প্রবল ভক্তিবোধে এগুলি আপনিই উপস্থিত হয়েছিল। শরীর ও মন পরস্পরের উপরে প্রতিক্রয়াশীল—এই বিষয়টি আমাদের দেশের প্রাচীনরা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমন ভাবে সমসাময়িক কোনও দেশের লোক করেছিলেন কিনা সন্দেহ। মনকে নিয়মাধীন করবার জন্য আগে শরীরকে বশবর্তী করবার বিধি ছিল, সেজন্য প্রথমে শারীরিক শৃঙ্খলা-বিধান পালন করতে হ'ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এ সবের প্রয়োজন মানেন নি, মন ভক্তিরসময় হ'লে দেহও আপনা থেকেই রসাধিক্য হেতু নমনীয় হ'য়ে নিরুৎসাহ হবে এই হয়ত মনে করেছেন।

ভক্তিমার্গে প্রবেশের পূর্বে কামক্রোধাদি রিপু দমনের আবশ্যক নাই, ভক্তির ফলে মনোনিরোধ আপনিই হবে[৩৫]। বৈরাগ্য ও হেতু-রহিত-জ্ঞানের উদ্ভব স্বতঃই হবে[৩৬]। বৈষ্ণব বলেন যোগসাধন দ্বারা প্রকৃতিকে জয় ক'রে পরমপুরুষকে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার, সেবা ভক্তি দ্বারা তাঁকে অনায়াসে পাওয়া যায়[৩৭]। সুলভে পাওয়া গেলেই তা'কে লাভ মনে করা হয়।

জ্ঞান ও বৈরাগ্যের যেমন শুধু প্রাথমিক সার্থকতা আছে কর্মেরও তদ্রূপ।

"নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ
জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্।"[৩৮]

আমাতে আসক্ত চিত্ত (ভক্ত) নিত্যনৈমিত্তিক নিষ্কাম কর্মসকল আচরণ করবেন কিন্তু কাম্য কর্ম ত্যাগ করবেন। তত্ত্ববিচারে সম্যক প্রবৃত্ত হ'লে কোনও কর্মেরই আদর করবেন না।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।"[৩৯]

ভগবানের পরিতোষনিমিত্ত যে কর্ম এখানে কৃত হয় ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞান তার অধীন। এই কর্ম ততদিন করণীয় যতদিন না বিষয় বৈরাগ্য জন্মে বা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জন্মে—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত না নির্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।[৪০]"

এখানে কর্ম অর্থে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভিপ্রেত।[৪১] অতএব ভক্তির উদয় হ'লে কর্মের সফলতা নাই। চৈতন্যও কর্মের নিন্দা করেছেন। প্রেমভক্তি উৎপাদনে কর্ম কোনও সহায়তা করে না—

"কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে
কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।"[৪২]
"এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়
সর্বকর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।"[৪৩]

সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্মই নিন্দনীয়[৪৪]। উত্তমা ভক্তিতে কর্মফল ভগবানে অর্পণ ক'রে কর্ম করবার অবকাশ নাই।[৪৫] ভাগবত মতে ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ ক'রে যিনি অর্চনা করেন তিনি সাত্ত্বিক[৪৬], কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভক্তি নির্গুণ বা আত্যন্তিক, যার সাহায্যে ভক্ত প্রাকৃত গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন।[৪৭] কিন্তু যদি কেউ ব্রহ্মে নিশ্চল ভাবে মনকে ধারণ ক'রে কর্মত্যাগ না করতে পারেন তাঁর পক্ষে ভগবানে অর্পণ ক'রে সর্বকর্ম করা বিহিত।[৪৮]

যাঁরা সকাম ভাবে উপাসনা করেন ঈশ্বর তাঁদেরকে পার্থিব বিষয় দান করেন কিন্তু পরমার্থ দেন না, তাঁর পাদপদ্ম লাভ করেন শুধু নিষ্কাম ভক্ত।[৪৯]

যে ভক্তিতে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত ভক্তের অন্য বাসনা নাই এবং যা জ্ঞানকর্মাদিরিক্ত এমন অপ্রাপ্তিসম্ভবা ভক্তিই শুদ্ধা এবং শ্রেষ্ঠা; এবং সেই কারণেই ভগবানের ঐশ্বর্যরিক্ত রূপ-কল্পনাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কারণ তা হ'লে পাবার সম্ভাবনা কিছু থাকে না শুধু সম্প্রীতি ছাড়া। গীতায় প্রতিপাদিত ভক্তি শুদ্ধাভক্তি নয় কারণ সেখানে কর্মসাধনার প্রাপ্য সন্তোষ আছে, কর্মসফলতার লভ্য তৃপ্তি আছে, যদিও কর্মফল কর্মকর্তার ভোগ্য নয়। গীতার বহুখ্যাত বাক্য "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন", এই বাক্যে গরিষ্ঠ শব্দ "তে", তোমার কেবলমাত্র কর্মে অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই, তোমার কৃত কর্মের ফলে অন্যের অধিকার আছে। অতএব কর্ম যাতে সফলরূপে সম্পন্ন হয় সে দায়িত্ব তোমার, এবং তৎ লব্ধ আনন্দও তোমার। মনু সত্যই বলেছেন[৫১] পৃথিবীতে এমন কোনও কর্ম নাই যা মানুষ প্রত্যাশাহীন ভাবে করতে পারে; কর্মসফলতা ও তজ্জনিত আনন্দও এমন প্রত্যাশা যা কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক কর্মচারী কর্মযোগী, তাঁদের পরিশ্রমের ফল পায় দারাপুত্রপরিবার, পায় পৌরজন, কর্মকর্তার ভাগে সামান্যই থাকে, থাকে শুধু কর্মসফলতার ও দায়িত্ব বহনের সন্তুষ্টি। কিন্তু এ আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নয়।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরম সুখম্"[৫২] এমন উক্তি তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা কর্মে বিশ্বাসী নয়; নিরলসতার প্রধান উৎস ও উদ্দীপন আশা, আশা না থাকলে কর্মের উদ্যম তিরোহিত হয়।

আমরা দেখেছি জ্ঞান-কর্ম-বিনির্মুক্ত ভক্তিকে বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে যদিও প্রভেদ সামান্য। রূপ গোস্বামী বলেছেন[৫৩] মাহাত্ম্যজ্ঞানশূন্য ভক্তি কেবলাভক্তি এবং পঞ্চরাত্রের বচন উদ্ধৃত করেছেন যার মর্ম হরির প্রতি ফলানুসন্ধান-রহিত ও প্রেমপ্লুত অবিচ্ছিন্ন মনোগতিসম্পন্ন যে ভক্তি তা'তে বিষ্ণু বশ হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন[৫৪] ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন ভক্তি কেবলাভক্তি। পুরুষোত্তমের প্রতি যে ভক্তি ভগবানের গুণ-শ্রবণাদি হ'তে উন্মেষিত, অবিচ্ছিন্ন, অহৈতুকী (=ফলানুসন্ধান-বিহীন), জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধান-রহিত, যেখানে সেবা ছাড়া কোনও কামনা নাই, ইহলোকের সুখসাচ্ছন্দ্য বা পরলোকের স্বর্গসুখের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, এমন কি সালোক্যাদি মোক্ষের প্রতিও নয়, এমন ভক্তি নির্গুণা ভক্তি[৫৫]। মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। যখন রজঃ ও তমঃ প্রাধান্য লাভ করে তখন মায়ার প্রভাবকে বলে অবিদ্যা, সত্ত্বভাবের প্রাধান্য থাকলে হয় বিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের নিবৃত্তি হ'লে তবে ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি সুতরাং মায়িক নয়, অতএব গুণরহিত বা গুণাতীত বা নির্গুণ। "নির্গুণ"-এর দ্যোতক অর্থ এই—যে-শ্রদ্ধাভক্তি

কোনও গুণময় জ্ঞান বা কর্মসংস্কার থেকে উদ্ভূত নয়, জ্ঞানকর্মবিনির্মুক্ত। কর্মসন্ন্যাসের ন্যায় জ্ঞানবর্জনেরও প্রয়োজন আছে। এমন ভক্তিযোগ উপায় মাত্র নয় উপেয়ও; সিদ্ধিলাভ করলেও ভক্তি পরিত্যক্ত হয় না, সিদ্ধাবস্থাতেও ভগবানের প্রেমসেবা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে।' কৃষ্ণপরিকরদের শুদ্ধাভক্তি দুই প্রকার, ঐশ্বর্য-মিশ্রিত ভক্তির ক্ষেত্র দ্বারকা ও মথুরা, ঐশ্বর্য-জ্ঞান-শূন্যা কেবলা-ভক্তির ক্ষেত্র ব্রজধাম।

## সাধন-ভক্তি ঃ বৈধী-ভক্তি

ভক্তি দ্বিবিধ, সাধন-রূপা ও সাধ্য-রূপা।[৫৬] সাধনার জন্য যে ভক্তির আবশ্যক হয় তা'কে বলা হয় সাধন-ভক্তি। যে সাধনার অনুষ্ঠান দ্বারা রতির উদয় হয় তা'কে সাধন-ভক্তি বলে।[৫৭] এটি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। বৈধীভক্তিতে ভগবৎ-অনুরাগের চেয়ে শাস্ত্র-শাসন-বিধির আনুগত্যই প্রবল।[৫৮] এক শ্রেণীর সাধক সমাহিত চিত্তে ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন ঔচিত্য-বুদ্ধিতে, শাস্ত্রবিধিনিষেধের মান্যতায়, সংসার-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের জন্য; শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে নির্দিষ্ট পথে এঁদের কৃষ্ণ-সাধনাকে বলে বৈধী-ভক্তি। এঁদের শান্ত-ভক্ত বা জ্ঞানী-ভক্তও বলা হয়। বৈধীমার্গের ভক্তি শমপ্রধান মমতাহীন। এই ভক্তি নবধা—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।[৫৯] শ্রীধরস্বামীর মতে সখ্য=ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন। নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তন বা নামসঙ্কীর্তন।[৬০] জীবগোস্বামী এই নয়টির সঙ্গে জুড়েছেন আরও দুইটি—শরণাপত্তি ও গুরুসেবা।[৬১] বৈধীভক্তের কাম্য বিষ্ণুলোকে সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি।

"ঐশ্বর্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা।"[৬২]

যেসকল বিধিনিষেধের উপরে বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত তার দু-একটির আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্মের আদিষ্ট আচরণের বিরোধী।[৬৩] স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাজ্য, স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গত্যাগ উপদিষ্ট[৬৪], অথচ সন্ন্যাসের বিধান নাই, অকিঞ্চন হবে এই উপদেশ, অকিঞ্চন অর্থে সম্বলহীন, যার কিছুই নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিমত "নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেও আসক্তি-যুক্ত হইবে না। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতি, জ্ঞানমতি এবং বৈরাগ্যমতিও হয় অথবা উন্মাদরোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহার নিকটবর্তী হইবে না"।[৬৫] বর্ণাশ্রমে থাকতে হলে কতকগুলি নিয়মপালন আবশ্যক যেমন সন্ধ্যা-গায়ত্রী, বিভিন্ন পালপার্বণের অনুষ্ঠান, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের নিয়ম-

মান্যতা; সেসব আচার বৈষ্ণব সাধনার—যথা একাদশীর উপবাস ইত্যাদির—প্রতিকূল হ'তে পারে, অতএব এ সব আচার বর্জনীয়।[৬৬] জ্ঞানার্জনের আবশ্যক নাই সুতরাং ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সার্থকতা নাই। বহু গ্রন্থকলার অভ্যাস ও ব্যাখ্যা বা বিবাদ পরিবর্জনীয়।[৬৭] "তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"[৬৮] যাতে হরির পরিতোষ হয় তাই কর্ম এবং যা দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে তাই বিদ্যা।"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর"।[৬৯]

তুলনায় দেখা যায় ভাগবতে অনুজ্ঞা আছে বর্ণাশ্রমকুলাচার পালনের এবং আত্মার্থে স্ত্রীপুত্রকে সমদৃষ্টিতে উদাসীন ভাবে দেখবার।[৭০] ভাগবতে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগের উপদেশ আছে।[৭১]

সৎসঙ্গ করবার উপদেশ আছে। সৎ=যিনি আছেন বা যিনি সত্য, অর্থাৎ পরমাত্মা বা কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণসঙ্গ এ জগতে সম্ভব নয় সুতরাং সৎসঙ্গের অর্থ সাধন-ভজনের অনুষ্ঠান যথা পূজা অর্চনা কীর্তন ইত্যাদি এবং তৎ-সম্বন্ধীয় আচার পালন। সৎসঙ্গ অর্থে সাধুসঙ্গও হয়। ভাগবত মতে[৭২] প্রতিমাপূজা ততদিন পর্যন্তই ক্রিয় যতদিন না সর্বপ্রাণীতে ঈশ্বরের অবস্থিতি সাধক উপলব্ধি করতে পারে। এর বিরোধী মত এই যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা কখনই ত্যাজ্য নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শেষের মতটিই অবলম্বন করেছেন।[৭৩]

সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ নামোচ্চারণ ও নামকীর্তন। অনুচ্চ স্বরে নাম নেওয়াকে নামজপ, নামস্মরণ বলা হয়, এটি একাকী হয়। কীর্তন—উচ্চস্বরে নামের উচ্চারণ। মনে হয় উচ্চস্বরে নামকীর্তন প্রথমে করেন হরিদাস[৭৪]। সঙ্কীর্তন—বহু লোক একত্র মিলিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনকে সঙ্কীর্তন বলে। কিন্তু ব্যবহারে "কীর্তন" ও "সঙ্কীর্তন" শব্দে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। কীর্তন বা সঙ্কীর্তন ত্রিবিধ–নাম, লীলা, ও গুণ কীর্তন।[৭৫] বিধিবদ্ধ ভাবে কীর্তনগান প্রবর্তিত হয় খেতরীর মহোৎসবের পরে। মনে হয় সর্বপ্রথম ব্যাপক-কীর্তন ছিল নামসঙ্কীর্তন–

"হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"[৭৬]

এ কীর্তন হয়েছিল হাততালি দিয়ে, খোল কর্তাল কিছু ছিল না

"নাচো গাও ভক্তসঙ্গে, কর সঙ্কীর্তন
কৃষ্ণনাম উপদেশী তার' সর্বজন।"[৭৭]

কলিতে হরিনাম ছাড়া অন্য গতি নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"[৭৮]

নামস্মরণ বা নামোচ্চারণ যেকোনও সময়ে যেকোনও অবস্থায় বিধেয়। নামোচ্চারণে সংখ্যারক্ষণ আবশ্যিক নয়, যদিও হরিদাস

সংখ্যাগণনা ক'রে হরিনাম করতেন, প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম। নাম এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণের মহিমা বর্ণিত হয়েছে—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
—ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিম্বান্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ।"[৭৯]

তোমার পাদপদ্মধ্যানে এবং ভক্তগণের কথা শুনে দেহধারী (ভক্তের) যে সন্তোষ হয়, সেরূপ আনন্দ তোমার মহিম-স্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও হয়ত হয় না, কালকবলিত স্বর্গাদির ত কথাই নাই।

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"[৮০]

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের হৃদয়ে বাস করি না। আমার ভক্তরা যেখানে (নাম) গান করে সেইখানেই আমি থাকি। অতএব বৈষ্ণব-সেবাও কৃষ্ণসেবার মতই মান্য এবং পালনীয়—

"প্রভু কহে—কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন।"[৮১]
"কেহো বলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়
কেহো বলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।
হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।
আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি পাপনাশ।"[৮২]

কর্মজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে বা দেহ-বিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন করলে কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল পাওয়া যায় না।

সাধন সম্বন্ধে একটি অনন্যসাধারণ বিধান দেখা যায়, "শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চনমার্গস্যাবকশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ"[৮৩], শরণাপত্তি আদি (ভজনাঙ্গের) এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হ'তে পারে ব'লে ভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবিহিত অর্চনামার্গের প্রয়োজন নাই। অবশ্য কেউ যদি দীক্ষা গ্রহণ করে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে চান তা হলে করতে পারেন, কিন্তু তার আবশ্যক নাই কারণ ধ্যান যজ্ঞ অর্চনাদির সমস্ত ফল শুধু কীর্তন করলে পাওয়া যায়।[৮৪] ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের এবং নৃত্যের প্রাধান্য অনেক ধর্মে অনেক সম্প্রদায়ে আছে, মহারাষ্ট্র দেশে অভঙ্গ কীর্তনে করতাল বাজিয়ে নৃত্যের সঙ্গে গান করা হয়, দক্ষিণ দেশে আড়ওয়ারদের গাথা মন্দিরে গাওয়া হয়, মেওলাবী সূফী সম্প্রদায়ে নৃত্যের প্রাধান্য আছে, খৃষ্টানদের উপাসনায় সমবেত কণ্ঠে যে সঙ্গীত হয় তারজন্য দীর্ঘ দিনের তালিম প্রয়োজন। কিন্তু পূজা-উপাসনায় অন্য কোনও অঙ্গ না

থাকলেও শুধু সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান-সিদ্ধি এবং পুণ্যলাভনিশ্চয়ে বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একমাত্র শিখধর্মই সমকক্ষ।

কীর্তনীয়ার যেসব শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে এবং চৈতন্য ও তাঁর ভক্তগণের আচরণে লক্ষিত হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেই আদর্শ—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তঃ উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
-ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"[৮৫]

এইরূপ ব্রতস্বরূপে নিজের প্রিয় হরিনাম-কীর্তনে অনুরাগ উদিত হ'য়ে চিত্ত দ্রবীভূত হ'লে, তিনি লোকাপেক্ষাহীন হ'য়ে উন্মাদের ন্যায় কখনও উচ্চহাস্য, কখনও আক্রোশ, কখনও রোদন, কখনও গান কখনও নৃত্য করেন। "যৎ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি"[৮৬], যার (ভক্তির) উদয় হ'লে মানুষ মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হয়।

আমরা দেখেছি বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্তের আচরণ অনুকরণীয়, কৃষ্ণের আচরণ নয়; এমন কি একমতে শুধু শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই অনুকরণীয়।

একটি মূল্যবান উপদেশ দেখা যায় চৈতন্যচরিতামৃতে[৮৭]
"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।"

মর্কট বৈরাগ্য = মেকি বৈরাগ্য, ভেক ভড়ং, একে ফল্গুবৈরাগ্যও বলে। বৈরাগ্য শুধু লোক-দেখানো যেন না হয়, তার মধ্যে যেন ফাঁকি না থাকে, বাইরে ভেতরে যেন তফাৎ না থাকে। বিষয়-ভোগে বাধা নাই যদি তা'তে আসক্তি না থাকে, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"[৮৮]। অন্তরে নিষ্ঠা এবং বাহিরে সদ্ব্যবহার বৈষ্ণবের কাম্য।

পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে চিরকাল হিন্দু পীড়িত, তার উপরে বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রীরা চাপালেন তার চেয়েও গুরুতর দোষের বোঝা "অপরাধ"। অপরাধ হয় ধর্মবিশ্বাসের বা পূজা-উপাসনা-বিধির বা আচার-অনুষ্ঠানের অ-পালন অবহেলা বা অমান্যতার কারণে। অপরাধ পাপ অপেক্ষা গুরুতর, স্মৃতিনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের পালনে অপরাধ দূরীভূত হয় না। শুধু কৃষ্ণনাম গ্রহণ করলেই পাপ দূর হয়, কিন্তু অপরাধ দূর হয় না।[৮৯] অপরাধ চার প্রকার—সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, ভগবদাপরাধ, নামাপরাধ। নামাপরাধ গুরুতম অপরাধ। অন্য অপরাধে হরিশরণে নিষ্কৃতি

পাওয়া যেতে পারে কিন্তু নামাপরাধে অধঃপতন অনিবার্য।[৯০] তালিকাভুক্ত অপরাধ ছাড়া ভক্ত যদি অন্য কোনও বিকর্ম করেন তা হ'লে হরি তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হ'য়ে সেই কর্ম-জনিত ভোগ নাশ করেন এবং ভক্তকে শাস্তিভোগ করতে হয় না।[৯১]

আত্যন্তিক আগ্রহের ফলে ভজনকারী ভগবানকে আত্মভূত এবং নিজেকে তন্ময় অর্থাৎ ভগবৎ রূপে চিন্তা করবে এমন বিধান ভাগবতে আছে।[৯২] ভজনকালে ভগবানের সহিত এই অভিন্নতা কল্পনাকে বলা হয় অহংগ্রহোপাসনা, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিমার্গে নিষিদ্ধ।

গুরু তিন রকম, শ্রবণগুরু যিনি ভক্তিশাস্ত্র প'ড়ে শোনান, শিক্ষাগুরু যিনি ভজনবিধি শিক্ষা দেন, দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু যিনি উপাসনার মন্ত্র জানান। সাধারণতঃ দীক্ষাগুরু একজন মাত্র, কিন্তু এক মন্ত্র ত্যাগ ক'রে অন্য মন্ত্রে দ্বিতীয় গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। অব্রাহ্মণ গুরু হ'তে পারেন, মন্ত্রদীক্ষা দিতে পারেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"[৯৩]

কিন্তু হরিভক্তিবিলাসের মত এই যে অব্রাহ্মণ দীক্ষা দিতে পারেন শুধু নিজের বর্ণের বা নিম্নবর্ণের শিষ্যকে, অর্থাৎ দীক্ষা অনুলোমক্রমে হ'তে পারে প্রতিলোমক্রমে নয়।[৯৪] কার্য্যতঃ দেখা যায় নরোত্তমদাস কায়স্থ হ'লেও তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, শ্রীখণ্ডের নরহরি বৈদ্য ও রঘুনন্দন সরকারের ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল।

এক দিকে বলা হয়েছে গুরু ভগবানতুল্য, অন্য দিকে বিধান আছে গর্হিত আচরণে রত, কার্যাকার্যজ্ঞানহীন, উৎপথগামী গুরু পরিত্যজ্য[৯৫], যে গুরু অন্যায় বলেন আর যে শিষ্য তা শোনেন তাঁদের উভয়েই নরক-ভোগ করেন; এ দুইয়ের সামঞ্জস্য নাই। জাতিবর্ণ স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী, "কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।"[৯৬] অদীক্ষিত ব্যক্তিরও নামকীর্তনাদিতে অধিকার আছে, এ সবের পূর্ণফল তিনি পেতে পারেন। কিন্তু রাগানুগামার্গে সাধনের জন্য দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। ভাগবত মতে কৃষ্ণ-উপদেশ শ্রবণের অধিকার স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রের আছে।[৯৭]

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্‌বহূন্
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।"[৯৮]

প্রলোভন দ্বারা বা বলপূর্বক কা'কেও শিষ্য করবে না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস করবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করবে না, এবং কখনও (মঠাদি) আরম্ভ করবে না। ভক্তির সহায়ক না হ'লে সর্ববিধ উদ্যমই ভক্তিসাধকের পক্ষে পরিত্যজ্য। গীতাতেও[৯৯] "সর্বারম্ভপরিত্যাগ"—এর উপদেশ আছে।

"ভূতেষু মদ্ভাবলয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।"[১০০]

সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগের বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা। সর্বপ্রাণীকে আপনার সমান মনে করাকে বলা হয় "আত্মৌপম্য"।[১০১]

চৈতন্যের আদেশ (চৈতন্য রচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক)—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"[১০২]

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে স্বয়ং অমানী হয়ে অপরকে সম্মান দিয়ে সর্বদা হরিকীর্তন করবে। তুলনীয় "নিরস্তমানেন চ মানদেন"[১০৩] "অমানী মানদঃ"।[১০৪]

"সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"[১০৫]

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"[১০৬]

"অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"[১০৭]

নিন্দাবাক্য সহ্য করবে, কারও অবমাননা করবে না।[১০৮]

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।"[১০৯]

বৈষ্ণবের নির্ধারিত কর্তব্যকে এক কথায় বলা হয় "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন", কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীবকে দয়া করার আদেশ নাই, সম্মান করার আদেশ।

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্তা না কহিবে
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।"[১১০]

সাধন ভক্তির আরও কয়েকটি অঙ্গ একাদশীর উপবাস, বহু গ্রন্থের ও বহু কলার চর্চা বর্জন, মূর্তির পূজা অর্চনা জপ, ভাগবত পাঠ, সাধুসঙ্গ, "যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্ট"[১১১], অর্থাৎ অযত্নতঃ যা উপস্থিত হয় তা'তেই সন্তুষ্ট থাকা, যাবৎ-অর্থ-প্রতিগ্রহ[১১২], অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য সামন্যতম প্রয়োজনের অধিক কিছু গ্রহণ না করা, অন্য দেবতার নিন্দা নিষেধ। ব্যবহারার্থ বস্তু যদি অন্য কোনও প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহ'লে তারজন্য পরিশ্রম করা বৃথা।[১১৩]

সাধনের চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচটি—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধায় মূর্তিসেবা।[১১৪]

ভগবান আপনার ব'লে যাঁদের স্বীকার করেছেন তাঁরা "তদীয়" পদবাচ্য—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত—এই চারটি।[১১৫]

ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দুই রকম—বহিঃসাক্ষাৎকার এবং অন্তর-সাক্ষাৎকার, এর মধ্যে প্রথমটি শ্রেষ্ঠ।[১১৬]

ভক্তের শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিভাজন ভাগবতে আছে, ভক্তির তারতম্য ও প্রসার অনুসারে।[১১৭] উত্তম ভক্তের কাছে কৃষ্ণই একমাত্র সত্ত্বা, জগৎ কৃষ্ণময়, এমন আদর্শবাদীর জাগতিক ব্যবহার সুষম না হওয়াই সম্ভব, এমন লোক সংসারের বাইরে। মধ্যম ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়কে কৃপা, দ্বেষকারীকে উপেক্ষা করেন, বলা যেতে পারে তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তিত্ববান সংসারী, তিনি ভক্ত মূঢ় প্রভৃতিতে প্রভেদ দেখতে পান এবং আচরণে প্রভেদ করেন, ভক্তের প্রতি ভক্তি নয় মৈত্রী, তন্নিম্নে মূঢ়ের সহিত মৈত্রী নয় কৃপা, অধমকে কৃপা নয় অবজ্ঞা। প্রাকৃত বা সাধারণ ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত হরিকে পূজা করেন কিন্তু হরিভক্তকে পূজা করেন না। ইনি আরও বেশী প্রভেদবাদী, ভক্তকে মৈত্রীও করেন না, করেন অবহেলা। মূঢ় ও বিদ্বেষী তাঁর দৃষ্টির বাইরে। এই বিভাজন হয়েছে ব্যবহারিক বিভেদগত প্রয়োজনে। কৃষ্ণদাস বিভাজন করেছেন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার দৃঢ়তার ভিত্তিতে।[১১৮] উত্তম অধিকারীর শ্রদ্ধা যুক্তি-ভিত্তিক তর্কসহ; মধ্যম অধিকারীর শ্রদ্ধা অন্ধবিশ্বাস-ভিত্তিক, মূক অথচ দৃঢ়; কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা অভেদ্য অনড় নয়, যাকে বলা হয়েছে "কোমল শ্রদ্ধা"

## সাধন-ভক্তি ঃ রাগানুগা

সাধন-ভক্তির দ্বিতীয় প্রকার রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগামার্গের সাধনেও শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন্ ক'রে নিজমতে সাধনা করবার অনুমতি নাই[১১৯], এখানেও শ্রবণ-কীর্তনাদি বাহ্যসাধন অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক ভাবে, কিন্তু এর প্রধান অঙ্গ হল অনুরাগ-ভিত্তিক অন্তর্মনা সাধন, সানস-চিন্তায় কৃষ্ণের সেবা, এটি প্রেমভক্তি লাভের সোপান।

"শ্রবণ-কীর্তন-হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা
সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থসীমা।"[১২০]

শান্ত ভক্ত কৃষ্ণে মমতাহীন, তিনি লাভ করেন কৃষ্ণনিষ্ঠাজনিত আনন্দ, রাগানুগামার্গের সাধক পান মমত্বপূর্ণ কৃষ্ণসেবানন্দ। কৃষ্ণ-পরিকর ব্রজবাসীরা যে মমত্ব-বোধে কৃষ্ণানুশীলন করেছিলেন সেই আপন-করা ভাবে বিভাবিত হবার লোভ রাগানুগামার্গের সাধকের; কৃষ্ণপরিকর সাক্ষাতে করেছিলেন, সাধক ভক্ত করেন কল্পনায়।

সেবার উপযোগী নির্বাচিত কোনও একটি রসে, অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এদের কোনও একটির অনুশীলনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা ও লীলা-স্মরণ এর মুখ্য বিষয়। কৃষ্ণের অনাদি পরিকররা—যেমন নন্দ যশাদাদি—দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবে কৃষ্ণ-সেবা করেন, এঁদের ভক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা, এ ভক্তি সাধনালব্ধ নয়। একে স্বারসিকী অনুরাগও বলে[১২১], যার অর্থ স্বাভাবিক, বাস্তব জীবনে যেমনটি দেখা যায়। রাগাত্মিকা ভক্তিতে

রাধাভাব ও রাধার কান্তি অঙ্গীকার করেছেন, এ সম্বন্ধে তাত্ত্বিকদের মধ্যে দ্বিমত নাই। চৈতন্যকে কৃষ্ণের সমপর্যায়ে মাহাত্ম্য দেওয়া হয়েছে অথচ তাঁর গাত্রবর্ণ বিষ্ণু রাম বা কৃষ্ণের মত শ্যামবর্ণ নয় তিনি গৌরাঙ্গ, অতএব নির্ধারিত হ'ল যে তিনি রাধাভাবান্বিত কৃষ্ণ-অবতার এবং সমর্থনে প্রযুক্ত হল বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে প্রথম নির্ধারণের কৃতিত্ব রামানন্দ রায়ের, যদিও তিনি এ তত্ত্ব সর্বসমক্ষে প্রচার করেছেন ব'লে জানা নাই। তিনিই প্রথম বললেন যে রাধার প্রেমভাব এবং দেহকান্তি গ্রহণ ক'রে বিশেষ রস-আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥
× × × ×
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥
× × × ×
তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥"

তারপরে চৈতন্যের উক্তি ঃ

"তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন
তবে নিজ মাধুর্যরস করি আস্বাদন ॥"[১৮০]

চৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার শুধু যে এই তত্ত্ব রামানন্দ আবিষ্কার করলেন তা-ই নয়, চৈতন্যের আবির্ভাবের মুখ্য ও গৌণ কারণ প্রতিপাদন করলেন, যা বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃত। মুখ্য কারণ নিজ-রস-আস্বাদন, আনুষঙ্গিক কারণ ভক্তিপ্রেম বিতরণ। রামানন্দের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল চৈতন্যের দক্ষিণদেশে যাত্রার সময়ে, তার আগে তিনি অল্পদিন মাত্র নীলাচলে ছিলেন, সেখানে এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করবার সুযোগ তখন পর্যন্ত আর কারও হয় নি।

গৌড়ীয় ধর্মে মাধুর্যাশ্রিত প্রেমের এমনই প্রভাব যে অন্য সকলে যেমন কৃষ্ণের মাধুর্যের প্রতি লালায়িত, কৃষ্ণ নিজেও সেইরূপ লালায়িত নিজের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার পরাকাষ্ঠা এখানে। "নিজ-রস-আস্বাদনের" নির্ণয়-সূত্রে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাসঙ্গিক ভূমিকা ক'রে রূপগোস্বামীর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন; কৃষ্ণের উক্তি —

"দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥"[১৮১]

মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত নিজের মাধুর্য দেখে কৃষ্ণ বলছেন—

"অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেব মাধূর্যপূরঃ
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ।"[১৮২]

অননুভূতপূর্ব চমৎকার-জনক এবং শ্রেষ্ঠ আমার মাধুর্যরাশি প্রকাশিত হচ্ছে, যা দেখে আমিও লুব্ধচিত্ত হয়ে রাধিকার মত সোৎসুক-সম্ভোগে ইচ্ছুক। পুনরায়

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বামধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ।"[১৮৩]

যে কৌতুকশালী পুরুষ প্রণয়িণীগণের মধ্যে কোনও একজনের অপরিসীম মধুর রস-সমূহকে হরণ ক'রে উপভোগ করবার অভিপ্রায়ে নিজের শ্যামকান্তিকে আবৃত রেখে সেই রমণীর (কান্তি) প্রকট করেছেন সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদের অতিশয় কৃপা করুন।

রঘুনাথ দাসের অষ্টকে এই ভাবটি আছে যে কৃষ্ণ নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে নিজ মাধুর্য আস্বাদনের জন্য রাধার কান্তি অঙ্গীকার করে গৌড়ে অবতীর্ণ হ'লেন।[১৮৪] সনাতন বলেছেন—

"স্ব-দয়িত-নিজ-ভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরম্ অবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ
জয়তি কনক-ধামা কৃষ্ণ-চৈতন্য নামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ।"[১৮৫]

সন্ন্যাসী বেশধারী শচীপুত্র হরির জয় হোক, যিনি কনকবর্ণ এবং কৃষ্ণচৈতন্য নামক, যিনি নিজের সুমধুর ভাব দ্বারা নিজের প্রতি প্রেয়সীর মনোভাবকে স্বীকার ক'রে (এই জগতে) অবতীর্ণ হয়েছেন ভক্তরূপে আস্বাদন করবার লোভে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপে চৈতন্যের অবতরণ সম্বন্ধে স্বরূপ দামোদরের তত্ত্ব-বাখ্যা তারও অন্তঃপ্রবিষ্ট ও বিস্তারিত—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
-দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
—স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং চেতি লোভা—
—ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"[১৮৬]

রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ের পরিণতি, (অতএব তিনি) হ্লাদিনী শক্তি; এজন্য (রাধা ও কৃষ্ণ) উভয়ে একাত্ম হয়েও অনাদিকাল হ'তে গোলোকে ভিন্ন দেহ ধারণ করে আছেন। সেই দুই দেহ ঐক্য প্রাপ্ত হয়ে এখন প্রকট হয়েছেন রাধার ভাব-কান্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য নামক কৃষ্ণ-স্বরূপে; তাঁকে আমি নমস্কার করি। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা না জানি কিরূপ, তাঁর প্রেমের দ্বারা আস্বাদনীয় আমার অদ্ভুত মাধুর্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে রাধা যে সুখ পান সেই সুখই বা কিরূপ—এই সমস্ত বিষয়ে লোভবশতঃ রাধার ভাবযুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।

উপরোক্ত তিনটি অভিলাষের মধ্যে মনে হ'তে পারে প্রথমটি অনাবশ্যক এবং অপ্রযুক্ত। রাধা-প্রেমের উৎকর্ষ কৃষ্ণ বিভিন্ন লীলায় নানারূপে আস্বাদন করেছেন সুতরাং তাঁর জানার কথা। এবং সত্য এই যে কৃষ্ণ এই প্রেমের মহিমা জেনেছেন এবং বলেছেন যে গোপীদের প্রেমের ঋণ তিনি কখনও শোধ করতে পারবেন না।[১৮৭] কিন্তু মনে রাখতে হবে রাধা-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন শুধু মিলনকালে, বিরহকালের রাধা-প্রেমের তীব্রতা ও আকুলতা কৃষ্ণ হয়ত জানতে পারেন নি কিম্বা অন্যের মুখে শুনেছেন, স্বকীয় অনুভব ছিল না। এখন সেটা জানতে চাইলেন অপরোক্ষভাবে, অর্থাৎ এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করতে চাইলেন রাধার প্রতিরূপ গ্রহণ ক'রে রাধাভাবে বিভাবিত হ'য়ে। বিরহাবস্থায় রাধার প্রণয়-মহিমা পূর্ণ-প্রকাশিত হয়েছিল চৈতন্যের জীবনে। দ্বিতীয় অভিলাষ কৃষ্ণের নিজ মাধুর্য কিরূপ তার রূপানুভূতির জন্য লালসা। নিজেকে জানবার অনেক উপায় আমাদের শাস্ত্রে আছে কিন্তু সে সবগুলি নিজের অন্তরতম আত্মাকে জানবার, "আত্মানাম বিদ্ধি"র অনুজ্ঞায়। এখানে তা নয়, এখানে নিজের দৈহিক মানসিক রূপ গুণের চরমোৎকর্ষ, আকর্ষণ-শক্তি, প্রতিভা-স্ফুরণ—এ সবের খতিয়ান, এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান। এ শুধু অপরের দ্বারাই হ'তে পারে, বিশেষতঃ রাধিকার দ্বারা, কারণ কৃষ্ণের মাধুর্য সর্বানুভূত হ'লেও তার উপলব্ধি-বৈচিত্র্য রাধিকার মত আর কারও নাই কারণ তিনিই একমাত্র মাদনাখ্য মহাভাবে ভাবিত। তৃতীয় অভিলাষ কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন ক'রে রাধা যে সুখ পান তা'র অনুভূতি-বাসনা। দ্বিতীয়টির সঙ্গে এর কোনও প্রভেদ নাই কারণ রাধার সুখই কৃষ্ণের মাধুর্যের পরিমাপ হ'তে পারে। স্বমাধুর্য কিরূপ সেটা যদি কৃষ্ণ রাধার মাধ্যমে জানতে চান তা হলে রাধার মানসিক

বিক্রিয়া ছাড়া জানবার উপায় নাই। একটা প্রভেদ এই হ'তে পারে যে কৃষ্ণের মাধুর্য বহুমুখী ও ব্যাপক, সে মাধুর্যের কিয়দংশ পরিকর মাত্রেই আস্বাদন করতে পারেন, গোপবালকরা পারে, গোপীরা পারে, নন্দযশোদা পারেন। কিন্তু কৃষ্ণ এঁদের ভাবৈশ্বর্যের গভীরতা কত তা জানতে চান না, এঁরা কি সুখ পান তা জানবার স্পৃহা কৃষ্ণের নাই। মাদনাখ্য-মহাভাব-ভাবান্বিত রাধার কৃষ্ণ-মাধুর্য-আস্বাদন এক বিশেষ প্রকারের, এটি মধুর রসের চরমতম অনুভূতির নিধান, কৃষ্ণের বিশেষ আগ্রহ এই মহাভাবের স্বরূপ জানবার।

রাধা-ও-কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপে চৈতন্যের আর্বিভাব—এই তত্ত্বের সমর্থনে অন্য উক্তিও আছে—

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্
কলৌ সঙ্কীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।"[১৮৮]

যিনি ভিতরে কৃষ্ণবর্ণ বাহিরে গৌরবর্ণ, যিনি অঙ্গাদি (= পার্যদগণ) বৈভব প্রকাশ করেছেন, আমরা সঙ্কীর্তনাদি দ্বারা কলিযুগে সেই কৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনা করি।

"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তি পূর্বসুদুষ্করে
অন্তর্বহীরসাম্বোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্।"[১৮৯]

রসসাগর শ্রীনন্দনন্দন রাধিকার ভাবকান্তি অন্তরে ও বাহিরে স্বীকার করেছেন—যা পূর্বে সুদুষ্কর ছিল।

"মনে করি অনুমান
শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম তনু
বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদ্‌ভূত চৈতন্যের লীলা॥
রাই সঙ্গে মেলাইতে
কুঞ্জরস বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হইলা॥"[১৯০]

চৈতন্যের যুগল-অবতারিত্বের এই অভিনব তত্ত্ব কবে সর্বগ্রাহ্য হয়েছে বলা শক্ত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে রাধার প্রসঙ্গ নাই, হয় সে সময় পর্যন্ত এই তত্ত্ব সর্বসংবিদিত হয় নি, আর নয় বৃন্দাবন দাস উপেক্ষা করেছেন। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পূজা চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছে, তার আগে যুগলমূর্তি যা পাওয়া গেছে তা সংখ্যায় যৎ-সামান্য।

চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নীলাচল, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের সিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতানৈক্য নাই, তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগ্মাত্মা। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যকে বন্দনা করেছেন কৃষ্ণের অবতার ব'লে, কিন্তু কয়েক স্থলে রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতারও বলেছেন।[১৯১]

কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে যদি প্রকারতঃ ভেদ থাকে তা হ'লে তাঁদের মিলিতমূর্তিরূপে চৈতন্য-কল্পনা অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে, সেজন্য দুজনের মধ্যে যে আত্যন্তিক ভেদ নাই বরং পারস্পরিক নিগূঢ় সম্বন্ধের লক্ষণই যে অধিক এই তত্ত্ব বহুযত্নে স্থাপিত হয়েছে—

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।"[১৯২]

এখন অন্য লীলারস আস্বাদন করতে তাঁরা চৈতন্য-দেহে একীভূত হ'লেন, তত্ত্বতঃ এ মিলনে কোনও অন্তরায় নাই।

পরকীয়া-রস-পিপাসা গোলোকে চরিতার্থ হ'তে পারে না ব'লে কৃষ্ণকে মর্ত্যে আসতে হ'ল কিন্তু চৈতন্যের আগমনের হেতু কি? কৃষ্ণের যে স্বমাধুর্য-আস্বাদনের নূতন অভিলাষ জাগল সেটার পূরণ কি গোলোকে সম্ভব হ'ত না? কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি—

"আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।"[১৯৩]

× × × ×

"কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্যাস্বাদন
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য চর্বণ।"[১৯৪]

× × × ×

"স্বমাধুর্য আস্বাদিতে করেন যতন
ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন।"[১৯৫]

কিন্তু ভক্তভাবে স্বমাধুর্য-আস্বাদনের সুযোগ গোলোকে নাই, কারণ সেখানে জন্ম-মৃত্যু নাই, অতএব কৃষ্ণ যে ভক্তভাবে জন্মাবেন তার উপায় নাই, ভক্তভাবে নূতন জন্মগ্রহণের জন্য কৃষ্ণকে ধরায় আসতে হ'ল।

কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁরা স্বমাধুর্য-আস্বাদনের কথা না ব'লে বলেন যে জগতে প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য চৈতন্যের আবির্ভাব। একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে রূপ গোস্বামী বলেছেন—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।"[১৯৬]

পূর্বে যা বহুকালপর্যন্ত অর্পিত হয় নি, উন্নত-উজ্জ্বল রসময়ী নিজের প্রতি সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করবার জন্য যিনি কলিযুগে কৃপাবশে

অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সন্দীপ্ত সেই শচীনন্দন হরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন। আরও বলেছেন "ভুবি প্রেমস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত তনুঃ"
জগতে প্রেমতত্ত্ব প্রচার করবার জন্য যাঁর কলেবর সদা উল্লসিত।

এই অভিপ্রায়ের পুনশ্চরণ করেছেন অন্যরাও ঃ

কবিকর্ণপূরের মতে ক্লিষ্ট জীবের ত্রিবিধ সন্তাপ নিবারণের জন্য চৈতন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন[১৯৭]; সবিশেষ ব্রহ্ম কৃষ্ণের উপাসনা এবং নামসঙ্কীর্তন রূপ প্রধান সাধনা প্রবর্তন এবং বিবিধ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেবার জন্য চৈতন্যরূপ ভগবানের আবির্ভাব।[১৯৮]

প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন—"প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য, নাম্নাং মহিম্নঃ কো বেত্তা, কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ। কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকারমাধুর্যসীমা-মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার।"[১৯৯]
প্রেমনামক পরমমরুষার্থের কথা কোনজনেরই বা কর্ণপথে গিয়েছিল, নামের মহিমা কে-ই বা জানত, বৃন্দাবন-বিপিনের মাধুরীতে কারই বা প্রবেশলাভ ঘটেছিল, যে রাধা পরমরসের চমৎকারী মাধুর্যের অবধি তাঁকে কে-ই বা অবগত ছিল? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরমকরুণাবশতঃ এ সমস্ত আবিষ্কার করেছেন। ভক্তির চীরদীর্ণ খাতে যে কয়টি নবীন রসধারা এনে চৈতন্য বন্যা বইয়ে দিলেন, অল্প কথায় এর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যান বোধ হয় সম্ভব নয়।

বাসুদেব সর্বভৌম চৈতন্যকে বলেছেন কৃষ্ণের অবতার এবং তাঁর আবির্ভাবের কারণ লুপ্ত ভক্তিযোগের পুনঃপ্রচার ঃ

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তি-যোগ-
— শিক্ষার্থম্ একঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীর-ধারী
কৃপাম্বুধির্যস তম্ অহম্ প্রপদ্যে।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজংযঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তঃ-ভৃঙ্গঃ।"[২০০]

যে পরমপুরুষ বৈরাগ্য জ্ঞান এবং নিজের (= কৃষ্ণের) প্রতি ভক্তিযোগ শিক্ষাদান হেতু কৃপার সাগর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শরীর ধারণ করেছেন, আমি তাঁর শরণাপন্ন। নিজের (= কৃষ্ণের) প্রতি করণীয় ভক্তিযোগ কালক্রমে নষ্ট হ'লে তার প্রাদুর্ভাব সাধন করবার জন্য কৃষ্ণচৈতন্য নামে যিনি অবির্ভূত হয়েছেন তাঁর পাদপদ্মে আমার চিত্ত-ভ্রমর অতিগাঢ় ভাবে লীন হোক।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন চৈতন্যের অবতারিত্ব দুষ্টের দমন, সাধুর উদ্ধার, পাতকী তারণ, ভগবৎ-প্রেম বিতরণ ও সঙ্কীর্তন প্রচারের

জন্য।[২০১] অদ্বৈত আচার্যও বলেন নি যে যুগধর্ম প্রচার ভিন্ন চৈতন্যাবতারের আর কোনও প্রয়োজন আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে।"[২০২]

যা বহুকাল বিতরিত হয় নি, স্বীয় গোপনীয় সম্পত্তিতুল্য সেই স্বপ্রেম-নামামৃত যিনি আপামর জনসমূহকে বিতরণ করেছেন সেই পরম উদার গৌরকৃষ্ণের আমি শরণাপন্ন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিশেষত্ব এই যে এই মতের সমর্থনে তিনি যা বলেছেন তা চৈতন্যের বা কৃষ্ণের উক্তি ব'লে মেনেছেন—

"যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নামসঙ্কীর্তন
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥
যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥"[২০৩]

× × × ×

"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।"[২০৪]

এ যদি কৃষ্ণের বা চৈতন্যের উক্তি হয় তা হ'লে একেই চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব'লে মনে করা উচিৎ, কোনওরূপে পরিবর্তিত না ক'রে, ইতস্ততঃ না ক'রে। চৈতন্য যা বলেছেন তা অতি উচ্চআদর্শের ধারক ও বাহক, নিজে ভক্তির আচরণ ক'রে ভজনের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ স্থাপন, কলির যুগধর্ম সঙ্কীর্তনের প্রচার, পাপাশয় জনকে দূর ক'রে ব্যাক্তিসাধারণকে অভয় দান। হতবল বাঙালীর মধ্যে একজন দূরদর্শী অধ্যাত্ম-শক্তিমান পুরুষের জন্ম হ'ল যিনি সমাজে স-তাৎপর্য-সততার দৃষ্টান্ত এনে এবং ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রে দলিত-পতিতকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমানাধিকার দিয়ে মুমূর্ষু বঙ্গসমাজে পূর্ণ শক্তিসঞ্চার না করতে পারলেও প্রাণসঞ্চার করেছিলেন!

কিন্তু এই পৌরুষ-দৃপ্ত বাণী ভক্তের মনে ধরে নি, প্রেমের বৈচিত্র্য-আস্বাদন-লোলুপ কৃষ্ণের কি এমন অপমনোবৃত্তি হবে যে জীবের পরিত্রাণের তুচ্ছ কারণে তিনি অবতার হবেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ

বলেছেন বটে "সর্বলোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার",[২০৫] "লোক-বিস্তারিব—এই ঈশ্বর স্বভাব",[২০৬] কিন্তু স্বকীয়ত্ব বজায় রেখে চৈতন্যের আবির্ভাব-কারণকে মুখ্য গৌণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও চৈতন্য-প্রসঙ্গকে সমান্তরালে রাখবার জন্য। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এটা যুগধর্ম, কিন্তু যুগধর্ম-প্রবর্তন কৃষ্ণের বা চৈতন্যের কাজ নয়—

"এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ প্রকট্য কারণ
অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥
এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান
যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম ॥"[২০৭]

কিন্তু যদি মেনে নেওয়া যায় যে কলির যুগধর্ম নামসঙ্কীর্তন তা হ'লে কি ক'রে বলা যায় এটি চৈতন্যের কর্ম নয়।

"দুই হেতু অবতার লঞা ভক্তগণ
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম-সঙ্কীর্তন।"[২০৮]

অতএব চৈতন্যের আবির্ভাবের হেতু দুটি, আপনার প্রেম-আস্বাদন এবং নামসঙ্কীর্তনের প্রচার। কিন্তু চরিতকার আগেই ব'লে রেখেছেন—

"প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥"[২০৯]

নামকীর্তন বা নামের প্রচার বিহরঙ্গ বা গৌণ হেতু, অতএব আপনার প্রেম-আস্বাদন মুখ্য হেতু। ক্রমে বিষয়টি বিষদ করেছেন, প্রথমে কীর্তনের কথা—

"সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে
নাম-প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥
× × × ×
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্তন
এহো বাহ্য হেতু—পূর্বে করিয়াছি সূচন ॥"[২১০]

তার পরে মুখ্য হেতুর বর্ণনা—

"অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥
× × × ×
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥

রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে
সেই তিন সুখ—কভু নহে আস্বাদনে ॥
রাধাভাব অঙ্গীকারি—ধরি তার বর্ণ
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥"২১১

স্বরূপ দামোদর বর্ণিত উপোরক্ত শ্লোকে কৃষ্ণের যে তিনটি অভিলাষ কথিত হয়েছে, কৃষ্ণদাস এই পরিচ্ছেদে তাঁর দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন পয়ারে।

স্বরূপ দামোদর শুধু রাধার প্রণয় মহিমার কথা ব'লেছেন, তাঁকে কোনও রকমে বিশেষিত করেন নি, কৃষ্ণদাস সেই প্রেম-বর্ণনায় মাদক উত্তেজনা এনেছেন, এই প্রেমকে পরকীয়া প্রেমের সঙ্গে সংশ্রাবিত ক'রে

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি
তাঁর মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥
× × × ×
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥"২১২

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুবর্তনে বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুমোদিত সিদ্ধান্ত এই যে চৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন কৃষ্ণের নিজ-রস-আস্বাদনের স্পৃহা, গৌণ প্রয়োজন প্রেমধর্ম ও সঙ্কীর্তনের প্রচার। কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ এ বিচার আজ শুধু অনির্ণেয় নয় অবান্তর, তবে চরিতকার প্রজ্ঞাবলে এই দুটিকে পৃথক ক'রে চৈতন্যের জীবনের দুটি দিক আমাদের সম্মুখে স্পষ্টীকৃত করেছেন। চৈতন্য যখন রথের সম্মুখে বা কীর্তনদলের অগ্রভাগে নৃত্য করেন তখন তিনি জনগণের ধর্মনায়ক, প্রেমভক্তি বিতরণের মুখ্যপাত্র; আবার যখন তিনি নিজেকে লোকসমাজ থেকে সঙ্কুচিত ক'রে একান্তে আপনে লীন হ'য়ে কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন তখন তিনি মহাভাব-বিভাবিত। পতিতের অহ্বায়ক, লোক-তারক, চৈতন্যকে ডেকে এনেছিলেন অদ্বৈতাচার্য, নিজ-প্রেম-আস্বাদক চৈতন্যকে আবিষ্কার করলেন রামানন্দ রায় ও স্বরূপ-দামোদর।

কৃষ্ণের কার্যাবলী ও গুণাবলী চৈতন্যে লক্ষিত হয় না, চৈতন্য গোপালক, বংশীবাদক, নাগর, রমণী-চিত্ত-চোর—এ সব কিছুই নয়। চৈতন্য রমণী-প্রেম আস্বাদন করেন নি, ভগবৎ-প্রেম মুক্ত হস্তে বিতরণ করেছেন। অন্য দিকে রাধার মাদনাখ্য মহাভাব এবং গৌরবর্ণ তাঁর আছে। অতএব তাঁকে রাধার অবতার বললে কি ক্ষতি হ'ত? যদিও রামানন্দ-মিলনের পরে তিনি সম্পূর্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হ'য়ে কৃষ্ণের জন্য আকুল এবং কৃষ্ণের মাধুর্যরস-

আস্বাদনের পিপাসা চির অতৃপ্ত, তবুও তাঁর প্রথম জীবনে ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ পেয়েছে; অতএব কৃষ্ণের অংশ তাঁর জীবনে ছিল, অন্ততঃ প্রথম দিকে। দ্বিতীয়তঃ রাধা কৃষ্ণের সহিত যুগলেই পূজিত হ'ন, লক্ষ্মী সরস্বতীর মত তাঁর একক পূজার প্রচলন নাই। শুধু রাধার অবতার বললে তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলতে বাধা জন্মায়।

## উল্লেখপঞ্জী


১। ব্রহ্মসূত্র ৩/২/১৫ শঙ্করভাষ্য
২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৫/১০০, ১৪২
৩। ভগবৎসন্দর্ভ ৪৭, ভক্তিসাধক নিষ্কিঞ্চনের টীকা
৪। পদ্মপুরাণ, উত্তরখন্ড ২৫৫/৩৯-৪০
৫। বিষ্ণু পুরাণ ১/৯ /৪৩
৬। পদ্ম পুরাণ, পাতাল খন্ড, ৫১/৬৮-৭২
৭। ভাগবত ১১/১৩/৪০
৮। ব্রহ্মসংহিতা ৩৮, এবং টীকা
৯। ভাগবত ১১/১৪/২৬
১০। কঠ ১ / ৩ /১২
১১ । মুন্ডক ৩/১ /৮
১২। ভাগবত ১/২/১১
১৩। গীতা ১৫ / ১৬, ১৭, ১৮
১৪। গীতা ১৩ / ২৩
১৫। পরমাত্মসন্দর্ভ ১
১৬। ভক্তিসন্দর্ভ ৬
১৭। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১
১৮। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১/৩; ১/২/৬, ১২; ২/২০/১৫৯; ব্রহ্মসংহিতা ৪৯
১৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ৯৫
২০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১/৩; ২/২০/১৬১; পরমাত্মসন্দর্ভ ১
২১। ভাগবত ১০/১৪/৫২
২২। ভক্তিসন্দর্ভ ৬
২৩। গীতা ১৮/৫৪
২৪। ভাগবত ১/৭/১০
২৫। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১
২৬। ভাগবত ১০/১৪/৩২
২৭। ভাগবত ১/৩/২৮
২৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২১/১০১
২৯। পদ্ম পুরাণ, পাতাল খন্ড, ৪৬/৪২

৩০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব লহরী ১০৬
৩১। বিষ্ণু পুরাণ ১/১২/৫৭
৩২। Philosophies of India by Heinrich Zimmer, p. 77
৩৩। শ্বেতাশ্বতর ৬/৮
৩৪। শ্বেতাশ্বতর ৪/৯
৩৫। শ্বেতাশ্বতর ৪/১০
৩৬। গীতা ৭/৫
৩৭। বিষ্ণু পুরাণ ৬/৭/৬১
৩৮। বিষ্ণু পুরাণ ১/১২/৬৯
৩৮ক। Introduction to the Pancharatra by F. O. Schrader, pp. 29, 36, 54N, 87
৩৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি, ১, টীকা
৪০। ভগবৎসন্দর্ভ ১০৩
৪১। ভগবৎসন্দর্ভ ১০৩
৪২। ভাগবত ১/২/২৯
৪৩। পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, "পরিণামবাদ"
৪৪। পরমাত্মসন্দর্ভ ৫৭, ৭১ অনুচ্ছেদ
৪৫। পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী
৪৬। ব্রহ্মসূত্র ৩/২/৩,৪ শঙ্করভাষ্য
৪৭। পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, পৃঃ ১৩৪, ৩২৫
৪৮। পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী
৪৯। ব্রহ্মসূত্র ৩/২/৫ শঙ্করভাষ্য, গীতা ১৩/৩১
৫০। পরমাত্মসন্দর্ভ ৩৯
৫১। পরমাত্মসন্দর্ভ ৩৯
৫২। বিষ্ণু পুরাণ ৬/৭/৯৪
৫৩। ব্রহ্মসূত্র ২/৩/৪২ শঙ্করভাষ্য
৫৪। গীতা ১৩/২৩
৫৫। ভাগবত ১০/২৪/১৩, ১৪
৫৬। ভাগবত ৭/১/২৫
৫৭। শ্বেতাশ্বতর ৪/৯-১০
৫৮। গীতা ৭/১৪
৫৯। গীতা ১৮/৬১
৬০। গীতা ৪/৬
৬১। গীতা ৭/২৫
৬২। ভাগবত ২/৯/৩৩
৬৩। ভাগবত ৩/২৬/৪
৬৪। ভাগবত ২/৫/১৩

৬৫। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ৬১
৬৬। গীতা ৭/১৬-১৮
৬৭। ভাগবত ১১/১৯/৩
৬৮। ভাগবত ১১/১৯/৬
৬৯। ভাগবত ১১/১৯/১
৭০। ভাগবত ১১/১১/৩, ৪
৭১। ভাগবত ১১/৭/৬১, ৬৬; ১১/২/৮
৭২। ভাগবত ১০/১৩/৩৭
৭৩। চণ্ডী, প্রথম চরিত্র, প্রথম অধ্যায়, ৫১-৫৪
৭৪। ভাগবত ১০/২/৬
৭৫। বিরাটপর্ব ৬/২ (প্রক্ষিপ্ত?)
৭৬। ভীষ্মপর্ব ২৩/৭
৭৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৫/১২
৭৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯১/৩৭, ৪৪
৭৯। হরিবংশ ২/২/২৭
৮০। হরিবংশ ২/২/৪৮, ৪৯; ২/৪/১০
৮১। হরিবংশ ২/২/৫২
৮২। হরিবংশ ২, তৃতীয় অধ্যায়
৮৩। হরিবংশ ২/৪/৪৭, ৪৮; ২/২২/৫৪; ২/১০১/১১, ১৪; ২/১০৭/১২
৮৪। হরিবংশ ২/১২০ অধ্যায়
৮৫। বিষ্ণু পুরাণ ৪/১৫/১৭
৮৬। বিষ্ণু পুরাণ ৫/১/৭০
৮৭। বিষ্ণু পুরাণ ৫/১/৮১
৮৮। বিষ্ণু পুরাণ ৫/১/৮৩-৮৫
৮৯। ভাগবত ১০/২/১১, ১২; ১০/৪/৯
৯০। চণ্ডী ৫/১৬, ১১/১৬, ৪২
৯১। চণ্ডী, প্রথম চরিত্র, প্রথম অধ্যায়, ৫৫-৫৮
৯২। গোপালচম্পূ, উত্তর, ৩৩/৩
৯৩। ভগবৎসন্দর্ভ ২৮ অনুচ্ছেদ, পরমাত্মসন্দর্ভ ৫৪
৯৪। ভগবৎসন্দর্ভ ১৮
৯৫। ভগবৎসন্দর্ভ ১০০
৯৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/২৭১
৯৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাব, ১১৯ টীকা
৯৮। ব্রহ্মসংহিতা ৫৫
৯৯। ব্রহ্মসংহিতা ৫৫, জীব গোস্বামীর টীকা
১০০। পরমাত্মসন্দর্ভ ৪৪
১০১। ভাগবত ২/১০/৬

১০২। ভাগবত ১১/১১/৭-১২
১০৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১০-১২; পরমাত্মসন্দর্ভ ৪৬
১০৪। তত্ত্বসন্দর্ভ ৩২
১০৫। ভাগবত ১১/২/৩৭ শ্লোকের টীকা
১০৬। ভাগবত ১১/২/৩৭; প্রমথনাথ তর্কভূষণের "বাংলার বৈষ্ণব দর্শন", পৃঃ ২১১-২১২
১০৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৪/১৩৬
১০৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/১০৮-১২৩
১০৯। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১২, ১৩, ২৪
১১০। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ৬০
১১১। তৈত্তিরীয় ২/৪
১১২। তৈত্তিরীয় ৩/৬
১১৩। তৈত্তিরীয় ২/৭
১১৪। তৈত্তিরীয় ২/৫
১১৫। মুণ্ডক ২/২/৭
১১৬। মাণ্ডুক্য ৫
১১৭। বৃহদারণ্যক ৪/৩/৩২
১১৮। ব্রহ্মসূত্র ১/১/১২
১১৯। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৬৮
১২০। পরমাত্মসন্দর্ভ ১৮
১২০ক। Indian Philosophy Vol I By S Radhakrishnan, p 497
১২১। গোপালতাপনী, উত্তর বিভাগ, ৫৭
১২২। পদ্ম পুরাণ, পাতাল খণ্ড, ৫১/৮৬
১২৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৯৬, ৯৭
১২৪। বিষ্ণু পুরাণ ১/৯/১১৯
১২৫। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৭/১৪১, ১৪২
১২৬। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৭/১৪২, ১৪৪
১২৭। ভক্তিসন্দর্ভ ১
১২৮। তত্ত্বসন্দর্ভ ১০, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৭
১২৯। ভাগবতের প্রথম শ্লোক, জীব গোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ টীকা
১৩০। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১১৫
১৩১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/৩৫৭
১৩২। বিষ্ণু পুরাণ ১/৩/২
১৩৩। ব্রহ্মসূত্র ২/১/৬ শঙ্করভাষ্য-ধৃত স্কন্দ পুরাণের বচন
১৩৩ক। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কৃত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ পৃ ২৭১
১৩৪। ভগবৎ সন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, পৃঃ ৩৬, ৩৭
১৩৫। পরমাত্মসন্দর্ভ ৩৭

১৩৬। পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসাম্বাদিনী, পৃঃ ১৪৯
১৩৭। তত্ত্বসন্দর্ভ ৪৩
১৩৮। ভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী
১৩৯। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৭/১২৪, ১২৫; পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী
১৪০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/৫৮
১৪১। ব্রহ্মসংহিতায় ৫/২৯ বর্ণিত, কৃষ্ণসন্দর্ভে ১১৭ উল্লিখিত
১৪২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তিলহরী ৫০ ধৃত পদ্ম পুরাণ বচন; ভগবৎসন্দর্ভ ৪৭ ধৃত পদ্ম পুরাণ বচন
১৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৭/১৩১
১৪৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৭/১৩৪
১৪৫। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৪/৬৭
১৪৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১২৮
১৪৭। গীতা ৪/৮
১৪৮। হরিবংশ ১/৪১/১৭
১৪৯। ভাগবত ৯/২৪/৫৬; পুনরায় ১০/৩৭/১৪
১৫০। ভাগবত ৪/১/৪৫; ১০/১/২২, ৬৪; ১০/৩৩/২৭; ১০/৬৩/২৭; ১০/৩৮/১০
১৫১। ভাগবত ১/৮/৩৩-৩৪
১৫২। ভাগবত ১/৮/১৯
১৫৩। বিষ্ণুপুরাণ ৫/৭/৯; ৫/১২/৭; ৫/১২/২২; ৫/২০/৩৮; ৫/২৯/২৫; ৫/৩৭/১৭; ৫/৩৮/৫৮, ৫৯
১৫৪। গীতগোবিন্দ ৫/৫
১৫৫। ভাগবত ১০/৩৩/৩৭
১৫৬। পদ্মপুরাণ, ভাগবতের ১০/৩৩/৩৬ এবং বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় উদ্ধৃত
১৫৭। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ, ১৫
১৫৮। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৪৭
১৫৯। পরমাত্মসন্দর্ভ ৯২ অনুচ্ছেদ, কৃষ্ণসন্দর্ভ ২৮, ২৯, ৪৩ অনুচ্ছেদ
১৬০। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ, ১৬, জীব গোস্বামীর লোচন-রোচনী টীকা
১৬১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৮
১৬২। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৪-১৬
১৬৩। ভাগবত ১০/৩৩/৩৬
১৬৪। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৫/২৯
১৬৫। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২৮-৩২
১৬৬। গীতা ৪/১১

১৬৭। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৭৭
১৬৮। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৯
১৬৯। ভাগবত ১১/২/৬
১৭০। ভাগবত ৩/৯/১১
১৭১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১৪/৫০
১৭২। চৈতন্যভাগবত ২/৬/১৫
১৭৩। চৈতন্যভাগবত ২/৬/৬২, ১৩৪
১৭৪। চৈতন্যভাগবত ২/১৬/৭৫
১৭৫। চৈতন্যভাগবত ২/২/১৩৬
১৭৬। চৈতন্যভাগবত ২/২/২৭২-২৮২
১৭৭। চৈতন্যভাগবত ২/৩/৩৪
১৭৮। চৈতন্যভাগবত ২/৫/১২৯
১৭৯। চৈতন্যভাগবত ২/৬/৬৫
১৮০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২৬৮, ২৬৯, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৮৮
১৮১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৪৪, ১৪৫
১৮২। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৪৬, ললিতমাধব ৮/৩২
১৮৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৫২, দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টক ৩
১৮৪। রঘুনাথ দাস চৈতন্যাষ্টক, প্রথম শ্লোক
১৮৫। বৃহৎভাগবতামৃত, তৃতীয় নমস্ক্রিয়া
১৮৬। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১/৫, ৬, স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে উদ্ধৃত। একমতে প্রথম শ্লোকটি সনাতনের রচনা, A. K Majumdar's "Chaitanya, his life and doctrine, p. 292.
১৮৭। ভাগবত ১০/৩২/২২
১৮৮। তত্ত্বসন্দার্ভ ২
১৮৯। কবিকর্ণপূর, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৬
১৯০। নরহরি সরকার, পদকল্পতরু ২২৫৯
১৯১। Early History of the Vishnava Faith and Movement in Bengal by S. K. De, pp. 421-447
১৯২। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৯৬-৯৮
১৯৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১৪৮
১৯৪। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৬/১০৩
১৯৫। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৬/১০৮
১৯৬। চৈতন্যচরিতামৃতে ১/১/৪ উদ্ধৃত বিদগ্ধমাধবের শ্লোক ১/২
১৯৭। চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ১৭/৭

১৯৮। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১/১২, ১/৬৯
১৯৯। চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৩০ সংখ্যক শ্লোক
২০০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৬/২৫৪, ২৫৫, চৈতন্যভাগবত ৩/৩/১২৩, ১২৬
২০১। চৈতন্যভাগবত ১/২/২২, ২৩, ২৭, ১৫১; ২/৩/৪৩; ২/১৩/৫৪; ৩/৫/২২৪; ১/৫/১৫১, ১৫২; ১/১৬/৬; ৩/৩/১০৬; ৩/১/২৬৪; ২/২২/১৭; ২/৫/৫৩; ২/৬/১২৬, ১৬৫; ২/২৩/৪০২
২০২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৩/১
২০৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৩/১৯-২৮
২০৪। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১৭/৫৩
২০৫। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২/৩
২০৬। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২/৬
২০৭। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৩৬-৩৭
২০৮। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৩৯
২০৯। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৫, ৬
২১০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৪০, ৪১, ১০২
২১১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১০৩, ১০৪, ২৬৬-২৬৮
২১২। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৪৭, ৪৮, ৫০

## ॥ ৩ ॥
# কৃষ্ণলীলা

### লীলাবিস্তার

পূর্বপরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে চৈতন্য কৃষ্ণ ও রাধার মিলিত বিগ্রহ। যদিও চৈতন্য রাধাভাবে বিভাবিত ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁর শেষ জীবনে, তবুও বৈষ্ণব ভক্তের চেষ্টা কৃষ্ণের সহিত তাঁর তাদাত্ম্য যথাসম্ভব অনুভব ও প্রচার করা, এমন কি ব্রজপরিকরদের সঙ্গে চৈতন্যপরিকরদের তাদাত্ম্যও। চৈতন্য পূজিত হয়েছেন অনেক স্থলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পাশে, ভক্তের সাধনা চৈতন্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে—এমন কি আরও আত্যন্তিক ভাবে—কৃষ্ণলীলা স্মরণ করা। তত্ত্বের ক্ষেত্রে কৃষ্ণই সগুণ ব্রহ্ম, বিভিন্ন শক্তির আধার, কাব্যের বেলায় তিনিই সর্বস্ব, যদিও গৌরচন্দ্রকে স্মরণ ক'রে কাব্য রচনা ও কীর্তন করা হয়। অতএব কৃষ্ণলীলার কিছু আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নির্ধারণে অপরিহার্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব এই যে শুধু কীর্তন দ্বারা—কৃষ্ণের নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন দ্বারা—ধর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন হ'তে পারে। চৈতন্য কখনও ফুলদূর্বা-শঙ্খঘণ্টার সহযোগে পূজা করেছেন বা পূজা করবার আজ্ঞা দিয়েছেন বলে চরিতগ্রন্থে লেখা নাই, তাঁর সমগ্র প্রবৃত্তি কীর্তনের প্রতি, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে তাই কৃষ্ণকীর্তনের প্রাধান্য নয় সর্বস্বতা। সুতরাং লীলাকীর্তন অনুধাবন করতে হ'লে কৃষ্ণলীলা জানা দরকার।

সারা বিশ্বসৃষ্টি কৃষ্ণের লীলা কিন্তু একে বলা হয় বহিরঙ্গা লীলা। মায়াশক্তির দ্বারা নির্বাহিত হয় ব'লে একে বলা হয় মায়িকী লীলা। কৃষ্ণলীলা বলতে সাধারণতঃ বোঝায় তাঁর কৈশোর চরিতবৃত্তান্ত, এটি অন্তরঙ্গা লীলা, সম্পন্ন হয় তাঁর স্বরূপশক্তির সহায়ে, লীলা-পরিকরগণ অর্থাৎ সঙ্গী-সঙ্গিনীগণ স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। এই লীলার সঙ্গে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বা জড় জগতের সম্পর্ক নাই। লীলার উদ্দেশ্য আনন্দ-আস্বাদন, রসাস্বাদন,— আর কোনও উদ্দেশ্য নাই।[১] কৃষ্ণের পরিকররা যে স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ কৃষ্ণের সঙ্গেই প্রকট

লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এ ভাবটি ভাগবতে নাই, তবে আভাস আছে, রাসলীলায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেছিলেন যেমন বালক নিজের প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে[২], অর্থাৎ গোপীরা পৃথক সত্ত্বা নয়।

নররূপী কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার নয় তিনিই পরমপদ, অতএব তাঁর কার্য বা লীলা কাল-সীমায়িত হ'তে পারে না, হ'তে হ'বে চিরন্তন। সে কারণে বৃন্দাবন লীলা ছাড়াও এমন এক লীলা কল্পনা করা হয়েছে যা অব্যাহত শাশ্বত। অন্তরঙ্গা লীলা দুরকম—প্রকট ও অপ্রকট, "প্রকটা-প্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।"[৩] অপ্রকট লীলা সম্বন্ধে লেখা একমাত্র গ্রন্থ বোধ হয় জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূ। পরিকরদের নিয়ে যে লীলা লোকচক্ষের গোচরে ঘটেছিল সেটা হয়েছিল গোকুলে বা বৃন্দাবনে, মথুরায়, দ্বারকায়। যে লীলা গোচরীভূত নয় সেটা ঘটছে গোলোকে।[৪] কিন্তু জীব গোস্বামী বলেন ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান হেতু প্রকটে ও অপ্রকটে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম মনে করা উচিৎ[৫], সুতরাং গোলোকে ও গোকুলে প্রভেদ নাই। দুই লীলাই নিত্য, প্রকট লীলা আজ ব্রজে না ঘটলেও অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে ঘটছে[৬], "সর্বা এব প্রকটলীলা নিত্যা এব।"[৭] ব্রজলীলায় পিতা মাতা ভ্রাতা সম্বন্ধ আভিমানিক বা কাল্পনিক, আসলে এঁরা সকলেই কৃষ্ণপরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ। অপ্রকট লীলাতেও গোষ্ঠগমন, গোচারণ, গোপীপ্রেম আছে, তবে অসুরবধ, মথুরাগমন বিচ্ছেদ নাই। অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণ নিত্য কিশোর, তাঁর জন্ম শৈশব ইত্যাদি নাই, সুতরাং বাৎসল্য ভাব সীমায়িত; বিবাহাদি নাই সুতরাং স্বকীয়া পরকীয়ার কোনও প্রশ্ন নাই। কিন্তু তাত্ত্বিকরা সেখানেও এই প্রশ্নের বিচার করেছেন।

"যা যথা ভুবি বর্ত্যন্তে পূর্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ
তস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণলীলার্থমাদৃতা।"[৮]

জগতে যে সমস্ত ভগবানের লীলা আছে সবই বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণলীলার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত মতে কৃষ্ণজন্মের সঙ্গে দেবতারা যাদবরূপে জন্ম নিলেন[৯], কিন্তু পদ্মপুরাণ মতে যাদবরা নিত্যপার্ষদ—

"এতেহি যাদবাঃ সর্বে মদ্‌গণা এবং ভামিনি
সর্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্য গুণশালিনঃ।"[১০]

হে ভমিনি! এই যাদবসকল আমারই নিজগণ। হে দেবি! এরা সর্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।

ব্রজলীলায় কৃষ্ণের সঙ্গে পরিকরদের সম্বন্ধ চার প্রকার—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ব্রজে শান্তরসের স্থান নাই কারণ এটি দূরের উপাসনা, ব্রজের উপাসনা নিকট-সম্বন্ধিত, মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন, যাকে বলা হয় প্রেমভক্তি। কৃষ্ণের পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত কৌমার, পাঁচ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড, দশ থেকে পনেরো পর্যন্ত কৈশোর।

বাৎসল্য রসে কৌমার, সখ্য রসে পৌগণ্ড এবং মধুর রসে কৈশোর বয়স শ্রেষ্ঠ ।[১১]

## ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান অতএব তাঁর ঐশ্বর্যভাব থাকবেই। অথচ বলা হয়েছে তিনি "অসমোর্ধ্ব-মাধুর্য", মাধুর্যে তাঁর সমান বা উর্ধ্বে কেউ নাই। প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিতে ভক্ত ভগবানকে তাঁর আপনজন বলে মনে করেন, ঈশ্বর ব'লে নয়।

"তসৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ।"[১২]

আমি তাঁরই, তিনি আমরাই, এবং তিনি ও আমি অভিন্ন— সাধনাভ্যাসের পরিপাকবশতঃ এই তিন প্রকার ভগবৎশরণতা হ'য়ে থাকে। সাধনার প্রথম সোপান "আমি তাঁর" এই ভাব, দ্বিতীয় স্তরে "তিনি আমার"। প্রথমটি তদীয়া রতি বা তদীয়তাময় ভাব, দ্বিতীয়টি মদীয়তাময় ভাব বা মমত্ব বোধ। তৃতীয় স্তরে "আমিই তুমি"। তৃতীয় ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তবে "অনন্তের সর্বব্যাপিত্ব-জন্য তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন; আমিও সর্বরূপে বর্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে।" কিন্তু যেহেতু বৈষ্ণবদর্শন অদ্বৈতবেদান্তের এবং অহংগ্রহ উপাসনার পরিপন্থি, সেজন্য তৃতীয় ভাবটিকে সোঽহং না ব'লে রূপায়িত করা হয়েছে গোপী কর্তৃক কৃষ্ণের অনুকরণে।[১৩] জয়দেব একে রূপ দিয়েছেন এই বলে' "মধুরিপুঅহমিতি ভাবনশীলা।"[১৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত এবং পদকর্তারা কৃষ্ণের মাধুর্যকেই বড় ক'রে দেখেছেন, তাঁর ঐশ্বর্যভাব আংশিক ভাবে পরিহার করে' মাধুর্যের দিকটাই পরিস্ফূট করেছেন। গাঢ় মমতাবুদ্ধির ফলেই এমনটি সম্ভব হয় এবং জীবভক্তের মমত্ববুদ্ধি বহুল পরিমাণে সৃষ্ট হয় ব্রজবাসীদের দৃষ্টান্ত দেখে। দ্বারকা মথুরার দাস্যপ্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞান আছে ব্রজের দাস্যপ্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই, মমত্ববোধ আছে, সে কারণে শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকলে "আমি কৃষ্ণের" এই অধীন-ভাব থাকে; যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণ-স্বরূপ সুতরাং কারও সেবা-গ্রহণের প্রয়োজন তাঁর নাই, সুতরাং এক্ষেত্রে ভগবৎ-সেবা অধিকন্তু বোধে অল্পমূল্য প্রতীয়মান হয়। অন্য দিকে যেখানে মমত্ববুদ্ধি বা "কৃষ্ণ আমার" এই ভাব থাকে সেখানে সেবার প্রয়োজন নির্ভর করে ভক্তবাঞ্ছার উপরে এবং এমন সেবার মূল্য অধিক। কিন্তু ব্রজের দাস্যপ্রেমে ঐশ্বর্যবোধ না থাকলেও প্রভুজ্ঞান সম্ভ্রম বা গৌরব-বুদ্ধি আছে, ব্রজের সখ্যপ্রেমে যা নাই, সেজন্য সখ্যপ্রেম শ্রেষ্ঠতর। সখ্যের চেয়ে বাৎসল্যের শ্রেষ্ঠতা এই জন্য যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মমতা আরও অধিক,

কৃষ্ণের নিরুপায়-ভাব প্রস্ফুট, বালক-কৃষ্ণকে তাড়না ভর্ৎসনার অধিকার আছে। কান্তাভাব সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এখানে সর্বত্যাগের আচরণ এবং নিজাঙ্গ সমর্পণ আছে যা আত্মসমর্পণের প্রতীক। মনে রাখতে হবে এই মূল্যায়ণ শুধু আমাদের কাছেই সত্য ব্রজবাসীদের কাছে নয়, কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পরিকররা সকলেই স্বরূপশক্তি, কৃষ্ণের সহিত তাঁদের সম্বন্ধ আভিমানিক। কান্তাভাবের একটি বিশেষ রূপ আছে বৃন্দাবন লীলায়

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।"[১৫]

সহচরি! এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ যিনি কুরুক্ষেত্রে (আমার সহিত) মিলিত হয়েছেন, আমিও সেই রাধা, আমাদের উভয়ের সঙ্গমসুখও সেইমত। তথাপি আমার মন চাইছে সেই যমুনাতটবর্তী বন, যার অভ্যন্তর চপল মধুর মুরলির পঞ্চমস্বরে আনন্দিত থাকত। কুরুক্ষেত্রে দ্বারকাধিপ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হ'য়ে রাধিকা প্রীত নয়, তাঁর মন ফিরে পেতে চায় অনাবিল-মাধুর্যময় বৃন্দাবনের গোপালকৃষ্ণকে।

তারও আগে উমাপতি ধর এবং শরণ কবি শ্লোক রচনা করেছেন এই মর্মে যে দ্বারকায় কৃষ্ণ রত্নমন্দিরে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হ'য়েও লতাকুঞ্জে রাধার সহিত মিলনানন্দের স্মরণে শোকাকুল।[১৬]

আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকে আছে—

"তেষাং গোপবধূ-বিলাসসুহৃদাং রাধা-রহঃ-সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম।"[১৭]

(দ্বারকাধিপ কৃষ্ণ বৃন্দাবন-প্রত্যাগত কোনও সখাকে বলছেন) হে ভদ্র! গোপবধূগণের বিলাসসুহৃদ এবং রাধার নির্জনকেলির সাক্ষী যমুনাতীরের লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো? এইসব শ্লোকে ঐশ্বর্যের তুলনায় মাধুর্যের মনোনয়ন এবং স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা, দুই-ই পরিকীর্তিত।

বৃন্দাবনবাসীরা কালিয়দমন, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কৃষ্ণের অতিমানুষিক ক্রিয়া বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন অথচ কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁদের ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই, এটা আশ্চর্যের বিষয়। এর বৈষ্ণবপর ব্যাখ্যা এই যে কোনও অস্ত্র কৃষ্ণ ধারণ করেন নি এবং অপরের চিত্তবিনোদনার্থ ভক্তবাৎসল্যের আনুগত্যেই এই সব করেছেন, অতএব এতে হ্লাদিনী শক্তির মধুর ভাবই সূচিত হয়েছে। অপর ব্যাখ্যা এই যে অসুরবধকালিয়দমন প্রভৃতি ঐশ্বর্যলীলার সার্থকতা আছে এ কারণে যে কৃষ্ণের এইরূপ বিপদবরণে পিতামাতার বাৎসল্য সখাদের সখ্য প্রেয়সীদের মধুর ভাব উচ্ছ্বসিত হয়েছিল কৃষ্ণের অনিষ্টের সম্ভাবনায়।

কুমারীরা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নি, পূজা করেছেন কাত্যায়নীর, সুতরাং কৃষ্ণের ঈশ্বরভাব তাঁদের চিত্তে প্রথমে স্থান পায় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে প্রণাম করতে হ'ল কারণ তিনিই পাপমার্জনকারী[১৮], অতএব ভগবান। যশোদা কৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদা সশঙ্কিত, এখানে ঈশ্বরভাব নাই, কিন্তু যখন তিনি কৃষ্ণের মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখলেন তখন কৃষ্ণ যে তাঁর পুত্র এই ধারণা কুবুদ্ধির মত প্রতিভাত হ'ল।[১৯] নন্দ কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান করেন ঈশ্বরজ্ঞান নয়, তবুও তিনি কৃষ্ণের চরণে দাসভাবে প্রসাদ মাগেন। কৃষ্ণ নন্দের এমনই প্রিয় যে তাঁকে হারাবার ভয়ে বা বিচ্ছেদের পরে নন্দের এমনই চিত্তদৈন্য উপস্থিত হয়েছিল যে দাস্যভাবের উদয় হয়েছে।

"অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দমহাশয়
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহো নয়।।
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বরজ্ঞান নাহি যাঁর
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার।।
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।"[২০]

জন্মকালে কৃষ্ণ ছিলেন চতুর্ভুজ, বসুদেব তাঁর স্তব করেছিলেন[২১], তিনি চিরদিনই কৃষ্ণকে ঈশ্বরভাবে দেখতেন। বলরাম কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, কালিয়দমন কালে কৃষ্ণকে তাঁর উৎসাহবাণী থেকে বোঝা যায়।[২২]

পরীক্ষিৎ বললেন[২৩] গোপীরা কৃষ্ণকে পরম কান্ত বলেই জানতেন, ব্রহ্ম ব'লে নয়, কিন্তু পরীক্ষিতের এই উক্তি ভিত্তিহীন, গোপীরা শুধুই জারবুদ্ধিতে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন নি, ঐশ্বর্যভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাঁরা জানতেন কৃষ্ণ ঈশ্বর পরমাত্মা[২৪], নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী।[২৫] "ন তত্রাপি মাহাত্ম্য-জ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ"[২৬] তা সত্ত্বেও (গোপীগণ) মাহাত্ম্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছেন এরূপ অপবাদ মিথ্যা। ভাগবতের ১০/২৯/১১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেছেন যে গোপীরা জারবুদ্ধি দ্বারা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হ'য়ে গুণময় দেহত্যাগ করেছিলেন, সেহেতু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, অমৃতকে বিপরীত কিছু মনে করে ভক্ষণ করলেও যেমন অমর হয়। মৃত্যুর সঙ্কল্প ক'রে বিষ পান ক'রে দেখলেন সেটা বিষ নয় অমৃত, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নাই। টীকাকারের যুক্তি বিপরীত মুখেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ—অমৃত মনে ক'রে বিষ পান করলে বিষক্রিয়া অনিবার্য, জারসংযোগ অমৃতোপম মনে হ'লেও তার বিষফল বিষয়সিদ্ধ। অতএব আমাদের ধারণা করতে হ'বে হয় গোপীরা অন্ধ জারবুদ্ধিতে এক গোপকে কামনা করেছিলেন এবং তাঁদের ভাগ্য ভাল যে একজন নিকৃষ্ট উপপতি নয় কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, আর নয় মানতে হবে যে ঈশ্বর-জ্ঞানেই তাঁরা কৃষ্ণকে

আত্মসমর্পণ করেছিলেন জারজ্ঞানে নয়। গোপীরা বলেছিলেন "ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান"[২৭] আপনি গোপিকার (যশোদার) নন্দন নন্। গোপীদের পক্ষে সম্ভব হয় না কুলধর্মত্যাগ করে' পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করা, কুমারীদের পক্ষে সম্ভব হয় না প্রকাশ্যস্থানে বস্ত্রহরণের চরম অসম্মান সহ্য করা—দয়িতের দ্বারা হ'লেও, যশোদার পক্ষে সম্ভব হয় না গোপীদের সহিত কৃষ্ণের অনর্গল আচরণ অনুমোদন করা, যদি না তাঁরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করেন। মা যশোদা কৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি সম্পূর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞান বিরহিত হ'ন এবং কৃষ্ণের ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ গোপীসঙ্গ অবৈধ ও সমাজ-গর্হিত জেনেও যদি তাঁর আদর ও প্রশ্রয় পূর্ণমাত্রায় অর্পিত হ'য়ে থাকে তাহ'লে তা'কে বহুভাগ্যে বাঁচা এক ছেলের প্রতি মাতার অন্ধস্নেহই বলা যায়। বৈষ্ণবধর্মে এই প্রকার অন্ধভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে ভক্তের সাধ্যসার ব'লে মনে করা হয়েছে। কিন্তু গর্ভধারিণীর পক্ষে যে অন্ধস্নেহ সম্ভব, ভক্ত সাধারণের পক্ষে ঈশ্বর-জ্ঞান-রিক্ত হ'য়ে মনে মমত্বভাবের শুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব কিনা সেটা বিবেচ্য। শিশু মাটি খাচ্ছে বা ননী চুরি করছে দেখে বা শুনে তার বাপ-মা যেমন বিগলিত হ'ন অন্য লোকে তেমন হয় না, কৃষ্ণের এমন আচরণে যদি সকল লোকই মুগ্ধ হ'ন, সেটা সম্ভব হয় কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরভাব থাকলে, নইলে নয়।

কৃষ্ণের মাধুর্য তাঁর নরাকৃতি ও নরলীলার কারণে, কোনও চতুর্ভূজ বা পঞ্চমুখ দেবতার মাধুর্য অসম্ভব। অন্য দিকে নরলীলা প্রাকৃত ও নশ্বর; যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে এক নরশিশু এতই মধুর স্বভাব যে ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই তাকে দেখামাত্র পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করে, কিম্বা এক তরুণ এমনই রূপগুণবান যে নারীমাত্রই তার সঙ্গকামনা করে— যে অবধারণা প্রায় অসম্ভব—তাহলেও স্বীকার করতে হয় যে এই আকর্ষণ থাকতে পারে শুধু স্বল্পকালমাত্র সময়ে, যতদিন শিশু অবস্থা বা তরুণ অবস্থা বর্তমান থাকে ততদিনই। যদি বলা হয় যে কৃষ্ণ চিরকিশোর সুতরাং চিরকাল তিনি রমণী মনোলোভন তা হলে তাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হচ্ছে, শুধু মাধুর্য নয়। কৃষ্ণ যদি অসমোর্দ্ধমাধুর্য শিশু বা যুবারূপে চিরযুগ ধ'রে মানবহৃদয় জয় ক'রে এসেছেন—এমন মানবের হৃদয় যে কখনও তাঁকে দেখে নি—তাহলে তা সম্ভব হয়েছে তাঁর ঐশ্বর্য আছে বলে'। ঐশ্বর্যের ফল্গুধারা তলে তলে বইছে বলেই মাধুর্যের বাগানে হরিতের উৎসব সম্ভব হয়েছে।

রূপ গোস্বামীর স্তবমালায় শুধু কৃষ্ণের এবং রাধার স্তব নয় কৃষ্ণের বালচরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তা'তে অসুরবধ গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি ঐশ্বর্য-ভাবাত্মক ঘটনার বর্ণনা আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রসতত্ত্বের যিনি নির্মাতা এবং নিয়ামক রূপে

স্বীকৃত তিনিও ঐশ্বর্যভাব বর্জন করেন নি।

যে-কোনও রাজার মা বা স্ত্রী জানেন তাঁর পুত্র বা স্বামী রাজা, এবং রাজোচিত সম্মান তাঁকে দেন যেখানে তিনি দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, কিন্তু যেখানে ব্যবহার-সম্পর্কে তিনি পুত্র বা স্বামী সেখানে রাজৈশ্বর্য বাদ সাধে না, সেখানে সন্তান-সম্পর্ক বা দাম্পত্য-সম্পর্ক সর্বৈব নিরঙ্কুশ নির্ভেজাল। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মধ্যে এমন নির্দ্বন্দ্ব সহাবস্থান কৃষ্ণলীলায় দেখা যায় কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐশ্বর্যভাবকে যথাসাধ্য পরিহার করেছেন।

জ্ঞানদাসের একটি পদে রাধা জানতে চাইছেন কৃষ্ণের রূপের অসাধারণত্ব কোথায়, প্রশ্নগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং তীক্ষ্ণ কিন্তু কোনও উত্তরের ইঙ্গিত নাই —

"এনা ছান্দে কে না বান্ধে চুল
চূড়ায় মজাল্যে জাতিকুল ॥
কেবা নাহি পরে বনমালা
মালার এতেক কেন জ্বালা ॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া
প্রাণ কান্দে এ রূপ দেখিয়া ॥
কেবা না এতেক জানে কলা
যাহা দেখি ভুলল অবলা ॥
কেবা নাহি কহে কথা খানি
চাঁদ মুখে সুধা খসে জানি ॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা
তোমার রূপে ত্রিভুবন আলা ॥"

—পদকল্পতরু ১৪০৭

এর একটা উত্তর এই হ'তে পারে এটি ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার, যাকে যার ভাল লাগে তার রূপগুণের ব্যাখ্যান বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু এই প্রশ্ন শুধু রাধার প্রশ্ন নয়, শুধু ব্রজনারীর প্রশ্ন নয়, অগণিত ভক্তের প্রশ্ন। তা যদি হয় তা হ'লে ঐশ্বর্য ছাড়া আর কিছুতেই এর যোগ্য-উত্তর পাওয়া যেতে পারে না। ব্রজনারীরা যে পুত্রের চেয়েও কৃষ্ণকে ভালবাসতেন তার কারণ কৃষ্ণ আত্মার আত্মা৺, নইলে এমন আগন্তুক সর্বগ্রাহ্য ভালবাসা সম্ভব নয়।

কৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞান করতে নিষেধ করা হয়েছে তার প্রধান উদ্দেশ্য ভক্তকে আকাঙ্খারহিত করা, ঐশ্বরিক শক্তি না থাকলে আরাধিত সত্ত্বা বিত্ত বিভূতি স্বর্গ অপবর্গ কিছুই দিতে পারেন না, পারেন শুধু স্নেহ ভালবাসা দিতে। আরাধ্য পুরুষ ঐশ্বর্যরিক্ত হ'লে তাঁর প্রতি যে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ও নির্ভরের ভাব অন্তর্হিত হ'য়ে অতি-ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অধঃপর্যায়ে নেমে আসে, সেটা স্বীকার করেও আচার্যরা ঐশ্বর্য প্রত্যাখান করেছেন, ভক্তের স্বার্থপ্রবণতার প্রতি এতই তাঁদের ভয়

ছিল। ঐশ্বর্য বোধে উপাসনা যে উপাসকের উগ্রতার একটা কারণ হ'তে পারে সেটা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। পরম শুভক্ষণে রামানন্দ রায় এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন এবং চৈতন্য তা গ্রহণ করেন।

সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবধর্মকে ঈশ্বর-পূজায় নিয়োজিত ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মপ্রবণতার উৎকট অতিশায়নকে নির্বিষ করেছেন। ধর্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার আবহমান কাল থেকে হ'য়ে আসছে, সে অত্যাচার যাঁরা ক'রে আসছেন তাঁরা অধিকাংশই স্বার্থপ্রণোদিত বা ধর্মবিষয়ে কপট নয়, তাঁরা ধর্মবিশ্বাসী একটু গোঁড়ারকমেই, তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরণায় কাজ করছেন মনে করেন। খৃষ্টানদের inquisition এবং মুসলমানদের জেহদ তাঁদের দ্বারাই সম্পাদিত এবং সমর্থিত হয়েছে যাঁরা নিজের ধর্মের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল, নিজ-কল্পিত ঈশ্বরের আপ্রাণ ভক্ত, তাঁরা মনঃকর্ণে শুনেছেন ঈশ্বরের বাণী, মনশ্চক্ষে দেখেছেন ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ অঙ্গুলিনির্দেশ বিধর্মীর প্রতি, তাঁরা নিজেদেরকে মনে করেছেন ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ, যে ঈশ্বর দূরের বস্তু হ'লেও তাঁর ঐশ্বর্য-রশ্মি দাহ করতে পারে, তাঁর অনুচ্চারিত আদেশ দুন্দুভির মত রণে আহ্বান করে। এই অপ্রাকৃতিক অসম্ভব অনুপযোগী সম্বন্ধের পরিবর্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রবর্তিত করলেন দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর চতুর্বিধ নূতন নিকট-সম্পর্ক, যে প্রেমের সম্পর্কে আদেশ ও আজ্ঞাবহতার আওতা নাই। ভক্ত-ভগবানে যদি শাসক-শাসিতের সম্পর্ক হয় তা হলে সে সম্বন্ধ খাঁটি হ'লেও দুষ্কার্যের সম্ভাবনা আছে, অন্যদিকে দাস্য সখ্য প্রভৃতি সম্পর্কগুলি যদি খাঁটি হয় তা হলে সেসব থেকে কোনও অনর্থের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ যখনই অসুর সংহার করেছেন নিজের হাতেই করেছেন, কোনও দাস বা সখা বা শিষ্যকে আজ্ঞা দেন নি তাদের বধ করতে, অতএব যাঁরা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবে কৃষ্ণপরিচর্যা করেন তাঁরা নিতান্ত নিশ্চিন্ত ভাবেই করেন যে বিধর্মী-সংহারের আদেশ তাঁদের উপরে বর্তাবে না। ঈশ্বরকে নিতান্ত আপনজন ভাবে উপাসনা করায় যদি পরধর্মের প্রতি আক্রোশী মনোভাব নিবৃত্ত হয় তা হলে একে সামান্য লাভ ব'লে মনে করা যায় না।

দাস্য-সখ্য ভাব যেখানে নিষ্কলুষ সেখানে আত্মত্যাগের আদর্শ এমন উচ্চ যে ঈশ্বরের জন্য কোনও ভক্তের আত্মত্যাগের চেয়ে হীন নয়, এর দৃষ্টান্ত ধাত্রী পান্না, কেষ্টা বেটা, Damon and Pythias, ভরত, লক্ষ্মণ প্রভৃতির বহু আখ্যানে ও ইতিহাসে বিধৃত আছে; আদর্শায়িত নিঃস্বার্থ স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের উদাহরণ আছে বিশ্বসাহিত্য জুড়ে আদিমকাল থেকে। বাৎসল্য ভাবের প্রভাবে সন্তানের জন্য চরম আত্মবিসর্জনের প্রবণতা শুধু মানুষের মধ্যে নয়,

সমগ্র জীব-জগতে ক্রিয়মাণ থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করছে, এ বিষয়ে হীন প্রাণীর কাছ থেকেও মানুষের কিছু শিক্ষনীয় আছে। মানুষের এই সব মহৎ চিত্তবৃত্তিগুলিকে দেবসেবায় নিয়োজিত ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব নিজেকে তদ্বারা চালিত করেছেন, ফলে ঈশ্বরের মান ও প্রভুত্ব বজায় রাখতে যে পরদ্রোহের প্রয়োজন তা তাঁদেরকে বর্তায় নি।

কালীয়দমন, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতিতে ঐশ্বর্যভাব আছে সেজন্য পদকর্তারা এ সবের বেশী উল্লেখ করেন নি। রাসেও ঐশ্বর্যভাব আছে কারণ সেখানে কৃষ্ণ বহুমূর্তি ধারণ ক'রে প্রত্যেক গোপীকে পরিতোষ করেছেন, যদিও এর এমন ব্যাখ্যা আছে যে কৃষ্ণের নৃত্যকৌশলে অলাতচক্রবৎ বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েছিলেন।[২৯] যাই হোক, রাসলীলা পদকর্তাদের দ্বারা নিম্নগ্রামে গীত হয়েছে। যে কয়টি স্থলে রাসবর্ণনা আছে তার অধিকাংশেই রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে গোপীরা বিরাজ করছেন, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের অবাধ মিলনের দৃশ্য নাই।

ঈশ্বরকে ঐশ্বর্যরিক্ত ভক্তরা করেন নি তিনি নিজেই করেছেন। মুসলমান আক্রমণ কালে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভ-গৃহ ত্যাগ ক'রে কূপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যরিক্ত হ'য়ে। সে কূপের নাম দেওয়া হয়েছে জ্ঞানবাপী। "রূঢ়" কথাটার সংজ্ঞার্থ যদি হয় "ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থ প্রকাশক শব্দ", তা হ'লে "জ্ঞানবাপী"কে রূঢ় শব্দ বলা যেতে পারে কারণ জ্ঞানের সঙ্গে সে বাপীর কোনও সম্বন্ধ নাই। পাণ্ডারা সে কূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে আজ তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে দর্শনী পায়, এবং যাত্রী দক্ষিণা দিয়ে পুন্যার্জন করে। বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতের উপরে গোপালের স্থিতি, কিন্তু

"ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে।"[৩০]

কিছু ঐশ্বর্য থাকলে হয়ত গোপালকে পালাতে হ'ত না।

## গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ

কৃষ্ণ প্রীতির বিষয় বা পাত্র। পরিকরগণ প্রীতির আশ্রয়, যেহেতু তাঁরা প্রীতিসম্পন্ন। বিষয়রূপে কৃষ্ণ যে আনন্দ আস্বাদন করেন তদপেক্ষা আশ্রয়রূপে পরিকরবর্গ যে আনন্দ অনুভব করেন তার চমৎকারিত্ব অধিক।

দ্বারকার মহিষীরা কৃষ্ণের সহিত বিবাহিতা, তাঁরা স্বকীয়া কান্তা। গোকুলে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী কেউ ছিলেন না, সকলেই ছিলেন পরকীয়া। যেসব গোপকন্যা কাত্যায়নী ব্রতপালন ক'রে কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমভাবাপন্ন ছিলেন এবং গোপনে মিলিত হ'তেন সেই সব অবিবাহিতা কন্যারা কন্যকা, এবং যাঁরা অন্যের

সহিত বিবাহিতা নারী তাঁরা পরোঢ়া; এই দুই প্রকার রমণী ছিলেন পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভা। পরকীয়ারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের আতিশয্য বশতঃ বেদধর্ম কুলধর্ম স্বজন আর্যপথ সমস্ত পরিত্যাগ করেছিলেন। পরকীয়া প্রেমের এক বিশেষ উত্তেজনা, চমৎকারিত্ব ও রসভোগ আছে।

"বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা
তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্।"[৩১]

স্ত্রীলোকগণের বামতা, দুর্লভতা এবং নিবারণ, এগুলিই পঞ্চবাণের পরম আয়ুধ ব'লে গণ্য। পরকীয়া প্রেমে এগুলি পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগ্য।

একমতে পরোঢ়া পরকীয়ারা অজাত-সন্তানা[৩২]; অন্য মতে তাঁদের সন্তান আছে[৩৩], অতএব গোপরা পতিম্মন্য নয়, ক্লীব নয়, তাঁরা পতি এবং সন্তানের জনক।

ব্রজবাসীদের সান্ত্বনা দেবার জন্য কৃষ্ণ মথুরা থেকে উদ্ধবকে ব্রজে পাঠিয়েছিলেন, উদ্ধব কয়েক মাস ব্রজে থেকে গোপীদের প্রেমবৈচিত্রী ও প্রেমের গাঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।"[৩৪]

ত্যাগ করা দুষ্কর এমন স্বজন-ও-সৎমার্গ পরিত্যাগ ক'রে যাঁরা শ্রুতি কর্তৃক অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদাঙ্ক অনুসন্ধান করেছেন, সেই গোপীদের চরণ-রেণু-সেবী বৃন্দাবনের লতাগুল্ম-ওষধীদের কোনওটি যেন হ'তে পারি। সকল বৈষ্ণবের কামনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। গোপীদের পরম গৌরবের কারণ এই যে তাঁরা প্রেমের জন্য ধর্মপথও পরিত্যাগ করেছেন। ধর্মপথে থেকে ভগবান লাভ করা সর্বশাস্ত্রের বিধান, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই অন্যথার জন্য, কুলত্যাগের জন্য ধিক্কার ত নয়ই, মর্যাদার মণ্ডপে গোপীদের বসানো হয়েছে, বলা হয়েছে যাঁরা পাতিব্রত্য ও লোকধর্ম পালন করেন তাঁরা লোকসমাজে সুনাম ও সম্মান লাভের জন্য অর্থাৎ আত্মসুখের জন্য করেন, গোপীরা সে সুখ ত্যাগ ক'রে স্বজনকৃত লাঞ্ছনা গঞ্জনা বরণ করেছেন কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত।[৩৫] কিন্তু এই পরকীয়া ভাব বৈষ্ণব ধর্মপ্রণেতাকে বিক্ষুব্ধ চিন্তিত করেছে, গোপীদের দোষমুক্ত করতে এবং সমাজ থেকে কুদৃষ্টান্ত পরিহার করতে তাঁদের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।

একটি অভিমত[৩৬] এই যে "শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে গোপগণের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। গোপগণ যাযাবর জাতি। যাযাবর জাতিদের ভিতর স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি সাধারণ প্রথা। ইহাকে রাস বলা হয়। কৃষ্ণ গোপ যুবক ও যুবতীগণ সহ

রাসনৃত্য করিতেন। ......যাযাবর জাতির মধ্যে সতীত্বের উচ্চ আদর্শ দেখা যায় না এবং পুরাকালে পুরুষের একাধিক নারীর প্রতি আসক্তিও দূষণীয় বিবেচিত হইত না। তৎকালীন সামাজিক আদর্শের হিসাবে কৃষ্ণের ব্যবহারে কোন দোষ স্পর্শে নাই। পরবর্তীকালে সামাজিক আদর্শ পরিবর্তিত হইলেও কৃষ্ণভক্তগণ রাসলীলাকে দোষের মনে করেন নাই; কৃষ্ণকে দেবতার আসন দেওয়ায় রাসক্রীড়া দেবতার লীলারূপে বিবেচিত হইয়াছে।" গোপরা যাযাবর জাতি নয়। যাযাবর জাতিরা সাধারণতঃ পশুপালক ও পশুনির্ভর হয় বটে, পশু তাদের খাদ্য বাহক, দুগ্ধ ও চর্ম সরবরাহক, পাহারাদার; কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পশু শুধু গরু এবং তার কাছে উপকার স্বরূপ পাওয়া যায় শুধু দুধ, তাও গোপদের নিজেদের পুষ্টির জন্য নয়, দুধ এবং দুগ্ধজ পদার্থ মথুরায় বিক্রয় করবার জন্য। সুতরাং এটা কোনও যাযাবর কলোনি নয়, এটা মথুরার ডেয়ারি ফার্ম। গোপরা একবার মাত্র স্থান পরিবর্তন করেছে, নেকড়ের উৎপাতে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে যেতে হয়েছে, যাযাবরদের মত ভ্রাম্যমাণ এরা নয়। যাযাবর বৃত্তির সামান্য নিদর্শন অবশ্য আছে। এদের বহু শকট রাখবার প্রথা, কৃষিকর্মের অনুল্লেখ, গাছ কাটবার প্রবৃত্তি, বোধ হয় শকট তৈরীর জন্য। হরিবংশে[৩৭] এবং বিষ্ণু পুরাণে[৩৮] কৃষ্ণের উক্তি এই মর্মে আছে, "আমরা চাষী বা বণিক নই, আমরা গোধন নিয়ে বনে ভ্রমণ করি, গোজাতি আমাদের দেবতা, আমাদের আবাসস্থান দ্বারবন্ধ দ্বারা আবৃত নয়, আমরা চক্রচারী।" ভাগবতে আছে[৩৯] গোকুল থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে গোপরা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত শকটসমূহের দ্বারা বাসস্থান নির্মাণ করলেন। এ থেকে মনে হয় এঁরা শকটবাসী ছিলেন, কিম্বা নেকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাসস্থানের চতুর্দিকে শকট সংস্থাপন করতেন।

দ্বিতীয়তঃ যাযাবর জাতিদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হ'য়ে নৃত্যের প্রথা আছে, কিন্তু রাস সে জাতীয় নৃত্য নয়, এখানে বহু নারীর মধ্যে শুধু একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ। তৃতীয়তঃ যাযাবর জাতির নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে ব্রজবাসীদের সম্বন্ধে সেটা খাটেনা। এক কৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়া আর কোনও পুরুষের বিষয়ে নৈতিক চরিত্রভ্রংশের কোনও আখ্যান নাই, সকলেই নিজপত্নীনিষ্ঠ। রাসে কৃষ্ণ ব্রজরমণীদের সহিত বিহার করেছিলেন, তারপরে বসন্তকালে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপীদের সঙ্গে অনুরূপ বিহার করেছিলেন। বলরাম যখন দ্বারকা থেকে ব্রজে এসে চৈত্র-বৈশাখ দুই মাস অবস্থান করেছিলেন তখন রজনীসমূহে গোপীদের সঙ্গে রমণ করেছিলেন।[৪০] যদি ধ'রে নেওয়া যায় এই গোপীরা কৃষ্ণপ্রেয়সী নয় অন্য গোপী, তা হলেও এ ধারণা অনিবার্য যে কৃষ্ণের ন্যায় তিনিও প্রেয়সী আকর্ষণ করেছিলেন; এঁরা দুজন ব্যতিক্রম। অতএব এ কথা বলা চলে না যে

গোপদের মধ্যে চারিত্রিক শ্লথতা ছিল, তা যদি হ'ত তা হ'লে রাসনৃত্যে অন্য পুরুষকে দেখা যেত। অথচ এ কথাও বলা চলে না যে তাঁদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল, যদি থাক্‌ত তা হ'লে কৃষ্ণকে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে গোপীদের নিয়ে নির্বিবাদে বহুরাত্রি ধ'রে রসরঙ্গনৃত্য করতে হ'ত না, গাঁয়ের মাতব্বররা নিশ্চয়ই বাধা দিত।

যাযাবর জাতি সম্বন্ধে উপরোক্ত অভিমত সমর্থন করে এমন তথ্য অবশ্য দুই-একটি আছে—কৃষ্ণ-বলরামের সহিত নারীদের অবাধ মিলন দেখা গিয়েছে শুধু গোপরমণীদের বেলায়, যেসব ব্রাহ্মণী কৃষ্ণের অনুরক্ত ছিলেন তাঁরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হন নি।[৪১]

"গোপ জাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার।"[৪২]

ভারবির কিরাতার্জুনীয় কাব্যে (৪/১৭) আছে অর্জুন তপস্যার জন্য হিমালয়ে যাচ্ছিলেন পথে গোপিকাদের দেখতে পেলেন। গোপিকারা অর্জুনের সম্পূর্ণ অপরিচিত কিন্তু অর্জুন তাঁদের দেখলেন বারবনিতারূপে। অর্জুনের সময়ে গোপিকারা শিথিল চরিত্র ছিলেন মনে হয়। এ থেকে অনুমান হয় অবারিত মিলন-প্রথা শুধু গোপসমাজেই আবদ্ধ ছিল এবং ছিল শুধু কৃষ্ণ-বলরামের ক্ষেত্রে। যে চরিত্রশৈথিল্য উত্তরকালে দ্বারকায় যদুবংশীয়দের মধ্যে লক্ষিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের ধ্বংসের কারণ, সে রকম কিছু বৃন্দাবনের গোপসমাজে দেখা যায় নি।

## রাসনৃত্য

ভক্তদের অভিমত এই যে ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অংশ রাসলীলার বর্ণনা, পাঁচ অধ্যায়ে বর্ণিত এই অংশের নাম রাস-পঞ্চাধ্যায়। "রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষস্তাং ক্রীড়াম্"[৪৩], বহু-নর্তকী-যুক্ত নৃত্যবিশেষকে রাস-ক্রীড়া বলে। এখানে পুরুষের উল্লেখ নাই। বর্তমানে গুজরাটে নারীরা শরৎকালে যে গরবা নৃত্য করেন সেটা এই প্রকারের। "শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়"[৪৪] শরৎকালোচিত সকল কাব্যকথার এবং সকল রসের আশ্রয় বা অবলম্বন এই রাস।

ভাসের বালচরিত্রম নাটকে (দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টিয় শতকে রচিত) হল্লীসকের নাম পাওয়া যায় তৃতীয় অঙ্কে, এই নৃত্যে একাধিক পুরুষ ও একাধিক রমণী অংশ গ্রহণ করত, বয়স্করা দর্শক হ'ত কিছুই গোপনীয় ছিল না। হল্লীসকের বা হল্লীসকের নাম হরিবংশে আছে কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে বা ভাগবতে নাই, হরিবংশে যে হল্লীসক নৃত্যের কথা আছে তা'তে শুধু রমণীরাই অংশ গ্রহণ করত, পুরুষরা বাদ্যবাদন করত।[৪৫] কিন্তু আর এক উৎসবের উল্লেখ আছে যেখানে বহু গোপীর মধ্যে কৃষ্ণই একা পুরুষ, এটি রাসের সমজাতীয়।[৪৬]

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের টীকায় অভিনব গুপ্ত বলেছেন—

"তদুক্তং চিরন্তনৈঃ

× × × × ×

মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্

একস্তত্র তু নেতা স্যাদ্‌গোপস্ত্রীণাং যথা হরিঃ ।"

মণ্ডলীবদ্ধ হ'য়ে যে নৃত্য হয় তা'কে হল্লীসক নৃত্য বলে, এই নৃত্যে একজন পুরুষ নেতা হন যেমন গোপস্ত্রীগণের নৃত্যে হরি। তামিল গ্রন্থ শিলপ্পদিকারমে[৪৭] (খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) রমণীরা নৃত্যকালে যে গান গেয়েছেন তা'তে কুরবৈ নৃত্যের বর্ণনা আছে। মায়াবন (= কৃষ্ণ) তাঁর স্ত্রী নাপ্পিন্নাই এবং বলরাম এই নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন, তাল রেখেছিলেন নারদ এবং গোপীরা, যশোদা ছিলেন দর্শক। এই নৃত্যের নাম কুরবৈ বা কুরবৈকুটটু। মনে হয় হল্লীসক বা কুরবৈ নৃত্য প্রকারে ছিল বর্তমানের আদিম জাতিদের যৌথনৃত্যের অনুরূপ যেখানে বহু যুবকযুবতী প্রকাশ্যে গীতবাদ্যসহ নৃত্য করে। একক পুরুষ বহু যুবতীর সহিত নৃত্য করছে নিভৃতে চন্দ্রালোকে, যুবতীরা গৃহসংসার ছেড়ে মিলিত হয়েছে স্বেচ্ছায়, এ রকমটি কোনও সমাজে পাওয়া যায় না, একে রূপক হিসাবে কল্পনা করাই সঙ্গত।

"নর্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ

যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ

তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা

রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ততে কিং পুনর্ভুবি ।"[৪৮]

যে নৃত্যে মণ্ডলাকারে বিচরণশীলা অনেক নর্তকীর মধ্যে একক নট নৃত্য করে তাকে পণ্ডিতগণ হল্লীশক বলেন। সেই (নৃত্য) যদি তালবন্ধ ও গতিভেদে বহুপ্রকার হয় তা হলে তা'কে রাস বলে, যা বোধ হয় স্বর্গেও বর্তায় না, মর্ত্যের আর কথা কি। একটি পাঠে রাসের স্থলে লাস্য কথাটি আছে, এইটাই হয়ত মূল পাঠ।

"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্

নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয়ো নর্তনম্ ।"[৪৯]

যে নর্তকীরা পরস্পরের হাত ধ'রে থাকেন একং নটরা যাঁদের কণ্ঠ ধারণ ক'রে থাকেন, সেই নর্তকীদের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাস বলে। এই সংজ্ঞানুযায়ী নট এক নয় বহু এবং তারা একান্তর ভাবে অর্থাৎ নটের পরে নটী তার পরে আবার নট, এই পর্যায়ে অবস্থিত নাই, নর্তকীরা হাত ধরাধরি ক'রে মণ্ডলীবদ্ধ হয়েছেন, নটরা তাঁদের নিকটে থেকে কণ্ঠ ধারণ ক'রে আছেন। অতএব ভাগবতে বর্ণিত রাস প্রকারে উপরোক্ত কোনটিই নয়, কারণ সেখানে গোপী বহু, এবং কৃষ্ণ এক হ'লেও বহুরূপ ধ'রে দুই দুই গোপীর মধ্যে অবস্থান করছেন মণ্ডলবদ্ধ হয়ে।

যৌথনৃত্যে বোধ হয় যতজন পুরুষ ততজন নারী থাকাই নিয়ম

ছিল, বর্তমানের অদিবাসীদের বা পাশ্চাত্ত্য দেশের নৃত্যে এই রকমটাই দেখা যায়। রাসে ধর্মপুরুষ কৃষ্ণের প্রবেশের পর থেকে বোধ হয় দ্বিতীয় পুরুষের কল্পনা নিষিদ্ধ হয়ে রাস এক নর্তক এবং বহু নর্তকীর সম্মিলিত নৃত্যে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে "নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া"[৫০] অর্থাৎ যে ক্রীড়ায় নৃত্যগীত চুম্বনালিঙ্গন ইত্যাদি রসের সম্পদ আছে তা-ই রাস। এই নিরুক্তি অনির্দিষ্ট ও অকার্যকর, কতকগুলি আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার উল্লেখে নৃত্যের মূল বৈশিষ্ট্য অনুক্ত থেকে গেছে। জীব গোস্বামী বলেছেন "রাসঃ পরমরসকদম্বময়ঃ ইতি যৌগিকার্থঃ"[৫১] রাস শব্দের যৌগিক অর্থ অর্থাৎ গঠন-বিচার-লব্ধ অর্থ এই—রাস পরমরসকদম্বময়। কদম্ব=সমূহ। এই বৈয়াকরণ বিশ্লেষণ রাসের প্রকৃতি নির্ণয়ে কিছুই সাহায্যে করে না।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে[৫২] হল্লীসকের উল্লেখ আছে। টীকায় বলা হয়েছে হল্লীসক একপ্রকার নৃত্য, যা'তে স্ত্রীলোকরা একটি পুরুষের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে নৃত্য করে, যেমন গোপীরা কৃষ্ণকে ঘিরে করেছিল—

"মণ্ডলেন চ যৎ স্ত্রীনাম্, নৃত্যম হল্লীসকম তু তৎ
নেতা তত্র ভবেদ একো, গোপস্ত্রীনাম যথা হরিঃ।"

রাস শুধুই একটি কার্তিক পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় নি, ভাগবতের শ্লোকে[৫৩] ব্যবহৃত বহুবচন থেকে মনে হয় বহু রজনীতেই রাস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যোগশক্তি বা অচিন্ত্যশক্তির বলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করলে এমন মূর্তিধারণকে বলে কায়ব্যূহ। বিষ্ণুর অবতাররা তাঁর কায়ব্যূহ স্বরূপ, সখীরা রাধার কায়ব্যূহরূপ। একই মূর্তি প্রয়োজন মত বহুতর স্থানে একই রূপে প্রকাশিত হ'লে এমন অভিব্যক্তিকে বলে প্রকাশ। রাসলীলায় কৃষ্ণের বহুমূর্তিধারণ তাঁর প্রকাশ।

রাসের মূল উৎস রাধা, তাঁকে বলা হয় রাসেশ্বরী, এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিমত। এক কৃষ্ণ বহু কৃষ্ণে পরিণত হয়েছেন, যোগমায়ার প্রভাবে গোপীরা দ্বিরূপ নিয়েছেন, এক রাধা যদি বহুতে পরিণত হ'তেন তা হলে আর কোনও গোপীর আবশ্যক হ'ত না, সকল আপত্তির কারণ দূর হ'ত।

রাসনৃত্যে গোপীদের মধ্যে বিবাহিতা নারী ও কন্যা দুই-ই ছিলেন[৫৪], তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন রাসগোষ্ঠীতে নৃত্যগীতবাদ্যের যোগে সরব অনুষ্ঠানে, দৈহিক মিলন ঘটেছে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যেক রমণীর, অথচ কোনও স্বামী কোনও পৌরজন প্রতিবাদ করে নি, এটি যে কোনও সমাজে অস্বাভাবিক অবিধেয় ব্যাপার।

কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যে কৃষ্ণের শত্রুপক্ষ আছে যেমন কংস বা শিশুপাল, কিন্তু ব্রজধামে কৃষ্ণপ্রীতিহীন লোকের অস্তিত্ব কৃষ্ণভক্তের পক্ষে অকল্পনীয়। তাঁরা বলেন ব্রজবাসীদের ক্রোধ কৃষ্ণপ্রীতি থেকে উদ্ভূত। গৃহবধূদের সঙ্গে অবৈধ প্রেমের প্রচেষ্টায় কৃষ্ণের প্রতি বৃদ্ধারা যখন ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, বৈষ্ণব তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন এই ব'লে যে পরস্ত্রীর সহিত মিলনে কৃষ্ণের ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে অধর্ম হ'বে এই আশঙ্কায় তাঁরা কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেছেন, এতে ক্রোধ নয় প্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে, ক্রোধ প্রকাশ কৃত্রিম।[৫৫] কৃষ্ণের গলায় রাধার হার দেখে জটিলা যখন তাঁর দিকে বিকট ভ্রুভঙ্গি করেছেন তখনও কল্যাণময়ী জটিলার প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে ভক্ত টীকাকার বলেন। সে সমাজে যেটুকু বাঁধন ছিল ভক্ত তাকেও অপ্রমাণ করতে চান, বলেন ব্রজের সমাজে কৃষ্ণের প্রতি কারও অসূয়া নাই— "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়।"[৫৬]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পরোঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ পুত্রবতী ছিলেন না "পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্যোঽপ্রসূতিকাঃ।"[৫৭] কিন্তু ভাগবত বলেন রাসে যেসব নারীরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পুত্রবতী ছিলেন; কিন্তু রাসে কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক মিলনের ফলে কোনও রমণী সন্তানসম্ভবা হ'ন নি কারণ কৃষ্ণ "আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ।"[৫৮] টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেছেন সৌরত বা চরমধাতু অবরুদ্ধ ছিল স্খলিত হয় নি। গোস্বামীমতে এটি লৌকিক ভোগসম্বন্ধহীনতা এবং কৃষ্ণের আত্মারামত্ব সূচিত করে। "শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রজদেবীগণ কখনও ঋতুমতি হয়েন না।"[৫৯] যাঁরা এতখানি অলৌকিকত্ব স্বীকার করেছেন তাঁরা আর একটু অগ্রসর হ'য়ে অবাস্তবের সম্পূর্ণতায় এলে সমস্ত বিষয়টি শোভন হ'য়ে উঠত।

## কৃষ্ণচরিত্র

রাসের বর্ণনা শুনে পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন— পরীক্ষিতের প্রশ্ন আমাদের সকলের প্রশ্ন—"ধর্মের সংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ স্বীয় অংশের সহিত অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি স্বয়ং ধর্মসেতুর (=ধর্মমর্যাদার) বক্তা কর্তা এবং অভিরক্ষক। তিনি কেন পরদারগমনরূপ বিপরীত আচরণ করলেন? তিনি যদি আপ্তকাম তা হলে এমন নিন্দিত কর্ম কোন অভিপ্রায়ে করলেন? এই বিষয়ে আমাদের মনের সংশয় নিবারণ করুন।"[৬০] উত্তরে শুক বললেন—

"ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্—যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ।
কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে
বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ।
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্যঙমর্ত্যদিবৌকসাম্
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ।
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
-স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ।
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ্যঃ ক্রীড়নে নেহ দেহভাক্ ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ।
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া
মন্যমানাঃ স্বপার্শস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ।"[৬১]

ঈশ্বরদের (ঐশ্বর্যসম্পন্ন সমর্থ ব্যক্তিদের) ধর্মব্যতিক্রম ও সাহস দেখা যায়, তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষে উহা দোষাবহ নয়, যেমন অগ্নির সর্বভক্ষণ (দোষাবহ নয়)। কিন্তু যিনি ঈশ্বর নন্ তাঁর কদাপি মনের দ্বারাও ঐরূপ আচরণ করা উচিৎ নয়, যদি মূঢ়তা-প্রযুক্ত কেউ আচরণ করে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; অরুদ্রকর্তৃক সমুদ্রজাত বিষ পানের মতন (অর্থাৎ রুদ্র ভিন্ন অন্য কেউ পান করলে বিনষ্ট হয়)। ঈশ্বরদের বাক্য সত্য (= গ্রহনীয়), আচরণ ক্বচিৎ সত্য, তাঁদের বাক্যের অবিরোধী (যে আচরণ) বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইরূপ আচরণ করবেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য ইঁহাদের কোনও স্বার্থ নাই, সুতরাং হে প্রভো! এইরূপ নিরহঙ্কারীদের বিপর্যয়ের (= বিপরীত কর্মের) অনুষ্ঠানে অনর্থের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরদের যদি কুশল অকুশল না থাকে তাহলে যিনি অখিল সত্ত্বের, পক্ষীদেবমানব ও সকল কাম্যবস্তুর নিয়ন্তা, তাঁর (কুশল অকুশল) কি ক'রে থাকবে? যাঁর পাদপদ্মের পরাগ আস্বাদনে তৃপ্ত এবং যোগপ্রভাবে অখিল কর্মবন্ধনমুক্ত মুনিগণ স্বেচ্ছানুসারে এবং বন্ধনহীন হ'য়ে বিচরণ করেন, ইচ্ছাগৃহীত-শরীর সেই ভগবানের কিরূপে (কর্ম) বন্ধন হ'তে পারে? যিনি গোপীদের, তাদের পতিদের এবং সকল দেহীর অন্তঃকরণ-চারী এবং অধ্যক্ষ্য, তিনি শুধু ক্রীড়ার জন্য দেহধারণ করেছেন। জীবগণের অনুগ্রহার্থে মনুষ্য দেহ আশ্রয় ক'রে তাদৃশ ক্রীড়া করেন যা শুনে (মানুষ) তৎপর (= ভগবৎপরায়ণ) হয়। ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হ'য়ে তাঁর প্রতি কোনও অসূয়া করেন নি, তাঁরা ভেবেছিলেন নিজ নিজ স্ত্রী স্বপাশেই আছেন।

"ধর্ম" শব্দের অর্থ এমন ব্যাপক যে শুক তার সুযোগ নিয়ে রাজাকে এবং শ্রোতাদেরকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন। যেখানে "ধর্মব্যতিক্রম" বলেছেন সেখানে ধর্ম অর্থে বিহিত আচার, নীতি-নির্দিষ্ট রীতি, এমন কি অনুষ্ঠিতব্য কর্ম, যা পালন করা বা না করা ব্যক্তির হাতে, যা পালন করলে যশ পুণ্য সুখ, না পালন করলে অপযশ পাপ দুঃখ। তারপরে "ধর্ম" শব্দটিকে অগ্নির সঙ্গে জড়িত ক'রে বলেছেন দাহনকার্য তার পক্ষে দোষাবহ নয় এখানে ধর্মের অর্থ স্বভাব, নিজস্ব গুণ, যার অভাবে লক্ষিত বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অগ্নির ধর্ম দাহন ও উত্তাপ সৃষ্টি, এই চরিত্রগত গুণের অভাবে অগ্নিকে ভাবাই যায় না, দাহন যে অগ্নির দোষ বা গুণ তার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ধর্মব্যতিক্রম ও সাহস, এমন কি দুঃসাহস এক পর্যায়ে পড়ে না। দুঃসাহস বহুস্থলে প্রশংসনীয়, বীরসৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃসাহস দেখিয়ে অনেক সময়ে জয়ী হয়, কিন্তু ধর্মব্যতিক্রম সর্বদাই নিন্দনীয়; বস্তুতঃ ধর্মরক্ষা করাই অনেক সময়ে সাহসের পরিচয় হয়।

শুকের ব্যাখ্যা নৈতিক নয় প্রায়োগিক বা উপযোগ-ধর্মী। এটা খুবই সত্য যে-কাজ শক্তিমান তেজীয়ান পুরুষের পক্ষে সুফলপ্রদ সে-কাজ দুর্বলের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। মাতৃহত্যা ও অগণিত ক্ষত্রিয় হত্যা করেও পরশুরামের কোনও অনুতাপের উদয় হয় নি, তিনি বিষ্ণুর অবতারত্ব এবং অমরত্ব লাভ করেছেন, সাধারণ মানুষ এঁর অনুকরণ করলে অনুশোচনার ফলে বাঁচতে চাইবে না, অমরত্ব দূরের কথা। শুক একনায়কত্বের উপদ্রব সমর্থন করছেন না, বলছেন যার যা ধর্ম সে তা পালন করবেই, আগুন সব কিছু পোড়াবে শক্তিমান সব কিছু গ্রাস করবে এইটাই স্বাভাবিক।

এর পরের উক্তিটিও শুকের অভিজ্ঞতা-জাত, যুগে যুগে দেখা গিয়েছে যাঁরা প্রতাপশালী যাঁরা দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের কাজে ও কথায় দুস্তর প্রভেদ; আমাদের নীতিকথায় এমন লোককে বিশ্বাস করতে বারণ করা হয়েছে কিন্তু শুক ততটা চরমপন্থী নয়, এমন লোকের বাক্যে মূল্যবান যদি কিছু থাকে তিনি তাকে গ্রহণ করতে বলেছেন, আচরণ অনুকরণ করতে নিষেধ ক'রে। নিয়ন্তা নিয়মাধীন হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু তিনি যদি তা না হ'ন তা হ'লে তাঁর আচরণ পরিত্যাজ্য হ'লেও তাঁর বাক্য বর্জনীয় নয়। এখানেও শুকের উক্তি প্রয়োজনিক, ব্যবহারিক, শুদ্ধনৈতিক নয়।

এ ছাড়া শুকের কোনও উপায় ছিল না। মানুষ দোষগুণের আধার সুতরাং মানুষের আচরণ সব ক্ষেত্রে শোভন ও অনুকরণীয় নয়, সে কারণে মানুষের শিক্ষার জন্য সব দেশে সব কালে এমন অপ্রাকৃত আদর্শপ্রতিম মানব বা অতিমানবের কল্পনা করা হয়েছে যারা দোষ-বর্জিত গুণসর্বস্ব, যাদের অনুকরণ অবাধে করা যায়। কিন্তু কৃষ্ণকে

বা গোপীদেরকে এ পর্যায়ে ফেলা যায় না। গীতায়[৬২] আছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন ইতরজন তা-ই অনুকরণ করে, তিনি যা প্রামাণিক মনে করেন অন্যজন তা-ই অনুবর্তন করে। এটা অবশ্যম্ভাবী। শুক হয়ত ভেবেছিলেন যে লীলাধর কৃষ্ণ এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নয় যাঁর আচরণ সাধারণে অনুকরণ করবে বা করা উচিৎ।

মহাদেবের গরল পানের উপমা অনুত্তরিত, ওৎরায় নি। গরল পানে মহাদেব শুধু নিজের বিপদ-সম্ভাবনা ডেকে এনেছেন, পরদার গমনে কৃষ্ণ সমাজের সমূহ বিপদ আহ্বান করেছেন।

কিন্তু এর পরে শুক যে যুক্তির অবতারণা করলেন তা'তে তাঁর প্রতিষ্ঠা সমর্থিত হয় না, বললেন পরম দেবতা কৃষ্ণের কুশল অকুশল কিছু থাকতে পারে না, কোনও গর্হিত আচরণেই তাঁর কর্মবন্ধন হ'তে পারে না। কিন্তু এ যুক্তি কতদূর গ্রাহ্য হতে পারে? কৃষ্ণের জন্ম অলৌকিক নয় মানবীর গর্ভে মানবের ঔরসে জন্মেছেন, জীবনধারণে আহারনিদ্রার উপরে নির্ভরশীল, বিবাহ করেছেন সন্তানের জনক হয়েছেন, ভারতযুদ্ধে পক্ষ নিয়েছেন বিস্তর ছলচাতুরী ক'রে পাণ্ডবদের জয়ী করেছেন, জরানামক এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়— জরার কবলে প'ড়ে জীবমাত্রেরই মৃত্যু হয়—তাঁর দেহের অগ্নিসৎকার হয়েছিল[৬৩], অতএব অলৌকিকত্ব কিছু নাই। তা হ'লে শুধু নৈতিক আচরণের বেলায় তাঁকে সমাজানুগ নিয়মের বশবর্তী মনে করা যাবে না কেন? সমাজ-নৈতিক নিয়ম দেবাসুর রাক্ষসের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, পরদার গমনের বা পরদার হরণের জন্য ইন্দ্রচন্দ্র দেবতারা, তপঃপ্রভাবে অর্জিত-তেজ মুনি, রাবণের মত পরাক্রান্ত রাক্ষস শাস্তি পেয়েছেন, শুধু অবতারের বেলাতেই এর ব্যতিক্রম হবে এতে যুক্তি আছে কতটুকু? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন[৬৪] "কৃষ্ণের নিজকৃত অনৈসর্গিক কর্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি মানব-শরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা। কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম-সম্পাদন করিবেন, তবে তাহার মানব-শরীর ধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্বকর্তা সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়,—যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্য-শরীর ধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশীশক্তির প্রয়োগ দ্বারা যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবীশক্তি দ্বারা বা ঐশীশক্তি দ্বারা কার্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাঁহার মনুষ্য-শরীর ধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।" এই উক্তির

সম্প্রসারণে বলা যায় যিনি ইচ্ছাপূর্বক মনুষ্য-শরীর ধারণ করেছেন মানুষের নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনও তাঁর উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হতে পারে না।

ভগবানের কর্মবন্ধন হতে পারে কি পারে না এই কূট প্রশ্নের সমাধান-নির্ণয় আমাদের ততটা বিচলিত করে না যতটা করে ভক্তের কি গতি হল সেই প্রাসঙ্গিক সংশয়। পরীক্ষিতের প্রশ্ন ছিল কৃষ্ণের আচরণের কারণ সম্বন্ধে, শুকের উত্তর এই আচরণের ফলাফল নিয়ে, কৃষ্ণ যে পাপের ভাগী হলেন না, তিনি যে ফলাফলের ঊর্ধ্বে, তাঁ'তে যে পাপপূণ্য বর্তায় না শুক এই কথাই বললেন। পরীক্ষিতের কথা জানি না কিন্তু আমরা কৃষ্ণের পাপের চিন্তায় শশঙ্কিত নই, আমরা ভীত এই ভেবে যে নিবারণ সত্ত্বেও লোক কৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করবে। আমরা জানি এই অনুকরণ-স্পৃহা কী অশোভন আকারে উদ্ভূত হয়ে সহজিয়াদের কৃষ্ণ-রাধাত্মক স্বদেহ-কল্পনায় দেশ ছেয়েছে, কী সামাজিক ব্যভিচার ও ক্ষতি এনেছে। এবং এক মহাপুরুষের চরিত্রবলের এবং শুদ্ধাভক্তির সাহায্যে সেই প্রবণতা কি ক'রে নিয়ন্ত্রিত প্রতিবদ্ধ হয়েছিল, সম্পূর্ণ নিবারিত না হ'লেও।

এর পরে শুক যা বললেন তার সারার্থ মেনে নিলে পরকীয়াতত্ত্ব সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হয়ে স্বচ্ছকান্তিতে উজ্জ্বল হয়, তা'তে কোনও বিরোধের কোনও কলঙ্কের অবকাশ থাকে না। কৃষ্ণ সকল দেহধারীর অন্তঃকরণে আছেন, শুধু গোপীদের নয় তার পতিদের এবং সকলের, তাঁর কাছে কেউ পর নয়, কেউ পরদার হ'তে পারে না। যদি মনে রাখা যায় যে কৃষ্ণ এবং তাঁর পরিকরগণ সকলেই স্বরূপশক্তির বিকাশ সুতরাং কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের পরকীয়া সম্পর্ক হ'তেই পারে না— এই মতবাদ ভাগবত রচনার সময়ে ছিল না, উদ্ভূত হয়েছে তার অনেক পরে—তা হলে শুকের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণলীলাকে allegory না ব'লে উপায় নাই, কারণ অন্তর্যামীর সঙ্গে মানস-সম্পর্ক সম্ভব কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেহ-সম্পর্ক এমনই স্বতঃবিরোধী যে একমাত্র allegory-র আশ্রয় নিয়ে হৃদয়-সম্বন্ধ দেহের ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে। কৃষ্ণ যখন মথুরায় প্রয়াণ করলেন তখন কৃষ্ণকে আত্মা জ্ঞান করেই গোপীদের বিরহের উপশম হয়েছিল।[৬৫] এ যুক্তি অনুসরণ করে কৃষ্ণকে দেহধারী না ভেবে অন্তরাত্মা মনে করলে সকল দ্বিধার অবসান হয়, রাসলীলাদি কৃষ্ণকেলি আত্মার মিলনের রূপকে নির্মল আলোকে প্রতিভাত হয়; কিন্তু প্রকট লীলার বাস্তবিকত্বের হানি হয় দেখে কোনও ভক্ত এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে চান না।

পরীক্ষিতের পূর্বানুমান এই যে কৃষ্ণ ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের নিবারণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাকে নস্যাৎ ক'রে শুক যা

বললেন তা'তে উত্তর পাওয়া গেল পরীক্ষিতের প্রশ্নের—কৃষ্ণের এমত আচরণের কারণ কি। অনেকগুলি নঞর্থক উক্তির পরে একটি মূল্যবান সদর্থক উক্তি পাওয়া গেল, কৃষ্ণের মরদেহ ধারণের কারণ; জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ হয়ে তিনি এমন ক্রীড়া করেন যা শুনে মানুষের মন তাঁর অভিমুখী হয়। পরকীয়া প্রেমের কাহীনী শুনতে কার না লোভ হয়। কিন্তু গোস্বামীরা মনে করেন পরকীয়া কাহিনী শুনে লোকেরা কৃষ্ণের প্রতি শুধুই যে আকৃষ্ট হয় তা নয়, ভক্তিমান হয়।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন পার্বতী[৬৬], এবং মহাদেব যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে কোনও যুক্তি নাই। মহাদেব বললেন "কৃষ্ণের স্বদেহে এবং পরদেহে ভেদ নাই। এই নিখিল জগৎই তাঁর অঙ্গ, পৃথক কিছুই নাই। সেই মহাপুরুষের স্ত্রীপুংভেদ লক্ষিত হয় না। সেই নৈসর্গিক জগৎপতি জগৎব্যাপী প্রভু পরমাত্মদেবের ভর্তৃত্ব আত্মেশত্ব তথা পাপহরণের সামর্থ্যবশতঃ এ ব্যাপারে দোষ কিছুই নাই।"

রূপ গোস্বামী যে অনুজ্ঞা দিয়েছেন তা শুকের বক্তব্যের অনুরূপ, তবে তিনি আরও কিছু সদর্থক কথা বলেছেন—

"বর্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্ন তু কৃষ্ণবৎ
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্যস্য বিনির্ণয়ঃ
রামাদিবদ্বর্তিতব্যং ন কচ্চিদ্রাবণাদিবৎ
ইত্যেষ মুক্তিধর্মাদিপরাণাং নয় ঈর্ষ্যতে।"[৬৭]

কল্যাণ-ইচ্ছাকামীর কর্তব্য ভক্তবৎ আচরণ করা কৃষ্ণবৎ নয়, সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে এইটাই নির্ণিত তাৎপর্য। রামাদির ন্যায় ব্যবহার করা উচিৎ রাবণাদিবৎ নয়—এই নীতি মুক্তি-ধর্মাচরণকারী প্রভৃতির প্রতি প্রযোজ্য (ভক্তের প্রতি নয়)।[৬৮] কৃষ্ণের আচরণ বা রামের আচরণ কোনওটিই ভক্তের পক্ষে অনুকরণীয় নয়, মুক্তিকামী অবশ্য ইচ্ছামত করতে পারেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে রূপগোস্বামী ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এমন দুরত্ব সৃষ্টি করলেন যে ভগবান বা তাঁর কোনও অবতারের কার্য ভক্ত অনুকরণ করতে পারবেন না, পাছে ভক্ত নিজেকে ভগবান মনে করেন। এই সতর্কতার অবশ্য আবশ্যক ছিল সহজিয়া মতবাদ প্রভৃতির প্রতিবিধানের জন্য। কিন্তু এও মনে করা যেতে পারে যে শুকের অনুকরণ-নিষেধ-বাক্য রূপ গোস্বামী দ্বিরুচ্চারণ করেছেন, এবং একই কারণে করেছেন, অর্থাৎ অনুকারী সমাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। যাই হোক, এখানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল কৃষ্ণের আচরণের চেয়ে ভক্তের আচরণের অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠতা।

উপোরক্ত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন কি রকম ভক্তের আচরণ অনুকরণীয়। তিনি

বলেছেন সিদ্ধের বা ভক্তের আচরণ অনুকরণীয় নয় কারণ তাঁরাও স্বৈরাচারে সমর্থ। সাধক ভক্তদের মধ্যে শুধু তাঁদেরই অনুকরণ করা উচিৎ যাঁরা ভক্তিশাস্ত্রের বিধিসমূহ মেনে চলেন। অতএব চরম সিদ্ধান্ত হল এই যে না কৃষ্ণের না কোনও ভক্তের, কারও আচরণ বিশ্বসনীয় নয়, একমাত্র শাস্ত্রবিধিই আচরণীয়। দুষ্টবিধান ছিঁড়ে ফেলা যায় দুষ্ট লোককে সরানো মুশকিল।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।"[৬৯]

যে ধীর পুরুষ ব্রজবধূদের সহিত কৃষ্ণের রাসক্রীড়া শ্রদ্ধার সহিত বারবার শ্রবণ ও বর্ণন করে সে ভাগবতী পরাভক্তি লাভ ক'রে শীঘ্রই কামবিকাররূপ হৃদয়রোগ থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করে। গ্রন্থপাঠে পাঠকের কতখানি পুণ্য অর্জন হ'ল পুষ্পিকায় সাধারণতঃ তারই উল্লেখ থাকে কিম্বা থাকে হিতকামনা বা আশীর্বচন, কিন্তু এখানে গ্রন্থকার একটি ভিন্নতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির কথা বললেন, হৃদয় থেকে কামভাব দূরীভূত করা। রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রতি আক্রমন কোন দিক থেকে আসবে তিনি জানতেন এবং নিপুণ যোদ্ধার মত সেই দিকটাই আগেভাগে ঠেকিয়ে রাখলেন, বললেন এতে কোনও কামভাব নাই বরং এটি কামভাবের প্রতিশেধক।

## পরকীয়া রস

যে সমস্ত ব্রজনারীদের সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা করেছিলেন তাঁরা হয় কাত্যায়নী-ব্রত পালনকারী কুমারী কন্যা আর নয় পরোঢ়া, উভয় ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী নয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে পরকীয়া রস অনমোদিত নয়, কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ্‌গণ অন্য ভাব পে ষণ করেন।

"নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ।"[৭০]

নাট্যশাস্ত্রে মুখ্যরসে (= মধুর রসে) পরস্ত্রী যে নিষিদ্ধ হয়েছে, সেই নিষেধ হয়ত শুধু প্রাকৃত ক্ষুদ্রনায়িকাদি সম্বন্ধেই (প্রযোজ্য)।

"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি।"[৭১]

এখানে (ঔপপত্যের) লঘুতা (= অধর্ম) সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেটা প্রাকৃত নায়কে (প্রযোজ্য) কৃষ্ণে নয়, তিনি রসনির্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছেন।

"রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা"[৭২]

পরকীয়া অবলার প্রয়োজনে যিনি অনুরাগহেতু ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেন

(তিনি উপপতি)।

"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ।"[৭৩]

কবিগণ অঙ্গী (= মধুর) রসে যে পরোঢ়া নায়িকা ইচ্ছা করেন নি, তা গোকুলের কমলনয়নাগণ ব্যতীত অন্য (নায়িকা) সম্বন্ধে; রসিকমণ্ডল শিরোমণি কংসারি তাঁদের (=গোকুলরমণীদের) অবতারিত করেছেন রসের প্রকার বিশেষ আস্বাদনের জন্য ।

ভাবগতে যে যুক্তি আছে কৃষ্ণের আচরণ সম্বন্ধে, এখানেও অনুরূপ যুক্তি দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে, সেটা এই যে নৈতিক দৃষ্টিতে দেখলে পরকীয়া-প্রেম নিন্দনীয় হ'তে পারে কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে ব্যতিক্রম, কারণ তাঁর লীলা অপ্রাকৃত, এমন লীলা বর্ণনা কবির পক্ষে অনুপযুক্ত অশোভন হ'তে পারে না । পরকীয়া ভাব গোলোকে নাই সেজন্য এই বিচিত্র রস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ মর্ত্যে আগমন করেছিলেন ।

মনে হয় কৃষ্ণের এই শেষোক্ত আচরণ আমাদের অনুকরণীয় । গোলোকে পরকীয়া নিষিদ্ধ, সর্বশক্তিমান ভগবান সেখানে এ রীতি প্রচলন করবার চেষ্টা করেন নি, ক্রীড়ার জন্য তিনি মর্ত্যে এসেছিলেন যেখানে পরদারগমন নিন্দনীয় হলেও প্রচলিত । গোলোকের বিহিত নৈতিক ধর্ম তিনি মেনেছিলেন, প্রথা লঙ্ঘন করেন নি । অন্য দিকে যে সব ধর্মবেত্তারা নির্ধারণ করেছেন যে ঔপপত্য নিন্দনীয় শুধুই প্রাকৃতজনের পক্ষে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁরাই আবার সকল উদ্ভাবনী-শক্তি নিয়োজিত করেছেন প্রমাণ করতে যে গোপীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া, পরকীয়া নয় । এই দ্বিমতিত্ব কেন?

ভাগবতে কৃষ্ণের আচরণের সমর্থক যুক্তিপ্রদ বাক্য আছে[৭৪], তিনি গোপীদের নিরস্ত করেছিলেন, বলেছিলেন পতিসেবা, আত্মীয়স্বজনের শুশ্রূষা, সন্তান পালনই স্ত্রীলোকদের পরম ধর্ম, উপপতির সংসর্গ ধর্মবিরোধী ও সর্বত্র নিন্দিত । অবশ্য এর পূর্বেই তিনি গোপীদের সহিত ক্রীড়া করবার মানসে যোগমায়াকে নিয়োজিত করেছিলেন[৭৫], সুতরাং তাঁর উপদেশ মৌখিক ও নিয়মগত বলেই মনে হয় । যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজগোপীরা রাসনৃত্যে যোগ দিলেও তাদের পতি পিতা বা আত্মীয় তাদের অনুপস্থিতি বুঝতে পারে নি, ভেবেছিল নিকটেই আছে ।[৭৬] এ ছাড়া যোগমায়ার আর কোনও কার্য নাই, কৃষ্ণ এবং গোপীদের উপর যোগমায়ার প্রভাব নাই, তাঁদের সকলেরই স্বাভাবিকী পরকীয়া-প্রতীতি আছে ।

রাসলীলাকে নিষ্কাম বিদেহ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়াস ভাগবতে নাই, কৃষ্ণের গীত অনঙ্গবর্ধক[৭৭], গোপীরা কামসন্তপ্ত[৭৮],

তাঁরা কৃষ্ণের করকমল প্রার্থনা করেন বক্ষোজে ধারণ করবার জন্য[৭৯], কৃষ্ণ গোপীদের কামভাব উদ্দীপ্ত করেছেন[৮০], কৃষ্ণ কামী[৮১], এরকম উক্তি বহু আছে। অন্য দিকে কৃষ্ণ ও গোপীদের আচরণের সমর্থনে এও বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ক্রীড়ার পাত্রী গোপীগণ কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নয়, তাঁরা কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ, এবং বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে কৃষ্ণও গোপীদের সঙ্গে সেইরূপ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করেছেন।[৮২] সব কিছু আনুপূর্বিক মিলে যাচ্ছে শুকদেবের উক্তির সঙ্গে, সমস্তটাই কৃষ্ণের ক্রীড়া এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে লোকের মন আকর্ষণের জন্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণের উপাসনা মন্ত্রকে স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে কাম-বীজ, কাম-গায়ত্রী; কামসূত্রের বীট, বিদূষক, পীঠমর্দ প্রভৃতি প্রকারে কৃষ্ণসখাদের বিভাজন করা হয়েছে।

## স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে রাধা কৃষ্ণের পত্নী, তামিল গ্রন্থ শিলপ্পদিকারমে নাপ্পিন্নাই (=রাধা) মায়বনের (কৃষ্ণের) বিবাহিত, সুরদাস বিহারী প্রভৃতি হিন্দী কবির ভক্তিকাব্যে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া। হালের গাথায়, জয়দেব বিদ্যাপতির কবিতায় রাধা শুধু কৃষ্ণের প্রেয়সী।

ভাগবতে পরকীয়াত্ব স্বীকৃত, তা'কে আবৃত করবার চেষ্টা নাই। গোপীরা শুধুই বিবাহিতা পুত্রবতী নয়, তাঁরা ছিলেন পতিপরায়ণা, রাসে যাবার পূর্বে অনেকেই পতির শুশ্রূষা করেছিলেন।[৮৩] এই প্রাকৃতিক বিষয়কে বিকৃত করবার কোনও চেষ্টা ভাগবতে নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়া সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং কিছু পুরাণেও এর প্রতিধ্বনি উঠেছে যা আমাদের গোচরে আসে। মনে রাখতে হ'বে এই বিষয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতানৈক্যের মধ্যে সাধারণ-প্রযোজ্য অর্থাৎ অবিতর্কনীয় বিষয় শুধু একটি, সেটি এই যে কৃষ্ণের অবতারত্বের কারণ পরকীয়া-রস-আস্বাদন, অতএব কোনও মতবাদেই কৃষ্ণের পক্ষে এ রস-সম্ভোগ যেন ব্যাহত না হয়।

একটি মত এই যে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই কৃষ্ণপ্রেয়সীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া। "স্বকীয়া"র সাধারণ অর্থ বিবাহিতা পত্নী, "পরকীয়া"র অর্থ অপরের পত্নী বা অবিবাহিতা কন্যা; অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া পরকীয়া দুটি শব্দই অর্থহীন কারণ সেখানে বিবাহ ব'লে কিছু নাই, কারণ বিবাহ-সম্বন্ধের আরম্ভ আছে অথচ কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণপরিকরদের সম্বন্ধ অনাদিকাল থেকে। কিন্তু প্রকট লীলায় বিবাহের প্রয়োজন আছে নইলে স্বকীয়াত্ব প্রতিপাদিত হয় না। অতএব অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শুধুই কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত

বিগ্রহ। স্বরূপশক্তির অর্থ স্বাভাবিকী বা স্বকীয়া শক্তি, অতএব এই অর্থে প্রেয়সীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া, এঁরাই রাধা ও গোপীরূপে বৃন্দবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একদিকে যেমন কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেউ তাঁদের পতি হ'তে পারেন না, অন্য দিকে কোনও পার্থিব রমণীর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হওয়া অসম্ভব।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে[৮৪] আছে নন্দ শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে গোচারণ করছিলেন এমন সময়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কৃষ্ণ ভয়ে কাঁদতে লাগলেন, সেই সময়ে রাধিকা সেখানে উপস্থিত হ'লে নন্দ তাঁর হাতে শিশু কৃষ্ণকে সমর্পণ করেন। রাধিকা শিশু কৃষ্ণকে বক্ষে চেপে নিয়ে বনে প্রবেশ করেন, তখন কৃষ্ণ কিশোর রূপ ধারণ ক'রে রধিকার সঙ্গে বিহারে প্রবৃত্ত হ'লেন। সেই সময়ে সেই নির্জন বনমধ্যে ব্রহ্মা রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদন করেন, এ ব্যাপার আর কেউ অবগত ছিলেন না। গর্গসংহিতায়[৮৫] অনুরূপ বৃত্তান্ত আছে। জয়দেবের গীতিকাব্যের প্রথম দৃশ্যে এই পুরাণ-আখ্যানের ছায়া আছে, তবে পণ্ডিতরা অনুমান করেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ গীতগোবিন্দের অনেক পরে লেখা। গৌতমীয়তন্ত্রে[৮৬] উল্লেখ আছে যে কৃষ্ণ গোপীদের পতি।

পুরাণ মতে বিবাহ হয়েছে গোপনে, কৃষ্ণ ও রাধা সমাজের চক্ষে অবিবাহিত, সুতরাং তাঁদের মিলিত হ'তে হয়েছে যেন তাঁরা পরকীয়া প্রেমের বশবর্তী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণকে পরকীয়া রস যোগাতে হ'বে, কিন্তু পুরাণে তার অবসর নাই কারণ কৃষ্ণ জানেন তিনি রাধার সহিত বিবাহিত। রূপ গোস্বামী বলছেন[৮৭] যে- গোপকুমারীগণ কাত্যায়নী ব্রতপালন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের গান্ধর্ববিবাহ হয়েছিল কিন্তু সমাজ-নিন্দার ভয়ে এরাঁ মিলিত হ'তেন গোপনে, পরকীয়ার ন্যায়। এখানেও সেই একই পরিস্থিতি, কৃষ্ণ এবং গোপীরা জানের তাঁরা বিবাহিত কিন্তু লোকসমাজে প্রকাশ করবার উপায় নাই। শুধু এইটুকু গোপনতা পরকীয়া রসের সবখানি উল্লাস যোগাতে' পারে কিনা সন্দেহ।

ভাগবত অনুসারে কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাবার পরে আর প্রত্যাগমন করেন নি, কুরুক্ষেত্রে একবার গোপীদের সহিত কৃষ্ণের মিলন হয়েছিল।[৮৮] পদ্ম পুরাণের মতে[৮৯] কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে একবার মথুরায় এসেছিলেন, সেখানে দন্তবক্রকে বধ করবার পরে বৃন্দাবনে যান। কৃষ্ণ পিতামাতকে অভিবাদন করলেন গোপবৃদ্ধদের বস্ত্রাভরণ প্রদান ক'রে তৃপ্ত করলেন, গোপীদের সঙ্গে তিনদিন বিহার করলেন; জীব গোস্বামীর মতে দুমাস অবস্থান করেছিলেন।[৯০] জীব গোস্বামী বলেন[৯১] সেই সময়ে গোপরা নিজ নিজ কন্যাকে কৃষ্ণের সহিত শাস্ত্র ও লৌকিক রীতি অনুসারে বিবাহ দেন। কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বে গোপীদের বিবাহ হয় নি কারণ গর্গমুনি বলেছিলেন যে বিবাহের পরে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হবেন।[৯২] সে কারণে পৌর্ণমাসী গোপদের সঙ্গে

গোপকন্যাদের মিথ্যাবিবাহ নির্বাহ করেছিলেন।[৯৩] তবে এটা ঠিক যে এই বিবাহ রাস-লীলার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এই বিবাহের কিছুকাল পরেই কৃষ্ণ ব্রজলীলা শেষ ক'রে গোপীগণ সহ অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেন। অপ্রকট লীলায় গোপীরা যে কৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা এ কথাও গ্রন্থকার কলেছেন। অন্যত্রও জীব গোস্বামী পরকীয়াত্ব অস্বীকার করেছেন "তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে"[৯৪], কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীগণের নিত্যসম্বন্ধ হেতু পরকীয়াত্ব সঙ্গত হয় না।

রূপ গোস্বামীর ললিতমাধব নাটকে গোপীরা কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ ক'রে পরজন্মে দ্বারকায় কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহিত হ'লেন। এর সমর্থনে জীব গোস্বামী বলেছেন "আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয় (রূপ গোস্বামী) ললিতমাধবে এইরূপেই সমাপন করেছেন"[৯৫] রূপ এবং জীব গোস্বামী দুজনেই কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার এবং গোপীদের বিবাহের ব্যবস্থা দিলেন কিন্তু বিবাহ হ'ল কৃষ্ণ কর্তৃক পরকীয়া রস আস্বাদন করবার পরে সুতরাং যে কারণে কৃষ্ণ অবতার হয়েছেন সেই পরকীয়া-সম্ভোগ সম্ভব হ'ল; অন্যদিকে প্রথানুযায়ী বিবাহ হওয়ায় গোপীদের ধর্মরক্ষা হ'ল অভিনব উপায়ে। পরকীয়ার মাদক রস পানের অসংযমের পরে তাকে গঙ্গাজলে রূপান্তরিত ক'রে শ্যাম ও কূল দুটিই রাখবার উদ্দেশ্যে তত্ত্ববিদরা যে চেষ্টা করেছেন তা অসাধারণ।

যাঁরা পরকীয়াবাদী তাঁরা বলেন জীব গোস্বামী স্বকীয়াবাদ সমর্থন করলেও তিনি প্রচ্ছন্ন পরকীয়াবাদী এবং যুক্তি হিসাবে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করেন—

"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া
যৎপূর্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্বমপরং পরম।"[৯৬]

কিছুটা স্ব-ইচ্ছায় লিখেছি কিছুটা পরের ইচ্ছায়। যেখানে পূর্বাপর সম্বন্ধ (অব্যাহত আছে) সেখানে প্রথমের অর্থাৎ স্বেচ্ছায় লিখিত, আর অন্যটি পরেকার, অর্থাৎ যেখানে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নাই সেটা পরের ইচ্ছায় লিখিত। পরকীয়াবাদীরা বলেন এই উক্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে জীব গোস্বামী অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বকীয়াবাদ সমর্থন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন জীব গোস্বামীর এই উক্তি প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু তা না হ'তেও পারে। আরও একটি সমর্থক যুক্তি এই যে জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূতে[৯৭] রাধিকা "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটি আবৃত্তি করেছেন, এই শ্লোকটিতে অবশ্যই পরকীয়া নায়িকার মনোভাব ব্যক্ত। ধর্মযাজকদের দৌরাত্ম্যে গ্যালিলিওকেও পরের ইচ্ছায় সায় দিতে হয়েছিল, তাঁর সুবিবেচিত অভিমত ছিল যে সূর্যের চারিদি'ক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী হওয়ায় তিনি ধর্মাচারীদের সামনে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে না; পরে চাপা গলায়

যোগ করেছিলেন "তবুও ঘুরছে, and yet it moves।"

দ্বিতীয় মতে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই গোপীরা কৃষ্ণের পরকীয়া। এই মতের প্রধান সমর্থক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—"গোপীনাং পরকীয়াত্ব-দর্শনাৎ সর্বগোপীশিরোমণিঃ সাপি পরকীয়ৈব।......ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষ্যণ্যমস্তীতি।"[৯৮]

গোপীদের পরকীয়াত্ব থেকে জানা যায় সর্বগোপীশিরোমণি রাধারও পরকীয়াত্ব। প্রকট ও অপ্রকট লীলার মধ্যে স্বরূপগত কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু এই ঔপপত্য নিন্দনীয় নয় কারণ কোনও অধর্ম কৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারে না। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর যুক্তির সারমর্ম এই যে রাধিকার এবং গোপীদের প্রেমের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁদের পরকীয়াত্ব—যে প্রেমের প্রবল আকর্ষণে তাঁরা পতি, স্বজন, আর্যপথ পরিত্যাগ করেছেন সেটি পরকীয়া প্রেম, এবং এই প্রেমকে প্রতীকার্থক বললে প্রেমোৎকর্ষের আসল কারণটাই অপ্রকাশিত থেকে যায়। পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে মিলনে দুস্তর বাধা এবং এই বাধা ভেদ ক'রে মিলনস্পৃহাকে সার্থক করা উৎকর্ষের প্রধান লক্ষণ; এ বিষয়ে তিনি ভাগবতের অনুসরণ করেছেন—কৃষ্ণ যে-গোপীপ্রেমে বশীভূত এবং যার-প্রতিদানে অক্ষম সেই প্রেমের শ্রেষ্ঠতার কারণ গোপীদের জারবুদ্ধিতে উপাসনা। প্রকটলীলাকে মায়িক মনে করলে অনুরাগের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে অস্বীকার করা হয়। কৃষ্ণপ্রেয়সীরা যে স্বরূপশক্তির অংশ এই তত্ত্ব পরকীয়াবাদের অন্তরায় নয় কারণ লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণই সকলের ভজনীয়।

রূপ গোস্বামী পরকীয়াত্ব স্বীকার করেছেন তবে বলেছেন কৃষ্ণের পক্ষে এরূপ আচরণ দোষাবহ নয়।[৯৯] "অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ"[১০০] এই (ঔপপত্যেই) শৃঙ্গারের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত। রূপগোস্বামী কবি, অতএব তাঁকে পরকীয়া-তত্ত্ব সমর্থন করতে হয়েছে নইলে তিনি অভিসার, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা এসব দুর্লভ মানস-রসায়ন কোথায় পেতেন!

পরকীয়া প্রেমের সামর্থনিক উক্তি রূপ গোস্বামী উদ্ধৃত করেছেন—

"রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য
বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলীভরপরিমলধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ।"[১০১]

যার রত্নরাজির কান্তিতে সমুদ্র উদ্ভাসিত এমন মন্দিরে দ্বারকায় রুক্মিণীকর্তৃক আলিঙ্গিত এবং পুলকাঞ্চিত হ'য়েও কৃষ্ণ যমুনাতীরবর্তী মসৃণ বেতসকুঞ্জে রাধার সহিত কেলিসমূহের পরিমলের ধ্যানে মূর্ছিত হয়েছিলেন।

"ক্রীড়ারত্নগৃহে বিড়ম্বিতপয়ঃফেণাবলীমার্দবে
তল্পে নেচ্ছতি কল্পশাখিচমরীরম্যেঽপি রাজ্ঞাং সুতাঃ

কিন্তু দ্বারবতীপতির্ব্রজগিরিদ্রোণীবিলান্তঃ শিলা–
পর্য্যঙ্কোপরি রাধিকারতিকলাং ধ্যায়ন্ মুহুঃ ক্লাম্যতি।"[১০২]

ক্রীড়ার্থ-নির্মিত রত্নমণ্ডিত প্রাসাদে দুগ্ধফেনকেও বিড়ম্বনা দেয় এমন কোমল এবং কল্পবৃক্ষের মঞ্জরীসজ্জিত শয্যায় রাজকন্যাগণকেও দ্বারকাপতি অভিলাষ করেন না, কিন্তু ব্রজের গিরিকন্দরে স্থিত শিলাশয্যায় রাধিকার রতিকলাবৈচিত্রী ধ্যান করে তিনি মুহুর্মুহুঃ অবসাদগ্রস্ত হচ্ছেন।

পরকীয়া রসের গোপন প্রেম চৈতন্যের অনুমোদিত, তিনি একে বৈধ প্রেমের উপরে স্থান দিয়েছেন, নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রে রথযাত্রার সময়ে নৃত্য করেছিলেন, মনে করেছিলেন রথারোহণে জগন্নাথ গুণ্ডিচায় নয় বৃন্দাবনে গমন করছেন–

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
-স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"[১০৩]

যে আমার কৌমার্য হরণ করেছে সে-ই এখন আমার স্বামী, আজও তেমনিই চৈত্র রজনী, তেমনিই বিকশিত মালতি ফুলের সুগন্ধবাহী মন্দ মন্দ কদম্ব-বন-বায়ু বইছে, সেই আমিও আছি, কিন্তু আমার চিত্ত সুরতব্যাপারে রেবাতটে বেতসী তরুতলের জন্য সমুৎকণ্ঠিত। প্রণয়ী এক হ'লেও অবস্থার পরিবর্তন এসেছে; অকস্মাৎ-লব্ধ সুযোগে গোপন প্রেমের স্বেচ্ছায় অথচ শঙ্কান্বিত আত্মদানের স্থানে এসেছে বৈধ বাঁধাগৎ, নিত্য আনুষ্ঠানিক দেহ-সংসর্গ, সেই কারণে বধূর বিলাপ। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বল্পপ্রেমের রূপকে বর্ণিত বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ল স্বাধীন স্বনির্বাচিত আত্মদান, গোপন প্রেমের পশ্চাৎপটে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত গাঢ় রাগানুগা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা, উন্মুক্ত হ'ল বৈষ্ণব সাধনায় ও কাব্যে পরকীয়া প্রেমের উৎস। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের কাব্য চৈতন্যের প্রিয় ছিল, এঁদের কাব্যে রাধার পরকীয়া ভাব কোথাও স্বাধীন কোথাও পরাধীন, এঁদের দৃষ্টান্তে এবং চৈতন্যের পক্ষপাতে পরকীয়া ভাব বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'ল।

উত্তরকালে তাত্ত্বিক ও কবিরা অনেকেই যুক্তিসহ পরকীয়াবাদ সমর্থন করেছেন যেমন শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, রাধামোহন।[১০৪] কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাবধান ক'রে দিয়েছেন শুধু ব্রজলীলাতেই পরকীয়াভাব অনুমত, সাধারণের জন্য নয়–

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।"[১০৫]

যে বিশেষ পরিবেশে উপরোক্ত শ্লোকটি চৈতন্য আবৃত্তি করেছিলেন তা'তে মনে হয় আরও একটি ভাব এতে নিহিত আছে।

রথে অধিষ্ঠিত জগতের নাথের সাড়ম্বর অভিযাত্রায় শুধুই যে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশ পেয়েছে তা-ই নয়, রথের দঙ্গলে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শোভাযাত্রায় পরম দয়িতকে পাওয়া যেন ভাগের সম্পত্তি পাওয়া, বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে একান্ত আপনভাবে নিবিড়ভাবে পাওয়ার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যদি রাগাত্মিকা ভক্তির প্রধান নির্দেশনা হয় মদীয়তা অর্থাৎ "তিনি আমার" এই ভাব তা হলে এমন ভক্ত কখনও জনতা-বাহিত ভগবানে তৃপ্তি পাবেন না।

পরকীয়া প্রেম ভাগবতের ভিত্তি, এর অন্যথায় অন্য মত প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, কাম্যও নয়। কিন্তু বৃন্দাবনলীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করলেও অপ্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব-প্রতিষ্ঠা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব চেষ্টা হয়েছে অপ্রকটে ছদ্ম-পরকীয়াত্ব প্রবর্তনায়। তৃতীয় মতানুসারে প্রকট লীলায় পরকীয়াত্বে অভ্যস্ত ব্রজগোপীরা অপ্রকটেও এই ভাবটি প্রচল রাখতে চান, অন্ততঃ পরকীয়া-প্রতীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, যদিও সেখানে তাঁরা পরকীয়া নয়।

"ততো নানালীলা বিদধদহমালীভিরনব–
স্ব-বৃত্তান্তং গীতপ্রচুরমভিনীতঞ্চ পরিতঃ।
ত্বয়া সার্দ্ধং শৃণ্বন প্রকটমনুপশ্যংশ্চ বহুধা
গতাগতপ্রেমাণ্যসকৃদনুভূতানি করবৈ।"[১০৬]

তারপর আমি প্রকটে সখীদের সহিত আমার নানাবিধ বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় গীতসমূহ তোমার সহিত শুনে এবং সর্বতোভাবে অভিনীত বিষয় দর্শন ক'রে নানারূপে নিরন্তর আস্বাদ্য প্রেম অনুভব করছি। অতএব গোলোকেও প্রকট লীলার পরকীয়া রস-আস্বাদন চলছে, এমনই তার মাদকতা। সত্য না হ'লেও অভিনয় হিসাবেই চলছে।

"যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি।
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্।
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্যপ্রিয়া জনাঃ
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্।"[১০৭]

যেমন প্রকট লীলা সম্বন্ধে পুরাণসমূহে কীর্তিত হয়েছে সেইরূপ ভূবৃন্দাবনের নিত্যলীলাতেও তাঁর সেই প্রকার। (কৃষ্ণ) অসুর বধব্যতীত বনে ও গোষ্ঠে নিত্য গমনাগমন করেন, বয়স্যগণের সহিত গোচারণ করেন। তাঁর নিত্য প্রেয়সীবর্গ পরকীয়াভিমানিনী, তাঁরা যেন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ প্রিয় (কৃষ্ণের) সঙ্গে রমণ করেন।

চতুর্থ মত এই যে গোপীরা অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া, প্রকট লীলায় পরকীয়া অথচ পরকীয়া-দোষমুক্ত। কৃষ্ণকে পরকীয়া-প্রতীতি এবং গোপীদেরকে সতীত্ব-আভরণ যুগপৎ দিতে গিয়ে আচার্যদের উদ্ভাবনী শক্তিকে যথাসম্ভব আলোড়িত নিষ্পীড়িত ক'রে এমন তথ্য

খাড়া করতে হয়েছে যা অসম্ভাবিতার কারণে যদৃচ্ছ আবিষ্কারের কোঠায় পড়ে। নায়কের কাছে পরকীয়া "রসের উল্লাস" তখনই সর্বাধিক যখন পরস্ত্রী হয়েও নায়িকা অরমিতা; এবং কোনও উপায়ে এমন অবস্থা সংঘটিত করতে পারলে কৃষ্ণকে পরকীয়া রসের সর্বোচ্চ আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে গোপীদেরকে দ্বিচারিণী হওয়ার গ্লানি থেকে বাঁচানো যায়। এমনটি করা যায় শুধু এই ব'লে যে গোপদের সঙ্গে গোপীদের বিবাহ হ'লেও সঙ্গম হয় নি যেকোনও কারণেই হোক, যার মধ্যে একটা সম্ভাব্য কারণ গোপদের ক্লীবত্ব। তাই বৈষ্ণবাচার্যরা বলেন গোপীদের সহিত রাধা ও গোপদের বিবাহ মায়াময়, বাস্তব নয়, যাঁদের পতি বলা হয় তাঁরা বাস্তবিক পতি নয়, পতিম্মন্য, গোপদের সহিত বিবাহ সহবাস সবই প্রতীতিমাত্র। এ কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয় নি যে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল, অতএব তাঁদের স্বকীয়া বলা যায় না, যেমনটি বলা যায় দ্বারকার মহিষীদের যাঁরা কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী।

"শ্রীকৃষ্ণৈক-প্রিয়া ভগবত্যস্তা গোপ্য কথঞ্চিৎ কশ্চিৎ-জাতবিবাহা অপি নামমাত্রেণেব পতিমত্যো বিবিধব্যাজেন পতীন্ বঞ্চয়ন্ত্যস্তৈঃ সহাঙ্গসঙ্গাভাবেনাজাতপত্যা এব কেবলং পত্যাদীনামাগ্রহেণ নিজকৌতুকবিশেষেণ বা তাস্বেব কাশ্চিৎ পরপুত্রান্ পুষ্টপুত্রতয়া পালয়ন্তীতি স্বতঃ স্তন্যাভাবেন তান্ গোদুগ্ধমেব পায়য়ন্তীতি।"[১০৮] কৃষ্ণই যাঁদের একমাত্র প্রিয় সেই সব গোপীদের কোনও প্রকারে কারও সঙ্গে বিবাহ হ'লেও তাঁরা ছিলেন নামমাত্র পরিণীতা, বিবিধ ছলনায় তাঁরা পতিদের বঞ্চনা করায় তাদের সঙ্গে অঙ্গসঙ্গ হয় নি, অতএব কোনও সন্তান উৎপন্ন হয় নি। শুধু পতিদের অনুরোধে এবং নিজেদের কৌতুকের বশবর্তী হয়ে তাঁরা পরপুত্রকে নিজের পুত্রের মত পালন ক'রে পরিপুষ্ট করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের স্তনদুগ্ধ না থাকায় তাঁরা সেই (শিশুদের) গোদুগ্ধ পান করাতেন। ভাগবতে আছে[১০৯] যে গোপীদের সন্তান ছিল, অতএব স্বামীসঙ্গম হয়েছিল।

রূপ গোস্বামীর ললিতমাধব নাটকে[১১০] পৌর্ণমাসী বলছেন "কুমারীগণের প্রতি পতিম্মন্য গোপদের যে ভার্যাত্ববুদ্ধি, সেটা শুধু মমতামাত্রেই পর্যবসিত, কারণ প্রকৃতপ্রস্তাবে এঁদের দর্শনলাভও তাঁদের পক্ষে দুর্ঘট হয়েছিল।" বিদগ্ধমাধব নাটকে[১১১] পৌর্ণমাসী বলছেন "তদ্‌বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য", বঞ্চনা করবার জন্য যোগমায়া বিবাহরূপ মিথ্যাকে সত্যের ন্যায় প্রতীত করেছেন, বস্তুতঃ সকলেই কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। প্রথমতঃ যোগমায়া নামে কোনও চরিত্র নাটকে নাই। দ্বিতীয়তঃ এই মিথ্যা প্রতীতি রাধার কাছে না অভিমন্যুর কাছে না অন্য লোকের

কাছে তা রূপ গোস্বামী পরিস্ফুট করেন নি।

"মায়াকলিত-তদৃক্ স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ।"[১১২]

(গোপগণ) মায়াকল্পিত তাদৃশ স্ত্রীগণ দর্শনে অসূয়া করেন নি, সেই পতিদের সহিত ব্রজদেবীগণের কখনও সঙ্গম হয় নি। গোপীরা যখন রাসে গিয়েছিলেন তখন যোগমায়া গোপীদের মায়ামূর্তি সৃষ্টি ক'রে গোপদের এই ধারণায় প্রতারিত করেছিলেন যে তাঁদের পত্নীরা গৃহেই আছেন।[১১৩] মনে করা যেতে পারে এই প্রতিমূর্তি শুধু রাসের সময়টুকুতেই ছিল কারণ ভাগবতে অন্যত্র এর উল্লেখ নাই। রূপ গোস্বামী এই মায়াকল্পিত মূর্তিকে চিরস্থায়ী করলেন, বললেন গোপীদের পতিসঙ্গম আদৌ হয় নি।

ভাগবতের ১০/৩৩/৩৮ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যায় এবং রূপগোস্বামীর উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় জীব গোস্বামী বলেছেন "অতএব ব্রজগোপীরা বস্তুতঃ কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, কেবল ব্রজবাসীরা ভ্রমবশতঃ তাঁদের মায়াকল্পিত ছায়ামূর্তিকে নিজ নিজ পত্নী মনে করেছিলেন। সে সমস্ত পতিদের সহিত ব্রজদেবীদের কখনও সঙ্গম বা পাণিগ্রহণ সম্বন্ধ হয় নি। সুতরাং কৃষ্ণের পরদারত্ব মিথ্যা এবং তজ্জনিত দোষারোপও মিথ্যা।"

ভাগবতে আছে গোপীরা জারবুদ্ধিতে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, জীব গোস্বামী বলেন "জার ইতি যা বুদ্ধিস্তয়াপি তন্মাত্রেণাপি সঙ্গতাঃ, ন তু সাক্ষাদ্ এব জার রূপেন প্রাপ্তাঃ"[১১৪], গোপীদের বুদ্ধিতে কৃষ্ণ তাদের উপপতি, এই (কল্পনা) টুকুই সঙ্গত, কারণ কৃষ্ণকে তারা সত্যই জাররূপে প্রাপ্ত হয় নি (কারণ জার সম্বন্ধ ছিল না)। গৌড়ীয় মতে যোগমায়ার প্রভাবেই এই জারবুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছিল।

জীব গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ প্রকরণের ষোড়শ শ্লোক "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তাং"-এর লোচনরোচনী টীকায় এবং মুখ্যসম্ভোগপ্রকরণের অষ্টাদশ শ্লোক "তবাত্র পরিমৃগ্যতা" শ্লোকের ব্যাখ্যায় অপ্রকটলীলাবিষয়ে স্বকীয়াত্ব এবং প্রকট লীলায় ছদ্মপরকীয়াত্ব স্থাপন করেছেন। "শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি"[১১৫] কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের নিত্যদাম্পত্য, পরকীয়াত্ব মায়িক মাত্র।

জীব গোস্বামী কয়েকটি গ্রন্থে এ বিষয়ে আলেচনা করেছেন। "প্রযত্নে নোপপাদনাজ্জারত্বঞ্চ প্রাতীতিকমাত্রম"[১১৬] অর্থ—কৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা ক'রে (যোগমায়ার সাহায্যে) উপপতি সেজেছিলেন এটা প্রতীতিমাত্র। "অথ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ"[১১৭] ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ পরমস্বকীয়া কান্তা হ'লেও প্রকট লীলায় পরকীয়া রূপেই প্রতীয়মানা। "তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যব-

হারেণেত্যর্থঃ। পরম লক্ষ্মীণাং তাসাং পরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ যৎ প্রাপঞ্চিক-প্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা ব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং স এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে।"[১১৮] অর্থ এই যে তবুও (কৃষ্ণ প্রেয়সীরা) স্বরূপশক্তিরূপা স্বকীয়া, প্রকট লীলার পরদারবৎ ব্যবহার এঁদের নয়। কৃষ্ণের পরম লক্ষ্মীদের পরদারত্ব অসম্ভব, রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠা বর্ধনের জন্য এবং পৌরুষ প্রকাশের জন্য প্রকট লীলায় (অপ্রকটের) স্বদারত্বময় রস মায়া কর্তৃক কৌতুকবশতঃ তাদৃশ (=পরদারানুরূপ) ব্যঞ্জিত হয়েছে বুঝতে হবে। যিনি প্রাপঞ্চিক প্রকট লীলায় পরদারতা-পরিবেশে বাস করেন তিনিই আবার অপ্রকট লীলাস্থলে গোলোকে বাস করেন নিজ-রূপতায় অর্থাৎ স্বদার-ব্যবহারে। "অত্র রসোৎকর্ষস্য তর্ষত এব 'কংসারিণাবতারিতানা' মিতি তাসাং নিত্যং তন্নিজপ্রেয়সীতয়া বিহারস্তদবতারসময় এব তু রসময়মহোৎকর্ষায় মায়য়া পরোঢ়া-ব্যবহার ইত্যতো ন দোষঃ প্রত্যুত পরমগুণ এবেতি ভাবঃ। ইহ চাবতারিতানামিতি দেবীচরতাং সাধারণ লক্ষ্মীচরতাং চ ন প্রচারয়তি।"[১১৯] রসের উৎকর্ষ বাসনা করেই কংসরিপু রমণীদের অবতারিত করেছিলেন। ঐ সকল রমণী কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী রূপে বিহার করতেন, তাঁদের অবতার সময়েই রসপূর্ণ মহোৎকর্ষের জন্য মায়া দ্বারা পরকীয়া ব্যবহার হয়ে থাকে; এই কারণে এতে কোনও দোষ লক্ষিত হয় না, বরং একে পরম গুণই বলতে হ'বে, এই তাৎপর্য। এইস্থলে গোপীগণ যে পূর্বকালে দেবী বা লক্ষ্মী ছিলেন এরূপ ভাব প্রচারিত হয় নি।

গোপালতাপনী উপনিষদে[১২০] কৃষ্ণকে গোপীদের স্বামী বলা হয়েছে, ভাগবতে[১২১] গোপীরা "কৃষ্ণবধূ", গৌতমীয়তন্ত্রে[১২২] কৃষ্ণ গোপীদের পতি, জীব গোস্বামী এই সকল উক্তিকে স্বপক্ষে নিয়ে নিজমত পুষ্ট করেছেনঃ প্রকৃতপক্ষে গোপীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া, পরকীয়াত্ব প্রতীতি-মাত্র।

জীব গোস্বামীর মতে যোগমায়া আত্মগোপনের জন্য পৌর্ণমাসী নামধারণ ক'রে গোপদের সঙ্গে গোপকন্যাদের মিথ্যাবিবাহ সংঘটন করেছিলেন, এই বিবাহ স্বপ্নদৃষ্টের মত; গোপীদের অঙ্গসঙ্গম হয় নি।[১২৩] অথচ গোপীরা পতিগৃহেই থাকতেন পিতৃগৃহে নয়, এবং মনে করতেন তাঁরা কৃষ্ণের সহিত জাররূপেই মিলিত হচ্ছেন। পৌর্ণমাসী বললেন "যে সময়ে বসুদেবের মন্ত্রণায় নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে গর্গমুনি রাধিকা প্রভৃতি কন্যাদেরকে দেশান্তরে নিয়ে যেতে বৃষভাণু প্রভৃতিকে উপদেশ দেন, তৎকালে আমি আপনাদের মনোরথ জানতে পেরে মায়াশক্তি প্রেরণ করি। সেই মায়ার এইরূপ শক্তি যেন সকল

লোকেই স্বপ্ন দেখছে। এইরূপ স্বপ্নসম্পাদনকারিণী মায়াশক্তিদ্বারা আমি রাধিকাদি কন্যাগণের অভিমন্যু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত বিবাহের ভাণমাত্র নির্বাহ করি। যেসকল লোক মনে করত আমরা এদের পতি, তাদের স্ত্রীসহবাসাদি অন্যায় প্রবৃত্তি লক্ষ্য ক'রে আমি সেই মায়াশক্তি দ্বারা (যাতে অপরে দেখতে না পায়) এইরূপ ভাবে মায়াশক্তিনির্মিত অথচ রাধিকাদির সমানাকৃতি কতিপয় কন্যাও নির্বাহ করেছি।"[১২৪]

এই জটিল ধাঁধার সংক্ষেপ-সার এই যে গোপদের সহিত গোপীদের বিবাহ কাল্পনিক হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ এবং গোপীরা নিজেদের পারস্পরিক প্রেমকে মনে করতেন অবৈধ অতএব লোভনীয়, গোপীদের অন্য পুরুষস্পর্শ হয় নি তাঁরা কৃষ্ণগতপ্রাণা, মিলন হ'ত গুরুজনের দুরন্ত বাধা দূর ক'রে। পরকীয়ার আনন্দ-চমৎকারিত্ব ও স্বকীয়ার শালীনতা দুই-ই একসঙ্গে রাখবার প্রয়াস। যোগমায়ার প্রভাবে ঔপপত্য সত্যরূপে প্রতিভাত শুধু কৃষ্ণ ও গোপীদের কাছে, যদিও সর্বৈব মিথ্যা।

পদ্ম পুরাণ উত্তরখণ্ডে আছে দন্তবক্র বধের পরে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এসেছিলেন এবং তৎপরে নন্দগোপাদি সর্বজন এমন কি পশুপক্ষীমৃগাদি সবকিছু বিমান যোগে বৈকুণ্ঠে গেলেন। কৃষ্ণের স্বকীয়া বলেই গোপীদের এই অধিকার লাভ হল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণ এবং গোপীগণ সকলেই মনে করেন যে তাঁদের প্রেম পরকীয়া—

মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।"[১২৫]

অবএব পরিস্থিতি এই যে গোপীরা আসলে স্বরূপশক্তির বিকাশ এবং স্বকীয়া হ'লেও কৃষ্ণ জানেন এই রমণীরা বহিরাগন্তুক, তাঁর সহিত বিবাহিতা নয়, অবএব তিনি পরকীয়া-সম্ভোগ রস উপভোগ করছেন; গোপরা নিজ নিজ স্ত্রী নিয়ে সুখী, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ নাই, যদিও তাঁদের স্ত্রীরা গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন; একমতে গোপীরা অবগত নয় যে গোপদের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হয়েছে অতএব কৃষ্ণমিলনে তাঁদের পরকীয়া-পাপবোধ ছিল না, অন্য মতে তাঁরা জানেন না যে তাঁরা কৃষ্ণের স্বকীয়া অতএব মনে করেছেন যে তাঁরা গোপদের সহিত বিবাহিত অথচ তাদেরকে পতি ব'লে স্বীকার করেন নি, পত্নীরূপ আচরণ করেন নি, কৃষ্ণই তাঁদের প্রাণবল্লভ যদিও কৃষ্ণকে পরপুরুষ বলেই মনে করতেন। জীবভক্ত এই কল্পনাতেই রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবা করবেন।

কৃষ্ণকে পরিবেশন করতে হ'বে পরকীয়া রস, যুগপৎ কৃষ্ণকে এবং গোপীদেরকে স্থাপিত করতে হবে সকল দোষের ঊর্দ্ধে, এর জন্য যে-

পরিমাণ উদ্ভাবনী-দক্ষতার প্রয়োজন এবং নানারূপ অসঙ্গতিকে একত্র করার আবশ্যক, সেসব অনুধাবন করলে যদুনন্দন দাসের মন্তব্য অসমীচীন মনে হয় না–

"বাহ্যার্থে বুঝয়ে তাঁহা স্বকীয়া বলিয়া
ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া ।।
শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া
বহির্লোকে বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া ।।
গ্রন্থের মমার্থ বুঝ এল পরকীয়া ।"[১২৬]

পরকীয়া তত্ত্বকে শোভাময় করতে কতকগুলি ভক্ত-ভুলানো রূপকথা সৃষ্টি করতে হয়েছে যা হয়ত শ্রষ্টারাও বিশ্বাস করতেন না ।

## পরকীয়া–প্রেম অভিনয়মাত্র

একদিকে পরকীয়া প্রেম সমাজবহির্ভূত গর্হিত কুফলপ্রসু, অন্য দিকে গোপীদের স্বজন আর্যপথ প্রভৃতির ত্যাগ হেতু পরম নিঃস্বার্থতা ও প্রেমোন্মাদনার দৃষ্টান্তে গরীয়ান্ । এই দুর্ঘট বিভ্রাটের সমাধান করতে অবতীর্ণ হয়েছেন যোগমায়া, যেমন আবির্ভাব হ'ত গ্রীক ট্রাজেডিতে deus ex machina, দুর্মোচ্য জটগ্রন্থি নির্জট করতে । যে অনির্বচনীয় শক্তি কৃষ্ণ ও লীলাপরিকরদের ধরায় অবতারণ করিয়েছিল, সেই শক্তি প্রভাব বিস্তার করল এঁদের উপরে, মায়াধীশ ঈশ্বর হলেন মায়ার বশ ।

কিন্তু যোগমায়ার উপস্থিতি কি আবশ্যিক ? পরকীয়াভাব যে প্রতীতিমাত্র মায়িকমাত্র, রাধা ও কৃষ্ণের ধারণা যে তাঁরা কলুষিত প্রেমে লিপ্ত যদিও তাঁরা বাস্তবিক স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধিত – এ ধারণা কি অন্য উপায়ে সৃষ্টি করা যায় না ? এই অপার্থিব কল্পনাকে নৈসর্গিক স্তরে আনতে হ'লে বলা যেতে পারে যে এটি তাঁদের শুধু অভিনয়, এবং এরাঁ নিজ নিজ ভূমিকায় এমন আত্মহারা যে অভিনয়কালে বিশ্বাস করেন তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ পরকীয়া, ভুলে যান তাঁরা স্বামী-স্ত্রী । গোপবেশী নটরা শুধু রঙ্গমঞ্চেই গোপীদের স্বামী, রঙ্গালয়ের বাইরে কোনও সম্পর্ক নাই ।

আমরা দেখেছি পরীক্ষিতের উত্তরে শুক কৃষ্ণের পরদারগমনরূপ বিধি-বহির্ভূত কার্যকে প্রথমে শক্তির অবশ্যম্ভাবী অপব্যবহার ব'লে প্রতিরক্ষা করলেন, পরে বললেন ধর্মাধর্ম মানুষে প্রযোজ্য কিন্তু পরমপুরুষে নয়, আরও পরে লীলাপ্রসঙ্গে এসে যখন বললেন এই সকল ক্রীড়া জীবগণকে অনুগ্রহ করবার জন্য অনুষ্ঠিত, তখন আর সমর্থনের প্রয়োজন রইল না, কৃষ্ণের আচরণ দেখা দিল বৈষ্ণব-তোষণী চিত্তাকর্ষণ রূপে । শ্রীধরস্বামী এই বিনোদনের দিকটাই বিশদ করলেন এই বলে[১২৭] যে শৃঙ্গাররসে আকৃষ্ট-চিত্ত অত্যন্ত বহির্মুখ

ব্যক্তিকেও এইভাবে ঈশ্বর আত্মাভিমুখী করেন। আধুনিক বৈষ্ণব-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতারা যে এই মতের বিরোধী তা মনে হয় না। "স্বকীয়াতে পরকীয়ার আরোপের কথা জানিতে পারিলে সামাজিকের মনে অস্বস্তির পরিবর্তে কৌতুকাবহ আনন্দেরই উদয় হয়" ১২৮। এই উক্তিতে স্পষ্টতঃই নাটকের ইঙ্গিত আছে, সামাজিক যেন নাটকের কোনও কৌতুককর ঘটনায় আনন্দ উপভোগ করছেন। "শ্রীভগবান... আপনিই আপনার পর সাজিয়া স্বকীয়-দিগকে পরকীয় ভূমিকায় নট সাজাইয়া নটনাথ রূপে জগৎ-নাট্যশালায় অবতীর্ণ হন।"১২৯

গভীর বিষয়ের আলোচনা দেবতা-সম্বন্ধীয় হ'লেও, যদি তুচ্ছ এমন কি নীতিবিগর্হিত উপমার দ্বারা বিশদিকৃত হ'তে পারে তাহলে মনীষীরা তা'তে দোষ দেখেন না; যেমন "প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎস্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা"১৩০ ভগবানের কথা সাধুর কাছে প্রতিক্ষণেই নূতনবৎ, যেমন স্ত্রীলোকের কথা কামীজনের কাছে (প্রতিক্ষণেই নূতন)।

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্।"১৩১

পরপুরুষে আসক্তা নারী গৃহকর্মে ব্যাপৃত থেকেও মনে মনে (পরপুরুষের সহিত) পূর্বকৃত নবসঙ্গমসুখ আস্বাদন করে (সেই রকম বর্ণাশ্রমধর্মপালন হ'তে বঞ্চিত বৈষ্ণবভক্ত হরির ভজনা করেন)। অতএব কৃষ্ণলীলাকে অভিনয় ব'লে দেখলে যদি বুঝবার সুবিধা হয় তা হলে বোধ হয় কোনও অপরাধ হবে না। পরমপুরুষ কৃষ্ণের পক্ষে দেহধারণ ও বিভিন্ন লীলা করা, নটের মায়াময় অভিনয়ের মত মনে করা হয়েছে ভাগবতে।১৩২

মনে করা যেতে পারে প্রকট লীলা একটা অভিনয় মাত্র, অভিনয় করছেন কৃষ্ণ এবং তাঁর স্বরূপশক্তির নিত্য-পরিকরগণ; এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট লীলায় অভিনয় করছেন যেমন নাটকীয় দল সচরাচর ক'রে থাকে দেশবিদেশে গিয়ে। জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে পূতনাবধ, গোবর্ধনধারণ, রাসলীলা, কংসবধ প্রভৃতি মৃত্যু পর্যন্ত একই অনুক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের পরে ব্রহ্মাণ্ডে বারবার হয়ে যাচ্ছে, কোনও পরিবর্তন নাই১৩৩, ভ্রাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠী বিভিন্ন স্থানে গিয়ে একই নাটকের অভিনয় প্রদর্শন এই ভাবে করে। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধিত, কিন্তু নাটকে নায়িকা যেন অন্যের সঙ্গে বিবাহিত, নায়কের পরস্ত্রী; তাঁরা অভিনয় করছেন পরপুরুষ পরস্ত্রীর ভূমিকায়। এই অভিনয় লোকরঞ্জনের জন্য এবং শুধু সমঝদার দর্শকের জন্য। আমরা পরে দেখব অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের ব্যাখ্যায় এই যে রসিক শুধু রস গ্রহণ করেন, তাঁর কোনও কর্ম-উৎসাহ নাই, তিনি নাটকীয় কোনও

চরিত্রের অনুকরণ করেন না; বৈষ্ণব আচার্যও প্রধান চরিত্র কৃষ্ণকে অনুকরণ করা নিষেধ করেছেন।

বৃন্দাবনলীলা যে একপ্রকার অভিনয় এটা সমর্থিত হয় প্রকট ও অপ্রকট লীলার তুলনা করলে। রুক্মিণী আদি মহিষীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল প্রকট লীলায়, কিন্তু অপ্রকট লীলায় বিবাহ বলে কিছু নাই। অপ্রকট লীলায় বিরহ নাই,[১৩৪] প্রবাস-যাত্রা নাই, বৃন্দাবন ত্যাগ নাই যদিও কুব্জা, উদ্ধব, অক্রুর সকলেই আছেন, রুক্মিণী আদি মহিষীরা আছেন। পরিকর আছেন অথচ নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত নয়, এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই হ'তে পারে যে এঁরা আছেন শুধু প্রকট লীলায় অবতীর্ণ হয়ে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করবার জন্য। দেবতারা গোপরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এঁদের বলা হয়েছে "নটম্ ইব", নটের ন্যায়।[১৩৫] বৃন্দাবনের নদী গিরি পশুপাখীকেও বলা হয়েছে অপ্রাকৃতিক, ব্রজভূমি চিন্তামণিময়, গরুগুলি কামধেনু, গাছ সব কল্পবৃক্ষ[১৩৬], এরা জড় নয় চিন্ময়, চেতন। এরা সব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর, লীলা-অবসানে অন্তর্হিত হয়; এরা যেন রঙ্গমঞ্চের উপকরণ, stage properties।

ভাগবতে আছে[১৩৭] কৃষ্ণ আত্মরত ও আত্মারাম হয়েও ব্রজরমণীগণের সহিত রমণ করলেন কামীদের দৈন্য এবং স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য প্রদর্শন করবার জন্য। এর গৌড়ীয় বৈষ্ণবপর ব্যাখ্যা এই যে জীবগণকে শিক্ষা দেবার জন্য কৃষ্ণ ও রাধা কামাসক্ত না হ'য়েও কামাসক্তের ন্যায় ব্যবহার করেছেন।[১৩৮] এই ব্যাখ্যা স্পষ্টই নির্দেশ করছে যে কৃষ্ণলীলা একটা অভিনয়।

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।"[১৩৯]

হে রাজন! সেই পরমপুরুষের পক্ষে দেহধারীদের মধ্যে আবির্ভাব নটের ন্যায় মায়ার অনুকরণ করা মাত্র।

মনে হ'তে পারে যে কৃষ্ণলীলার এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যেখানে সর্বনিয়ন্তা ভগবানকে কোনও সামাজিক নিয়মভঙ্গ করতে হয় নি, যা করেছেন তা অলীক, তা প্রতীতিমাত্র, একটি বিরাট পালাগানের অভিনয়। কিন্তু কৃষ্ণপ্রীতিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ভক্ত বলবেন এ যুক্তি অসম্ভব। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন পরকীয়া রস আস্বাদনের জন্য, যদি তিনি জানেন যে গোপীরা তাঁর স্বকীয়া অথচ পরকীয়ার অভিনয় করছেন, তা হলে কৃষ্ণের পরকীয়া-রসাস্বাদন ব্যাহত হয়। স্বকীয়া ভাবের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটলে পরকীয়া রস-আস্বাদন সার্থক ও সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। অতএব তিনি এবং গোপীরা সত্যই জানেন যে তাঁদের প্রেম পরকীয়া প্রেম, তাঁরা অভিনয় বা ভান করছেন না।[১৪০] অতএব অভিনয়ের ধারণাকে বর্জন করতে হয়।

রাধাগোবিন্দ নাথ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন।[১৪১] "মনে করা যাউক যেন বাল্যকালেই একটি বালকের সঙ্গে একটি বালিকার বিবাহ হইয়াছে। কোনও ঘটনাচক্রে কিছুকাল পরে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর পরে বালকটি দূরবর্তী কোনও এক অপরিচিত স্থানের কোনও লোকের আশ্রয়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। বালিকাটিও ঘটনাচক্রে সেই স্থানের নিকটবর্তী কোনও এক স্থানে একজন সৎলোকের আশ্রয়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হইল; উভয়ই উভয়কে চিনিতে পারিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে পতি-পত্নী-সম্বন্ধ, তাহা কেবল তাহারাই জানে, অপর কেহ জানে না; অপরের নিকটে এমন কি তাহাদের আশ্রয়দাতাদের নিকটেও তাহারা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, বলিলে প্রমাণাভাবে কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের আশ্রয়দাতারা এবং সে স্থানের অন্য লোকেরাও মনে করে, এই দুইজনের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নাই। অথচ, তখন তাহাদের পূর্ণ যৌবন। পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য তাহাদের বলবতী আকাঙ্খা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তখন তাহারা গোপন মিলনের জন্য সুযোগের অনুসন্ধান করে এবং সুযোগ পাইলে মিলিত হয়। এ স্থলেও বাস্তব স্বকীয়া-ভাবেরই মিলন কিন্তু পরকীয়া ভাবের আবরণে। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীদের প্রকট লীলাতেও ঠিক এইরূপ অবস্থা।"

কিন্তু উদাহরণটি উপযুক্ত হয় নি, মূল সুরটাই চাপা পড়ে গেছে। এই গল্পে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই জানে তারা ধর্মমতে বিবাহিত, কিন্তু লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছে না; ব্রজের পরকীয়া প্রেমের মূল সূত্র "আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ", কৃষ্ণ রাধা গোপীরা কেউ জানেন না তাঁরা বিবাহিত, তাঁরা পরকীয়া ভাবে মিলিত হ'ন নইলে রসসম্ভোগ হবে কি করে! অতএব উপোরোক্ত গল্পটিকে ব্রজলীলার অনুরূপ ক'রে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় এইরূপ : বিবাহিত কোনও যুবক যুবতী উভয়ে উভয়কে খুব ভালবাসে, নিজেদের বৈ আর কাকেও জানে না। যুবক বললে দেখ, কাব্যে পড়া যায় পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশী এবং সম্ভোগ-জনিত আনন্দ বিচিত্র, আমার সেই রস চাখবার ইচ্ছা হয়েছে, অথচ তোমাকে প্রতারণা করতে মন সরে না, এবং সমাজে কলঙ্কের আশঙ্কাও আছে। স্ত্রী বললে আমার প্রতি তোমার ভালবাসা টলবে না আমি জানি, অন্য স্ত্রী সংসর্গে যদি সুখ পাও তা'তে আমার আপত্তি নাই। যুবক সারা দিন আপিসে, স্ত্রী দুপুরটা কাটালো এক বিউটি পার্লারে, অনেক খরচা করে' face-lift না কি করালো। সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে লেকের ধারে বসলো এক ছোকরার পাশে, জানে তার স্বামী সেই দিক দিয়েই অফিস থেকে ফিরবে। যে ছোকরার পার্শ্ববর্তিনী হ'ল সে ভাবলো

আজকার রাত্রির মত প্রেয়সী পাওয়া গেল; কিন্তু স্বামী আসতেই যুবতী তার দিকে গেল, ইসারায় সঙ্গ চাইল, স্বামী চিনতে পারলো না যে সে তার স্ত্রী। তা'কে পরস্ত্রী মনে ক'রে সে এক নূতন আনন্দে সন্ধ্যাটা তার সঙ্গে কাটালো। পাপ কারও হ'ল না, অপবাদের ভাগী কেউ নয়, বোকা বনে গেল বেঞ্চিতে বসা কিছুক্ষণের সঙ্গীটি, যে কল্পনায় কিছুকালের সম্ভোগ-সুখ লাভ করলো। যদি বলেন কোনও স্ত্রীলোককেই এমনভাবে পরিবর্তিত করা যায় না যে তার স্বামীও তাকে চিনতে পারবে না, তা হলে জবাব এই যে বিউটি পার্লার স্বয়ং যোগমায়ার, তাঁর অসাধ্য কিছু নাই।

যোগমায়ার উপস্থিতি কাব্যরস আস্বাদনের অন্তরায়, রাধাকৃষ্ণের মিথ্যা-প্রতীতি ক্রমে পাঠকের অপ্রতীতিতে পরিণত হয়। যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণ জানেন না পরকীয়াত্ব বাস্তব নয়, ভ্রমমাত্র, অথচ তাত্ত্বিক সব জানেন। অভিনয় বলে' মেনে নিলে যোগমায়ার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না কিন্তু তাত্ত্বিক তা'তে রাজী নয়। পরকীয়া-প্রীতিকে দোষহীন স্বকীয়াভাবে দেখানোর দুস্তর উদ্ভট চেষ্টা তাত্ত্বিক করেছেন, সুখের বিষয় পদকর্তারা করেন নি। তাঁরা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেছেন, পরকীয়া ভাবকে সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছেন অথচ যাদের উপস্থিতিতে কাব্যরসের ব্যাঘাত ঘটতে পারে তাদের রেখেছেন অন্তরালে যেমন আয়ান ঘোষ প্রভৃতি গোপদের; শ্বাশুড়ী ননদকেও কৃচিৎ দেখা যায়, সন্তানাদির কোনও প্রসঙ্গ নাই। এবং এমন কৌশলে করেছেন যে এ সব বিষয়ে পাঠকের মনে কোনও প্রশ্ন জাগে না। গোপরা যে রাধা বা গোপীদের সঙ্গে সত্যই বিবাহিত কিম্বা বিবাহ মায়িক সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি, পরকীয়া প্রেমের কুৎসিৎ দিক যেমন সন্দেহ, ষড়যন্ত্র, গুপ্তচর-নিয়োগ, নির্যাতন, দুই নায়কে সংঘর্ষ—এ সবের উল্লেখ নাই, পরকীয়া-প্রেমকে শুদ্ধসাত্ত্বিক-করণের সদিচ্ছায় আয়ান ঘোষ প্রভৃতি গোপদের ক্লীব প্রতিপন্ন করবার অপচেষ্টা নাই, আছে শুধু কুলত্যাগিনী রাধার অরুন্তুদ বেদনার উদ্‌ঘাটন। এই বেদনা সূচীমুখ হয়েছে যখন বহুবল্লভ কৃষ্ণের অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে, প্রেম-নির্বাহের ক্ষেত্রে পরিজনদের শ্যেনচক্ষুর চেয়ে এটি বলবত্তর অন্তরায়, সুতরাং কুলত্যাগের চেয়েও এটা দুঃখের বৃহত্তর আকর। আর যখন কৃষ্ণের মথুরাগমনের পরে রাধা ভেঙে পড়েছেন আকুল ক্রন্দনে তখন তাঁর গোপন প্রেম লোকের কাছে অবিদিত নাই, কিন্তু স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদ তখন চোখের জলে ধুয়ে মুছে গিয়েছে কারণ সারা বৃন্দাবন তখন অশ্রুমগ্ন।

## বৃন্দাবন—লীলা রূপক

রাসলীলাকে বলা হয় অলৌকিক, অলৌকিকের একটা অর্থ যা

পৃথিবীতে বা মনুষ্যসমাজে সম্ভব নয়। এমন সমাজ অকল্পনীয় যেখানে একজন পুরুষ অবাধে অসংখ্য পুরস্ত্রীর সঙ্গে বিহার করছেন, তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবন্ধক নাই, গোপন মিলনের জন্য প্রচুর সংখ্যায় মনোরম কুঞ্জ সাজানো আছে যেখানে স্ত্রীলোকের একাধিপত্য, পুরুষ শুধু কৃষ্ণ, ঝি বৌরা গোপন মিলনে যায় অথচ ধরা পড়ে না, কেউ তাদের বাধা দেবার নাই। কৃষ্ণ জানেন গোপীরা পরকীয়া, গোপীরা মনে করেন কৃষ্ণ তাঁদের পতি না হ'লেও অনন্যগতি, গোপপতিরা মনে করেন স্ত্রীগণ পার্শ্বেই আছেন, সুতরাং তাঁদের মনে কৃষ্ণের প্রতি কোনও বিদ্বেষ নাই, সবই সিদ্ধ হয় যোগমায়ার প্রভাবে—এ এক অদ্ভূত পরিস্থিতি। এ সব কাহিনী হিসাবেই বিশ্বাস করা ভাল কারণ কোনকালেই ভারতবর্ষের সমাজ এ রকম ছিল না। রাসলীলায় অপ্রাকৃত অবাস্তব উপাদান এত বেশী, বিশ্লেষণে এত অসম্ভব অসঙ্গতি লক্ষিত হয়, নৈতিক বিচারে এমন ঘাটতি পাওয়া যায় যে এক শ্রেণীর মনীষী এই ব্যাখ্যা করেন যে এই কাহিনী রূপক বা allegory, একটি তত্ত্বকে লোকপ্রিয় করবার জন্য এর সৃষ্টি।

পদাবলী সাহিত্যে রাসলীলার বর্ণনা অতি সামান্য, পদাবলী প্রধানতঃ কৃষ্ণরাধার যুগল প্রেমের আখ্যান। পরকীয়া প্রেমের দ্বন্দ্ব ও নাটকীয়তাকে পদকর্তারা এড়িয়ে গেছেন বটে কারণ এ রস তাঁদের প্রীতিকর নয়, কিন্তু গোপন প্রেমের যে রস-নির্যাস কাব্য-আদর্শের অনুকূল সেই আত্যন্তিক প্রণয়কে ব্যঞ্জিত করতে এঁরা সামাজিক ও নৈসর্গিক সত্যের অবহেলার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। রাধা বিবাহিতা স্ত্রী অথচ তাঁর পরপুরুষে আসক্তি, ঘরে তাঁর স্বামী শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ননদ আছেন। খুব অল্প ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর গোপন মিলন ঘটেছে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্কেতস্থানে, কুঞ্জবনে। সেখানে যাবার পথ দুর্গম কর্দমাক্ত কণ্টকপূর্ণ বনের মধ্য দি'য়, কোনও কোনও বর্ণনায় তাঁকে যমুনা পার হ'তে হয়েছে। দিনের বেলায় অভিসার হয়ত সম্ভব ছিল কারণ জল আনবার ছল ক'রে বাড়ী থেকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা হয়ত যেত, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও রাধাকে প্রতারণা-বাক্য ব্যবহার করতে হয়েছে অযৌক্তিক দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য।

কিন্তু দিবা অভিসারের বর্ণনা সামান্যই, রাত্রির অভিসারই বেশী। এই অভিসার নানা ঋতুতে হয়েছে, কিন্তু বর্ষা-অভিসার কবিদের সর্বাধিক প্রিয়। এ সময়ে বনের মধ্য দিয়ে পথ চলা এবং বর্ষাস্ফীত নদী পার হওয়া রমণীর পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য কেন অসম্ভব বলেই মনে হয়। প্রেম-বিবশ নারীর পক্ষে তা-ও না হয় সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু বাড়ীর সকলের চোখে ধূলা দিয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি কি ক'রে অসন্ধানিত অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে সেইটাই বিস্ময়, কারণ

রসের খাতিরে কবিরা বলেছেন রাধার ফিরতে প্রভাত হয়ে গেছে। অবশ্য ভয়ে রাধার বুক দুরুদুরু করছে যদি তাঁর গোপন অভিসার গুরুজন দুর্জন পড়শীরা জেনে ফেলে, কিন্তু কোথাও আছে কি যে তিনি ধরা পড়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, অভিসার বন্ধ হয়েছে? ধরা পড়বার সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে রাধা বা কৃষ্ণ সন্ধায়ীর তীক্ষ্ণ চক্ষু কি ক'রে এড়িয়ে গেছেন তার অবিশ্বাস্য ছেলেভুলানো বর্ণনায় কবিরা মুখর। রাধার গুরুজনদের উপরে নিদ্রাদেবী খুবই প্রসন্ন বলতে হ'বে, এমন কি বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর উপরেও, বয়স হ'লে ঘুম কমে' যায় কিন্তু শ্বাশুড়ী ব্যতিক্রম। বাড়ীর সদর বা খিড়কির দরজা খুলে রাধা বেরিয়ে গেছেন সারা রাত্রির জন্য অথচ কারও নজরে পড়ে নি, এটা আজকার দিনের মত সেদিনেও অসম্ভব ছিল মনে হয়। আর যে ক্ষেত্রে রাধা অভিসারে চলেছেন সখী-পরিবৃতা হয়ে গীতবাদ্য-সহকারে, সেখানে কবি-কল্পনার সঙ্গে অবাস্তবতা উচ্চচূড়ায় উঠেছে। এই সব কারণে আরও দৃঢ়তার সহিত বলতে ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণলীলা রূপক মাত্র।

এক পরমাত্মা বহু জীবাত্মাকে কাছে টেনে আনছেন শাসন-বশ্যতায় নয়, পাপপুণ্যের শাস্তি-পুরস্কারের ভয়প্রদর্শনে বা আশ্বাসনে নয়, প্রেমের আহ্বানে বাঁশীর ডাকে। জীবাত্মা সাড়া না দিয়ে পারে না, আকুল হ'য়ে ছুটে যায় সংসার-বন্ধন আত্মীয়-পরিজন ফেলে, নিজেকে সফল মনে করে দিব্যোৎসবে যোগ দিয়ে পরমাত্মার পরশ পেয়ে। ভক্ত-ভগবানের মধ্যে এই প্রেম কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারা লভ্য নয়, মন্ত্রের প্রাণহীন সূত্রে বাঁধা নয়, প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধিত নয়, বাধ্য-বাধকতার কঠিন দেওয়াল ঘেরা মিলন কক্ষে সম্পাদিত নয়, তাই তাকে বিবাহ-বন্ধনে স্বীকৃত না ক'রে পরকীয়ার রূপ দেওয়া হয়েছে, যে নিঃস্বার্থ প্রেমসর্বস্ব আকর্ষণ পরকীয়া প্রেমে দেখা যায় তাকেই নিষ্কাম সর্বাতিশয় প্রেমের প্রতীক মনে করা হয়েছে। কৃষ্ণের বহু প্রেয়সী, গোপীদের সমাজধ্বংশী গোপন প্রেম, পতিপুত্র ত্যাগ ক'রে রাসে সমাগমন, এ সব দুর্নৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের অনাপত্তি, গোপীদের পরস্পরে ঈর্ষাহীনতা—এ সবের চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একে রূপক বলে' মেনে নিলে। যাঁরা সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে, যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য বা ধর্মবিষয়ে প্রেমপ্রবণতার সম্যক জ্ঞানী নয়, যাঁরা পরকীয়া প্রেমকে কোনও প্রকারেই সমর্থন করেন না, যাঁরা ঈশ্বরলীলা শুধু কেলিবিলাসে আবদ্ধ রাখতে আপত্তি করেন, তাঁরাও এই ব্যাখ্যায় প্রীত হ'তে পারেন। তত্ত্ব-ব্যাখ্যার কারণে কল্পনার আশ্রয় নিলে কল্পিত বিষয় নীতিসম্মত না হ'লেও মেনে নিতে আপত্তিকর হয় না; বিল্বমঙ্গলের বেশ্যাপ্রীতি তাঁর ভক্তি-উদ্রেকের উৎস রূপে কথিত হয়ে থাকে।

রাসলীলায় যোগদানেচ্ছু পুরনারীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখতে

পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর রমণীরা সশরীরে রাসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু মায়ায় মোহিত হ'য়ে ব্রজগোপরা ভেবেছিলেন স্বীয় পত্নীগণ স্বপার্শেই আছেন।[১৪২] অর্থাৎ গোপীর দেহ ছিল রাসনৃত্যের শামিল, ঘরে স্বামীসকাশে ছিল কোনও মায়ামূর্তি বা কাল্পনিক আর কিছু। আর এক শ্রেণীর গোপীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ।
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ–তীব্রতাপধুতাশুভাঃ
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নিবৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।"[১৪৩]

কোনও কোনও গোপী গৃহমধ্যে ছিলেন বহির্গত হ'তে পারেন নি, (তাঁরা পূর্ব হ'তেই) কৃষ্ণভাবনাযুক্ত (ছিলেন ব'লে এখন) লোচন নিমীলিত ক'রে কৃষ্ণকে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহের তীব্রতাপে অশুভ বিনষ্ট এবং ধ্যানে লব্ধ কৃষ্ণের আলিঙ্গনে সুখভোগ হওয়ায় (তাঁদের) মঙ্গলবন্ধন ক্ষীণ হ'ল। তৎক্ষণাৎ (প্রাক্তন কর্মবন্ধন নাশ হওয়ায়) তাঁরা উপপতি বুদ্ধিতে পরমাত্মাকে চিন্তা ক'রে এবং তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে ত্রিগুণময় দেহ ত্যাগ করলেন। কৃষ্ণও বলেছেন যে সেই গোপীদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছিল।[১৪৪]

রাসলীলাক্ষেত্রেও সকল গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের দৈহিক মিলন হয়নি, কিছু গোপীর সঙ্গে শুধু ধ্যানেই মিলন হয়েছিল।[১৪৫] বহু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী কৃষ্ণসেবার জন্য ছুটে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন এমন ছিলেন যাঁর গতি অবরোধ করায় তিনি কৃষ্ণসকাশে যেতে পারেন নি, ধ্যানযোগে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন।[১৪৬]

যেখানে গোপীরা গৃহত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েছিলেন এবং যোগমায়ার প্রভাবে গৃহবাসী জানতে পারেন নি, সেখানে পরিস্থিতি অবাস্তব, যুক্তির সাহায্যে গ্রহণীয় নয়। যাঁরা যোগমায়ার সাহায্য পান নি, তাঁরা গৃহত্যাগ করতে পারন নি, শুধু ধ্যানেই কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন; এখাকে অলৌকিকত্ব নাই নৈসর্গিক নিয়ম কাজ করছে, আবহমান কাল থেকে এই উপায়েই মানুষ ভগবানকে পেয়েছে। অন্য দিকে গোপীদের সঙ্গে ঈশ্বরের যে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছিল তাকে allegory না ব'লে ইতিহাস বললে অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায়।

কুরুক্ষেত্রে যখন গোপীরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েছিলেন তখনও কিছু গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ হয়েছিল, আবার কিছু গোপী

"দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
-স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌।"[১৪৭]

লোচনদ্বার দিয়েই নিত্যযোগারূঢ় (সাধকেরও) দুর্লভ ভগবৎ–

ভাবকে হৃদয়ে প্রাপ্ত হয়েছেন।

কৃষ্ণ একটি পরম অর্থবহ উক্তি করেছেন যে তাঁর শ্রবণ ধ্যান কীর্তন প্রভৃতিতে যেরূপ ভক্তি জন্মে তাঁর সান্নিধ্যে তেমনটি হয় না।[১৪৮] এর অর্থ এ নয় যে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ ধ্যান ইত্যাদিতে যে অনুকূল ধারণা হয় সাক্ষাতে সে স্বপ্ন টুটে যায়, এর সঙ্গত অর্থ এই যে ভক্ত যাকে সান্নিধ্য বা অপরোক্ষ অনুভূতি মনে করেন শ্রবণ ধ্যান প্রভৃতি হ'তেই তার জন্ম, এমন অনুভূতির পৃথক অস্তিত্ব নাই। অতএব তাঁকে মননে পাওয়াই শ্রেষ্ঠ পাওয়া, চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ভ্রম বা মায়ামাত্র। উপরোক্ত যাঁরা ধ্যানে কৃষ্ণকে পেয়েছেন তাঁরাই যথার্থ রূপে পেয়ে সংসারমুক্ত হয়েছেন, যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে পেয়েছেন তাঁরা দেহেই আবদ্ধ থেকে গেছেন, তাঁরা শুধুই কাহিনীর নায়িকা।

ভাগবতে[১৪৯] গোপীরা বলেছেন তাঁরা কৃষ্ণকে ভালবাসেন কারণ কৃষ্ণ সকলের আত্মা। তা যদি হয় তা হলে তাঁরা আত্মারাম বা আত্মকাম হ'তে পারতেন, রাসে যাবার প্রয়োজন ছিল না। আত্মার সহিত রাসোল্লাস প্রতীকার্থে বা allegory হিসাবে না হ'য়ে আর কি হ'তে পারে তা বোধগম্য নয়। জীব গোস্বামী এ বিষয়ে অনবহিত নয়, তিনি বলেছেন এই বাক্য দ্ব্যর্থব্যঞ্জক।[১৫০] আরও বলেছেন "কৃষ্ণ-বিগ্রহে ত্বক শ্মশ্রু প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু নাই। তিনি প্রাকৃত বস্তুর অতিরিক্ত।"[১৫১] অতএব রাসলীলাকে রূপক না বলে' গত্যন্তর নাই। রাসলীলা-প্রসঙ্গে গোপী-পরিবৃত কৃষ্ণকে তুলনা করা হয়েছে শক্তি-পরিবৃত পরমপুরুষের সঙ্গে।[১৫২] অতএব এই রূপকার্থে নিলে ক্ষতি কি?

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব এমন ব্যাখ্যা মানেন না। বৃন্দাবনলীলাকে allegory বললে এঁদের যত্ননির্মিত বিরাট সৌধ ভূমিসাৎ হয়, যা সত্যই ঘটেছিল তা রূপক হয় কি রূপে! এঁরা বৃন্দাবনলীলার সামগ্রিক সত্যতায় বিশ্বাসী, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের দৈহিক মিলন হয়েছিল, একে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে না। তাঁরা বলেন রাসলীলাদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ভক্ত ও ভগবানের মিলনরূপে, এতে আর কোনও মতবাদের স্থান নাই। "কেহ বা গোপীসহ গোপীনাথের এই মধুর মিলনকে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বলিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। কিন্তু অসংখ্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কি ভাবে সংঘটিত হইতে পারে এবং এককালীন অসংখ্য জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার এইভাবে মিলন ন্যায়-বৈশেষিকাদি কোন্ দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্মত ও শঙ্করাচার্যাদির কোন আচার্যের মতানুমোদিত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ বা রাসলীলাকে রূপক বর্ণনা করিয়া কেহ বা আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা করিয়া একটা অভিনব ভাবের প্রবাহ সঞ্চার করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। যাঁহারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি বর্ণিত এই লীলাটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।"[১৫৩] "সুতরাং

আমাদের যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীভগবানের রমণ কিম্বা শতকোটি গোপরমণীসহ বিবিধ বিহারে রত ভগবানের কামগন্ধ-হীনতার সামঞ্জস্য না হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে সকলই সম্ভব হয় মনে করিয়া আমাদের এই পরমমধুর লীলার মাধুর্যাস্বাদনে রত হওয়াই কর্তব্য।"[১৫৪]

"বৈষ্ণব কবিতাকে লীলার দিক থেকে দেখতে হবে—রূপকের দিক থেকে দেখলে চলবে না। রূপকের দিক-দিয়ে দেখলে interpretation হ'বে সত্যি, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারা যাবে না।" "বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অবশ্য সর্বত্র করা যায়, কিন্তু তাহাতে কাব্যরস একেবারে উবিয়া যায়।"[১৫৫]

কাব্যে কোনও প্রভেদ করা হয় না ইতিবৃত্তকথায় ও রূপকথায়, আখ্যানে ও ইতিহাসে, অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত করা হ'ত না। কারণ কাব্য উভোগের বস্তু, সত্যাসত্য নির্ণয় তার কাজ নয়, রসহানি যদি না হয় তা হলে বিশ্বাসহানি হয় না। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজপুত্রের আগমন যেমন ছোটদের কাছে বিস্ময়াবহ নয় রামচন্দ্রের লঙ্কাদ্বীপ থেকে পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন তেমনিই বড়দের কাছে উড়োখবর নয়। দ্বন্দ্ব জাগে যদি কোনও বিজ্ঞানী বলেন যে সেকালে সত্যই এমনি ঘোড়া ছিল যারা উড়তে পারতো বা কোনও দেশপ্রেমিক বলেন বায়ুযান রামচন্দ্রের যুগে সত্যই ছিল। যে কাব্যে যক্ষের বার্তা বহন করে মেঘ অলকায় গিয়েছে সে কাব্য প'ড়ে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য কোনও রসিক ভ্রূকুঞ্চন করেন না করবেন না, যদি না কোনও গবেষক নির্ধারণ করেন যে কালিদাসের সময়ে মেঘ পোস্ট অফিসের কাজ করতো। রাসলীলা পরমরসাস্বাদ্য বিষয় দেশীবিদেশীর কাছে—সমাজনীতির তুলাদণ্ডে আপত্তিকর বর্ণনা এর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও – যতক্ষণ একে নিছক কাব্য হিসাবে কিম্বা প্রেমের রূপকে পারমার্থিক ভাবপ্রকাশের আকুলতা হিসাবে দেখা যায়। এমন কাব্য সলোমনের Song of Songs থেকে আরম্ভ ক'রে পারসীক সূফী সাহিত্যে এবং অন্য অনেক সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, সে সব আজ জগৎ-সাহিত্যে সঞ্চিত রত্ন। রত্নকেও পরখ করবার কায়দা আছে, কৌস্তুভ সমুদ্রমন্থনে উত্থিত বললে আমরা একে অমূল্য মনে করি কিন্তু কোনও গবেষক যদি বলেন গোলকুণ্ডার কোনও খনি থেকে তোলা হয়েছিল তাহলে কৌস্তুভ ঝুটা হয়ে যায়। সূফী প্রভৃতি মিস্টিক সাহিত্যের বহু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ফলে কাব্যরস একেবারেই উবে যায় নি।

শুধু মানিনী রাধা বা গোপীরা নয় অনেক বৈষ্ণব পদকর্তা কৃষ্ণকে গর্বভরে লম্পট বলেছেন। উপাস্য দেবতাকে লম্পট বললে তাঁর গৌরবহানি হয় না, যদি কথাটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়, তিনি আক্ষরিক অর্থে ধর্ষণ করেন না, বলপ্রয়োগ ক'রে মন হরণ করেন।

খৃষ্টান মিস্টিকরা এই প্রতীকার্থে ভগবানকে ravisher বলেছেন বাচ্যার্থে নয়।[১৫৬]

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন[১৫৭] "সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনামাত্র, অনন্তসুন্দরে সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনামাত্র; চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেননা বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি বলিয়াছি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা।... জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি তাহার সর্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলা-রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্মও সেই পথগামী। অতসব মনুষ্যত্বে, মনুষ্যজীবনে এবং হিন্দুধর্মে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির কতদূর আধিপত্য, বিবেচনা কর।"

বিবেকানন্দ স্বামী বলেছেন[১৫৮] "এই অতীব চমৎকার প্রেমের বিস্তার রমণীয় বৃন্দাবনলীলার রূপকে বর্ণিত হয়েছে, এ শুধু তারাই বুঝতে পারে যারা প্রেমের নির্যাস আকণ্ঠ পান ক'রে মত্ত হয়েছে।"(অনুবাদ)

A. A. Macdonell বলেছেন[১৫৯] জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে "যে কাব্যে সম্ভোগাত্মক প্রেমের ভাবাবেগ বর্ণিত হয়েছে প্রাচ্যদেশীয়-কল্পনা-প্রবণতার আতিশয্যে, সেই কাব্য সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে—এবং এইটাই প্রথম উদাহরণ নয়—রূপকানুগত (allegorical) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অন্তর্গূঢ় ধর্মীয় ভিত্তিতে, এটা যেন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। ভারতীয় ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ ও রাধার বিচ্ছেদ, পরস্পরের মিলনাকাঙ্খা এবং মানান্তে পুনর্মিলন পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধের প্রতীক। হয়ত জয়দেবের অভিপ্রায় এইরূপ, তা হ'লেও এটি আছে প্রধান ভাবধারার আকারে, কাব্যে সর্বত্র ওতপ্রোত হ'য়ে নয়" (অনুবাদ)।

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথম আধুনিক সঙ্কলনকার জর্জ গ্রিয়ারসন বলেছেন [১৬০] "আমি এই গানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি রচিত বিষয়বস্তু অনুসারে, যেমন এক শ্রেণীর কবিতায়

ঈশ্বরের প্রতি মানবাত্মার প্রথম আকুতি প্রকাশিত, আর এক শ্রেণীর বিষয় ভগবৎ-প্রেমের অধিকারে মানবাত্মার সম্পূর্ণ বশ্যতা, অন্যত্র আত্মার বিরহবোধ ইত্যাদি"(অনুবাদ)। অর্থাৎ পূর্বরাগ, সম্ভোগ, বিরহ প্রভৃতি সব বিষয়কেই গ্রিয়ারসন ভক্ত-ভগবানের রূপক হিসাবে দেখেছেন।

Rcne' Grousset বলেছেন [১৬১] "বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় মনোমুগ্ধকর রূপকে (যথা গোবৎস এবং আভিরবালার প্রতীকে) চিত্রিত হয়েছে গোপালরূপী দেবতার বাঁশীতে মোহিত শুদ্ধাত্মার আকুতি" (অনুবাদ)

A. L. Basham-এর অভিমত[১৬২] "কৃষ্ণের বংশীধ্বনি স্ত্রীলোকদের ডাক দিয়েছে স্বামীসঙ্গ ছেড়ে জ্যোৎস্নালোকে তাঁর সঙ্গে বিহার করতে, এই বংশীরব ঈশ্বরের ডাক, তিনি জীবকে আহ্বান করেছেন পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করে' ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দে নিমজ্জিত হ'তে।"

হীরেন্দ্র নাথ লিখেছেন[১৬৩] "এই কান্ত-কান্তা সম্মিলন একভাবে জগতের চরম আধ্যাত্মিক রূপক, is the grcatcst spiritual allcgory of the World, এই গুহ্যলীলার প্রত্যেক ঝঙ্কারের মধ্যেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ নিহিত আছে।" তিনি আরও বলেছেন বৃহদারণ্যক উশনিষদে, Orphic mystcrics-এ Neo-platonism-এ, Soloman-এর Song of Songs প্রভৃতি পৃথিবীর বহু ধর্মে ও সাহিত্যে মানুষিক প্রেমের প্রতীকে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে।

## উল্লেখপঞ্জী


১। প্রীতিসন্দর্ভ১৫০
২। ভাগবত ১০/৩৩/১৭
৩। লঘু ভাগবতামৃত ৪৩৫
৪। ব্রহ্মসংহিতা ৪৬, ৬৬
৫। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১০৬
৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/৩৯৩
৭। উজ্জলনীলমণি, সংযোগ-বিয়োগ স্থিতি প্রকরণ, প্রথম শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আনন্দচন্দ্রিকা টীকা
৮। রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৬৯২
৯। ভাগবত ১০/১/২২, ৬২, ৬৩; বিষ্ণুপুরাণ ৫/১/৬১, ৬৫
১০। পদ্মপুরাণ কার্তিকমাহাত্ম্য, প্রীতিসন্দর্ভে ৫২ উদ্ধৃত
১১। ভক্তিমসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাবলহরী ১৫৮-১৬০
১২। মধুসূদন সরস্বতী, গীতার ১৮/৬৬ শ্লোকের টীকা
১৩। ভাগবত ১০/৩০/২, ১৪; বিষ্ণুপুরাণ ১/১৯/৮৫

১৪। গীতগোবিন্দ, ষষ্ঠ সর্গ, গীত ১২
১৫। রূপগোস্বামী পদ্যাবলী ৩৮৩; চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/৭৬
১৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা," পৃঃ ২১৩
১৭। আনন্দবর্ধন, ধ্বন্যালোক ২/৬
১৮। ভাগবত ১০/২২/২০
১৯। ভাগবত ১০/৮/৪২
২০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৬/৫৫-৫৭
২১। বিষ্ণুপুরাণ ৫/৩/৮
২২। বিষ্ণুপুরাণ ৫/৭/৩৫-৩৮
২৩। ভাগবত ১০/২৯/১২
২৪। ভাগবত ১০/২৯/৩২
২৫। ভাগবত ১০/৩১/৪
২৬। নারদীয় ভক্তিসূত্র, সূত্র ২২
২৭। ভাগবত ১০/২৯/৪
২৮। ভাগবত ১০/১৪/৫০-৫৭
২৯। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭
৩০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৮/৩১
৩১। উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া প্রকরণ ১২
৩২। উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া প্রকরণ ২১
৩৩। ভাগবত ১০/২৯/৬, ২০
৩৪। ভাগবত ১০/৪৭/৬১
৩৫। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৬৭-১৬৯
৩৬। গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণপ্রবেশ পৃঃ ২৬৮
৩৭। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ১৬/২, ৩
৩৮। বিষ্ণুপুরাণ ৫/১০/২৬, ৩৩
৩৯। ভাগবত ১০/১১/৩৫
৪০। ভাগবত ১০/৩৪/২০, ১০/৬৫/১৭
৪১। ভাগবত ১০/২৩/৩৩, ৩৪
৪২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/১৩৫
৪৩। ভাগবত ১০/৩৩/২ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা
৪৪। ভাগবত ১০/৩৩/২৬
৪৫। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৯০/৬৮-৬৯
৪৬। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ২০ অধ্যায়
৪৭। শিলপ্পদিকারম, সপ্তদশ সর্গ
৪৮। ভাগবত ১০/২৯/১ জীব গোস্বামীর বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় উদ্ধৃত
৪৯। ভাগবত ১০/৩৩/২ সনাতন গোস্বামীকৃত বৃহৎ

বৈষ্ণবতোষণী টীকা

৫০। ভাগবত ১০/৩৩/২ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা

৫১। ভাগবত ১০/৩৩/৩ জীব গোস্বামীকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা

৫২। কামসূত্র ৬/১০/২৫।

৫৩। ভাগবত ১০/৩৩/২৬

৫৪। ভাগবত ১০/২২/২৭, ১০/২৯/২০

৫৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর, রৌদ্রভক্তি ৪, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা

৫৬। ভাগবত ১০/৩৩/৩৭

৫৭। উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া প্রকরণ, ২১

৫৮। ভাগবত ১০/৩৩/২৬

৫৯। রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, পৃঃ ২৮৮৮

৬০। ভাগবত ১০/৩৩/২৬-২৮

৬১। ভাগবত১০/৩৩/২৯-৩৭

৬২। গীতা ৩/২১

৬৩। মহাভারত, মৌষলপর্ব, ৭/৩১; বিষ্ণুপুরাণ ৫/৩৮/১

৬৪। কৃষ্ণচরিত্র, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

৬৫। ভাগবত ১০/৪৭/৫৩

৬৬। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৪৫/১৭৫-১৭৭

৬৭। উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ, ১২, ১৩

৬৮। রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ২৫৩৯

৬৯। ভাগবত ১০/৩৩/৪০

৭০। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ, ২

৭১। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ, ১৫

৭২। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ, ১৩

৭৩। উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদ, ২

৭৪। ভাগবত ১০/২৯/২০-২৭

৭৫। ভাগবত ১০/২৯/১

৭৬। ভাগবত ১০/৩৩/৩৮

৭৭। ভাগবত ১০/২৯/৪, ১০/৩২/১৫

৭৮। ভাগবত১০/২৯/৩৮

৭৯। ভাগবত১০/২৯/৪১

৮০। ভাগবত১০/২৯/৪৬, ১০/৩১/১২

৮১। ভাগবত ১০/৩০/৩২, ৩৪

৮২। ভাগবত ১০/৩৩/১৭

৮৩। ভাগবত ১০/২৯/৬

৮৪। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, পঞ্চদশাধ্যায়

৮৫। গর্গসংহিতা, গোলোকখণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়
৮৬। গৌতমীয়তন্ত্র ২/২৫
৮৭। উজ্জলনীলমণি, হরিপ্রিয়া প্রকরণ, ৯, ১০
৮৮। ভাগবত ১০/৮২/৪০, ৪১
৮৯। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৪৫শ অধ্যায়
৯০। গোপালচম্পূ, উত্তর ৩৭/৩০; কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৪
৯১। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭; গোপালচম্পূ উত্তরখণ্ড, ৩১-৩৩, ৩৫ পূরণ
৯২। গোপালচম্পূ, উত্তর, ৩২/৪১
৯৩। গোপালচম্পূ, উত্তর ১/৭৪
৯৪। উজ্জলনীলমণি, নায়কভেদ, ১৬, জীবগোস্বামীর লোচনরোচনী টীকা
৯৫। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৮
৯৬। উজ্জলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ, ১৬ শ্লোকের জীবগোস্বামী কৃত টীকা কোনও কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায়
৯৭। গোপালচম্পূ, উত্তরচম্পূ ৩৬/১৬৫
৯৮। উজ্জলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ ১৬ শ্লোকের বিশ্বনাথচক্রবর্তীকৃত আনন্দচন্দ্রিকা টীকা
৯৯। উজ্জলনীলমণি, নায়কভেদ, ১৫
১০০। উজ্জলনীলমণি, নায়কভেদ ১৪
১০১। উজ্জলনীলমণি, স্থায়ীভাব প্রকরণ, ১৩৩; পদ্যাবলী ৩৭১ (উমাপতিধর রচিত)
১০২। উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ, প্রবাস, ৬৬
১০৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/৫৮; কাব্যপ্রকাশ প্রথম উল্লাস, ৪;সাহিত্যদর্পন ৩/১৬৫; পদ্যাবলী ৩৮২ (শীলাভট্টারিকা রচিত)
১০৪। Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, by S. K. De, p. 350
১০৫। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/৪৭
১০৬। গোপালচম্পূ, উত্তর, ৩৭/১৯২
১০৭। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৫২/৪-৬
১০৮। ভাগবত ১০/২৯/২২ শ্লোকের সনাতন গোস্বামীকৃত বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী টীকা
১০৯। ভাগবত ১০/৩১/১৬
১১০। ললিতমাধব ১/৪৪
১১১। বিদগ্ধমাধব ১/১৪
১১২। উজ্জলনীলমণি, কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ ১৯
১১৩। ভাগবত ১০/৩৩/৩৮
১১৪। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৪৫

১১৫। উজ্জলনীলমণি, নায়কভেদ প্রকরণ, ১৬, লোচনরোচনী টীকা
১১৬। কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৭
১১৭। প্রীতিসন্দর্ভ ২৭৮
১১৮। ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৭ শ্লোকের টীকা
১১৯। গোপালচম্পূ, পূর্বচম্পূ, ১৫ পূরণ/৫৪
১২০। গোপালতাপনী, উত্তরভাগ ২৩
১২১। ভাগবত ১০/৩৩/৮
১২২। গৌতমীয়তন্ত্র ২/২৫
১২৩। গোপালচম্পূ, উত্তর, ১/৭৪
১২৪। গোপালচম্পূ, উত্তর, ৩২ পূরণ/৩০
১২৫। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২৯, ৩০
১২৬। কর্ণানন্দ, চতুর্থ নির্যাস, ৪৩(ক)
১২৭। ভাগবত ১০/৩৩/৩৭ শ্রীধরস্বামীর টীকা
১২৮। রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, পৃঃ ৩৪৮৪
১২৯। রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ২৫৬০
১৩০। ভাগবত ১০/১৩/২
১৩১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/২১১ ধৃত বাশিষ্ঠ রামায়ণ বচন
১৩২। ভাগবত ১১/৩১/১১
১৩৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/৩৮১, ৩৮২
১৩৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, প্রেয়োভক্তি, ৬১, টীকা
১৩৫। ভাগবত ১০/১৮/১১
১৩৬। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৫/২০, ২/১৪/২২১, ২২৩; ব্রহ্মসংহিতা ৫/২৯, ৫৬; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণবিভাগ, বিভাবলহরী ৮৮ উদ্ধৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্লোক; ভাগবত ১০/২৯/৯ শ্লোকের জীবগোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী টীকা
১৩৭। ভাগবত ১০/৩০/৩৪
১৩৮। রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা পৃঃ ২১৫৪
১৩৯। ভাগবত ১১/৩১/১১
১৪০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২৯, ৩০
১৪১। রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন I পৃঃ ৫৩১, পৃঃ ৩৪৮০
১৪২। ভাগবত ১০/৩৩/৩৭
১৪৩। ভাগবত ১০/২৯/৯-১১
১৪৪। ভাগবত ১০/৪৭/৩৭
১৪৫। ভাগবত ১০/৩২/৮
১৪৬। ভাগবত ১০/২৩/৩৫
১৪৭। ভাগবত ১০/৮২/৪০

জীবের অধিকার নাই কারণ জীব স্বরূপশক্তি নয়, সাধক মনে করতে পারেন না তিনি অনাদি পরিকরদের কারও সহিত অভিন্ন[১২২], তিনি শুধু এঁদের কারও আনুগত্যে (অনুকরণে নয়) সেবা করতে পারেন, যাকে বলা হয় আনুগত্যময়ী বা রাগানুগা ভক্তি। সাধক নিজ অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ কল্পনা ক'রে সেই দেহে লীলাবিলাসী কৃষ্ণের সেবা করছেন এই মনে করবেন, অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করবেন। যে কাল্পনিক দেহে অপ্রাকৃত লোকে সাধক কৃষ্ণ-সেবার চিন্তা করেন তা-ই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহ। মনে রাখতে হবে রাগানুগার দাস্য বিধিমার্গের দাস্য হ'তে ভিন্ন, বিধিমার্গে নিয়মানুগত বিগ্রহ সেবা, নিজস্ব কল্পনায় লীলার অনুধ্যান নয়। আর এক কথা, এই স্মরণ-ধর্মী সাধন শুধু ব্রজলীলার স্মরণ-মনন, মথুরা বা দ্বারকার অনুধ্যান নয়।

"রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা সেই ভজে
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে।
× × × ×
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাঁহাই সেবন
সাথীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।"[১২৩]
"রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবানে পায়
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়।"[১২৪]
"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।"[১২৫]

"পাছে ত লাগিয়া" অর্থাৎ অনুগত হয়ে। "নিজাভিষ্ট" অর্থে সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি প্রথায় অভিরুচি অনুযায়ী।

নববিধা ভক্তির দ্বারা যে সাধনা করণীয় ভাগবতে ভক্তি-উপচয়ের সেইটাই অবধি ব'লে নির্ণীত হয়েছে।

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্
ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।"[১২৬]

বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি ভগবান বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পিত হ'য়ে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক যদি অনুষ্ঠিত হয়, তা'কে উত্তম সাফল্য বলে মনে করি। এই বিধিগুলি ভগবানে অর্পণ করলে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির অঙ্গসমূহ সম্পূর্ণভাবে ভগবানের প্রীতির নিমিত্তই করা হয়, সাধকের কোনও লাভের জন্য কিম্বা ঐহিক পারত্রিক কোনও সুখের জন্য নয়, সুতরাং "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" হ'য়ে এই ভক্তি উত্তমা ভক্তির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু গৌড়িয় বৈষ্ণবের মতে শুধু

নববিধা ভক্তির দ্বারা ব্রজের কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, তৎসহ ভক্তের থাকাচাই ঐশ্বর্যবোধ নয়, মমত্ববোধ, অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তি। সাধন-ভক্তির একটি ভক্ত্যাঙ্গ আত্মনিবেদন বা শরণাগতি, যেখানে "তদীয়তা" ভাব বা "আমি তোমার" এই ভাব প্রবল। "মদীয়তা" ভাবে সমৃদ্ধ রাগানুগা ভক্তিতে শরণাগতির অবকাশ নাই।

রাগানুগামার্গের সেবা দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর সব রকম হ'তে পারে তবে মধুর রসের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। দাস্যের মূল ভাব সেবা, সখ্যের অসংকোচ এবং গৌরব-বুদ্ধি-হীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালনাদি রক্ষণ-মূলক মনোবৃত্তি অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব, মধুর রসে প্রগাঢ় প্রীতি এবং মমত্ববুদ্ধি যার ফলে কৃষ্ণের সর্ববিধ বাসনার পূরণার্থে সর্বস্ব ত্যাগের প্রবণতা—এমন কি বেদধর্ম, কুলধর্ম, স্বজন, আর্যপথ ত্যাগ—এবং স্বীয় অঙ্গ দ্বারা সেবা। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন সর্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমার শরণ লও, ভাগবতে আছে[১২৭] "ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম" যিনি সর্বধর্ম ত্যাগ ক'রে আমাকে ভজনা করেন তিনি উত্তম ভক্ত। অতএব ভক্ত শুধুই বর্ণাশ্রম্‌ধর্ম ত্যাগ করবেন না, কুলধর্ম সমাজ-নিয়ম সমস্তই ত্যাগ করবেন।

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।"[১২৮]

(কৃষ্ণপরিকরবর্গের) ভাব-লাভেচ্ছু ব্যক্তি সাধক রূপে (যথাবস্থিত দেহে) এবং সিদ্ধ রূপে (দেহান্তের পরে অভীষ্ট তৎসেবোপযোগী দেহে) ব্রজলোকগণের অনুসরণে সেবা করবেন। সাধক যথাবস্থিত বা মরদেহে যে সেবা করবেন তা'তে কল্পনা করবেন যে দাস্যসখ্যাদি যে ভাব তাঁর মনঃপুত সেই ভাবে বিভাবিত কোনও কৃষ্ণপরিকরের আনুগত্যে সেবার উপযোগী দেহে এবং বেশে কৃষ্ণসেবা করছেন। সিদ্ধিলাভের পরেও মর্ত্য ভক্তের শুধু আনুগত্যময়ী সেবার অধিকার, নিত্যপরিকরদের অধিকার তিনি কখনই পেতে পারেন না।

"কৃষ্ণপ্রিয়সখীভাবং সমাশ্রিত্য প্রযত্নতঃ
তয়োঃ সেবাং প্রকুর্বীত দিবানক্তমতন্দ্রিতঃ।"[১২৯]

কৃষ্ণের প্রিয়সখীর ভাবের আশ্রয়ে (= আনুগত্যে) দিবারাত্রি নিরলস যত্নে তাঁদের সেবা করা কর্তব্য।

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্।
নানা শিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙমুখীম্।
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্বতীম্।
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্

তৎসেবনসুখাহ্লাদভাবেনাতিসুনিবৃতাম্ ।
ইত্যাত্মানং বিচিন্তৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ
ব্রাহ্মং মুহূর্তমারভ্য যাবৎস্যাত্তু মহানিশা ।"১৩০

নিজেকে তাঁদের (=গোপীগণের) মধ্যবর্তিনী রূপযৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী প্রমদা রূপে চিন্তা করবে; কৃষ্ণের ভোগের অনুকূল নানাবিধ শিল্পকলাভিজ্ঞা, (অথচ) কৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিত হ'লেও ভোগপরাঙ্‌মুখী (রমণী রূপে) নিজেকে চিন্তা করবে; সর্বদা রাধিকার অনুচরী, তাঁর সেবাপরায়ণা রূপে (নিজেকে চিন্তা করবে), কৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক প্রেম দেখাবে রাধিকাকে; প্রীতির সহিত প্রতিদিন (রাধাকৃষ্ণের) মিলন সাধনে যত্নপর হ'বে এবং তাঁদের সেবার আনন্দে বিভোর হ'য়ে থাকবে। নিজেকে এইরূপ ভাবনা ক'রে ব্রাহ্মমুহূর্ত হ'তে আরম্ভ ক'রে মহানিশা পর্যন্তও যদি হয় তা হ'লেও তাঁদের সেবা করবে।১৩১ যাঁরা কৃষ্ণলীলায় নিয়ত ভাবনাশীল তাঁদের পূজা, ধ্যান, জপ নাই।

বৃন্দাবনের কোনও গোস্বামী উপরে উদ্ধৃত পদ্ম পুরাণের শ্লোকের উল্লেখ করেন নি, যদিও সখী ভাবে সাধনা তাঁদের নির্দেশিত। পদ্ম পুরাণের এই অংশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে পুরুষ ভক্তদের কান্তা ভাবে আরাধনা, গোলোকধাম ও বৃন্দাবনধাম উভয়ের নিত্যতা, রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জসেবা, অষ্টকালীয় নিত্যলীলার ভক্ত কর্তৃক ধ্যান ও কীর্তন—এ সব আছে কিন্তু তারিখনিরিখের যে অভাব আমাদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে সেটা একটু অধিকমাত্রায় থাকায় চৈতন্য বা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে এ সব ভাবপর্যায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় থেকে পেয়েছিলেন এ কথা বলা যায় না, চরিতগ্রন্থে বা তত্ত্বগ্রন্থে কোনও উল্লেখ নাই।

রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস তাঁদের স্তবে এবং প্রার্থনামূলক পদে রাধাকৃষ্ণের সেবাবাসনা প্রকাশ করেছেন; নিদর্শন-স্বরূপ দু-একটি শ্লোক উদাহরণ-স্বরূপ দেওয়া হ'ল—

"ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥১৩২

হে দেবি। আমি তোমাকে মেঘবরণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং চরণকে নূপুরশূন্য ক'রে রাত্রিযোগে কুঞ্জে বিরাজিত ব্রজেন্দ্রনন্দন সমীপে হৃষ্টচিত্তা তোমাকে কবে অভিসার করাব।

"কদাহং সেবিষ্যে ব্রততিচমরীচামরমরু-
-দ্বিনোদেন ক্রীড়াকুসুমশয়নে ন্যস্তরপুষৌ।

দরোন্মীলন্নেত্রৌ শ্রমজলকণক্লিদ্যদলকৌ
ব্রুবানাবন্যোনং ব্রজনবযুবানাবিহ যুবাং ।"১৩৩

হে ব্রজজনযুবরাজ ও যুবতিশ্রেষ্ঠ ! বিলাসকুসুমশয্যায় শয়ান হ'য়ে তোমাদের নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলিত ও ঘর্মজলকণায় অলকাবলী আর্দ্র হ'বে, ঐ সময়ে লতামঞ্জরীরূপ চামর দ্বারা কবে আমি তোমাদের বীজন করব ।

"গুঞ্জদ্ভৃঙ্গকুলেন জুষ্টকুসুমৈ সংলব্ধ মঞ্জুশ্রিয়াং
কঞ্জানাং নিকরেষু যেষু রমতে সৌরভ্যবিস্তারিণাং ।
উদ্যৎকামতরঙ্গ রঙ্গিত মনস্তন্নব্যযূনোর্যুগং
তেষাং বিস্তৃত কেশপাশনিকরৈ কুর্যামহোমার্জনং ।"১৩৪

সগুঞ্জিত ভৃঙ্গকুল-সেবিত কুসুম দ্বারা যার মনোহর শোভা হয়েছে, তাদৃশ সৌরভযুক্ত যে কুঞ্জসমূহে নব্য-যুবক-যুবতী রাধাকৃষ্ণ সমুদিত কামতরঙ্গে রঙ্গিত-চিত্ত হয়ে রমণ করেন, আমি সুদীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা সেই কুঞ্জের মার্জনা করব ।

এই দুই গোস্বামীর শ্লোকাবলী থেকে কতকগুলি বিষয়ের উপলব্ধি হয় । রাধিকাকে সজ্জিত করবার, বিলাস-শয্যা রচনা করবার, রাধিকাকে ভোজনাদি করানোর বাসনা আছে । এমন কি রাধিকার স্নানের জায়গায় পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করবারও এঁদের আগ্রহ ।

রাধাকৃষ্ণের যুগল সেবাও এঁদের প্রার্থনীয়, এমন কি বিলাসকালেও । তা ছাড়া তাঁদের অন্য ক্রীড়াদর্শনও আনন্দপ্রদ যেমন মুরলীগোপন প্রভৃতি । দীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা কুঞ্জমার্জনা সূচিত করে এঁদের আকাঙ্ক্ষিত সেবা রমণী ভাবে, সখী ভাবে ।

একান্তে কৃষ্ণের সেবা বাসনার কোনও শ্লোক নাই । এই থেকে সমর্থিত হয় যে এঁদের সেবা-বাসনা সখী ভাবে, নিভৃত সেবায় পাছে কৃষ্ণকর্তৃক প্রার্থিতা হ'ন সে কারণে কৃষ্ণসেবার বাসনা নাই ।

কৃষ্ণস্তোত্রের চেয়ে রাধাস্তোত্র সংখ্যায় অনেক বেশী । রূপ গোস্বামী রাধার স্তবে তাঁর অর্চনা করেছেন কৃপা প্রার্থনা করেছেন । পঞ্চরাত্র আগমে লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি, শুধু শক্তি নয় স্বতন্ত্র ভাবে আরাধ্যাও, তাঁকে আরাধনা এবং সমাশ্রয় ক'রে জীব ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করে, অতএব লক্ষ্মীর মধ্যস্থতা ও কৃপালাভ মুক্তির প্রধান সহায়ক । লক্ষ্মীর এই বর্ধিত প্রাধান্য নাথমুনি-যামুন-রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের বিশেষত্ব,১৩৪ রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাসের স্তবে রাধিকার প্রতি অধিকমাত্রায় আনুগত্য প্রকাশ উপরোক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল মনে হয় । রাধিকার প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধির আর একটা কারণ চৈতন্যের রাধাভাব অবলম্বন, সেই হেতু এই সময় থেকে রাধা অধিক মান্যতা পেয়েছেন ।

মানস-সেবার অনুজ্ঞা রূপ গোস্বামী ভক্তদের দিয়েছেন—

"তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্তনানু-
-স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামানসী নিযোজ্য ।
তিষ্ঠন ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ।"১৩৫

যথাক্রমে রসনাকে এবং মনকে (কৃষ্ণের) নাম-রূপ-গুণ-লীলার সম্যক কীর্তনে এবং অনুস্মরণে নিযুক্ত ক'রে ব্রজে বাসপূর্বক ব্রজবাসীজনের অনুগত হ'য়ে সর্বকাল যাপন করবে, এই সকল উপদেশের সার ।

মানসে লীলা-আস্বাদন এবং সেই লীলায় অংশ নিয়ে মানসে রাধাকৃষ্ণ যুগলের সেবা সখীভাবে—সাধনার এই আদর্শ, রাগানুগা ভক্তির এই বিকাশ-ক্রম রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস প্রবর্তিত বা প্রদর্শিত বলা যায় । এঁরাই প্রথম লীলাকীর্তন এবং লীলাশ্রবণের অতিরিক্ত কিছু বললেন, সেবিকা হিসাবে এই লীলার অংশগ্রহণ—যেটা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব হ'তে পারে ।

সখীভাবে সাধনার পূর্ণ মর্যাদা আগেই দিয়েছিলেন রামানন্দ রায় চৈতন্যের সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ে, কিন্তু তিনি নিজে এমন সেবার অভিলাষ কোথাও ব্যক্ত করেন নি যেমনটি করেছেন রূপ ও রঘুনাথ দাস । রামানন্দ রায় চৈতন্যকে বলেছিলেন—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ।
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ।
সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি
সখী ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।
× × × ×
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়
বেদধর্ম লোক ত্যজি সে কৃষ্ণে ভজয় ।
× × × ×
অতএব গোপী ভাব করি অঙ্গীকার
রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ।
× × × ×
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ।"১৩৬

কৃষ্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবান হ'য়েও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে রাধা ভিন্ন অপূর্ণ এবং সে কারণে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তির পূজা প্রশস্ত, এখন দেখা যাচ্ছে

সখীগণ ভিন্ন এঁদের লীলাও অপুষ্ট। বোধ হয় রাসলীলার প্রভাবেই সখীভাবের এই গুরুত্ব, কারণ সেখানে বহু গোপী পরিবৃত হ'য়ে তবেই কৃষ্ণের লীলা প্রকাশ।

পদ্মপুরাণ বিধান দিলেন সখীভাবে সেবার কিন্তু কৃষ্ণদাস রামানন্দের মুখে যে ভজনার কথা বললেন সেটা সখীভাবে নয়, সখীর আনুগত্যে। রূপ গোস্বামী বললেন ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে সাধন শুধু সাধক রূপেই নয় সিদ্ধ রূপেও, অর্থাৎ কৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেও সাধন স্বাতন্ত্র্যময়ী হতে পারবে না। ব্রজবাসীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের সেবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন রূপ ও রঘুনাথ দাস, কিন্তু তাঁরা রচিত শ্লোকে মঞ্জরী শব্দ ব্যবহার করেন নি, যদিও সেবার সব রকম কার্যই গ্রহণ করেছেন। পরে নরোত্তম দাস তাঁর বাংলা পদাবলীতে এই সেবার প্রর্থনা বিশদ ভাবে ব্যক্ত করেছেন, প্রভেদ এই যে রূপ ও রঘুনাথ নিজেদের ইচ্ছানুরূপ সেবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন, নরোত্তম কোনও সখী কর্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে তাঁর আজ্ঞানুরূপ রাধাকৃষ্ণের সেবা করবেন এই আকুতি জানিয়েছেন—

"সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে।"১৩৭
"সখীর আদেশ হবে চামর ঢুলাব কবে।"১৩৮

সখীর যে স্বাধীনতা আছে নরোত্তম তা চান নি, সখীর আনুগত্যে শুধু নয় অধীনে থেকে, তাঁর আজ্ঞাবহ হ'য়ে মঞ্জরীভাবে সাধনা র্তার কাম্য—

"ললিতা বিশাখা এই নিত্য সিদ্ধগণ
কৃষ্ণ যৈছে নিত্য সিদ্ধ তৈছে সিদ্ধ হন।
× × × ×
তার অনুরূপা হয় মঞ্জরীর গণ
সখী আজ্ঞাশ্রয় সেবা তাহার করণ।"১৩৯

সেবা-অধিকার পর্যায়ে মঞ্জরীর স্থান সখীর নীচে, নরোত্তমের বাসনায় ভক্তের মর্যাদা আরও কুণ্ঠিত হ'ল, ভক্তকে ক্রমে ক্রমে ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় রূপ-গোস্বামী-আদি চৈতন্যভক্তদের মঞ্জরী নামকরণ করেছেন। এই গ্রন্থ রূপের মৃত্যুর কমবেশি ২০ বৎসর পরে রচিত হয়েছিল মনে করা হয়।

মঞ্জরী সখীর নিম্নস্থানীয়া, সাধককে একেবারে নিম্নস্তরে থাকতে হবে এই লৌহ-অনুশাসন। রাজমাতা বা রাজমহিষী রাজাকে পুত্র বা পতি ভাবেই দেখেন কারণ তাঁরাও রাজকন্যা, রাজার তুল্য-পর্যায়ের লোক, অবশ্য রাজা যখন সিংহাসনে বসেন তখন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা

মহারাজ ব'লে তাঁকে মানতেই হয়, কিন্তু অন্য সময়ে নয়। দাস-দাসীর নিশ্চয়ই রাজাকে রানীমার চক্ষে দেখবার অধিকার নাই, জীবভক্ত দাস-পর্যায়ের, অতএব নিকট-পরিকর-ভাবে পরিচর্যার তাঁর অধিকার নাই, ইহলোকেও নয় পরলোকেও নয়। অপ্রকট লীলাতে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেও তিনি সখা ব'লে কৃষ্ণের কাঁধে হাত রাখতে পারেন না, বাৎসল্যে অভিভূত হ'য়ে ননি ছানা খাওয়াতে পারেন না, যে নিগূঢ় সম্পর্ক হ'লে মান করা চলে সেটা তাঁকে দেওয়া হয় নি, কান্তাভাবে সেবার তাঁর অধিকার নাই, কোনও ভোগবাসনা ত' দূরের কথা। সকল প্রকার অন্তরঙ্গতা পরিহার ক'রে, প্রেমসেবা জ্ঞাপনের সকল অভিব্যক্তি-প্রবণতা দমন ক'রে, তিনি শুধু দাস্যভাবে নির্লিপ্তভাবে পরোক্ষ ভাবে সেবা ক'রে যাবেন। বিধিমার্গের সাধকের মনে ভগবানের মাহাত্ম্য বা ঐশ্বর্য-জ্ঞানের প্রাধান্য থাকে, রাগানুগা মার্গের সাধনে এর পরিবর্তে থাকে মমত্ববোধ, সেবার অভিলাষ, অন্যবাসনাশূন্য কেবল-প্রেম।[১৪০] কিন্তু যাকে দাসানুদাস ক'রে অতি দূরে রাখা হয়েছে তার মমত্ববোধ জাগবে কি করে ?

সাধক সখ্যভাবে সেবা করেন গোপালকের বেশে, মধুর ভাবে সেবা করেন স্ত্রী বেশে, এই বেশ ধারণ সম্পূর্ণ মনে মনে, বাস্তব দেহে এমন বেশ ধারণ অপরাধ। চৈতন্য রাধাভাবের উপাসক, তাঁর পরিকররা ব্রজলীলার সখী, কিন্তু তাঁরা কখনও স্ত্রী বেশ ধারণ করেন নি, নবদ্বীপে দু-একবার অভিনয়-অংশে ছাড়া। সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাবের প্রয়োগ কোনও বিগ্রহ বা প্রতিমায় করা বিধেয় নয়। এমন কি ভগবানকে হৃদিস্থিত কল্পনা করাও ভক্তিসম্মত নয়, তিনি নিজধামে আছেন এবং ভক্ত সেখানেই তাঁর সেবা করছেন এই কল্পনাই সঙ্গত।[১৪১]

ভক্তের চরম কামনা অপ্রকট লীলায় সখীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের সেবা করা, "ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়"[১৪২] কিন্তু সেখানে পরকীয়া-ভাব-সংশ্লিষ্ট পূর্বরাগ অভিসার মান গোপন-মিলন বিরহ প্রভৃতির কোনও বৈচিত্র্য নাই এবং কবির উপজীব্য কিছুই নাই ব'লে এই লীলাকে অবলম্বন ক'রে বিশেষ কোনও সাহিত্য গ'ড়ে ওঠেনি। অতএব লীলা বলতে ভক্ত পরিচিত শুধু বৃন্দাবনের প্রকটলীলার সহিত এবং দেহধারী ভক্ত শুধুই এর মানস-অনুধ্যান করতে পারেন।

ভক্তের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ নিষিদ্ধ অথচ গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার চিন্তন শুধুই অনুমোদিত নয় শুধুই বাঞ্ছনীয় নয়, পরন্তু পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় হিসাবে পালনীয়। ভক্তকে মনশ্চক্ষে যে প্রেমলীলা অনুধাবন করতে বলা হয়েছে প্রাকৃত মানবপ্রেমের স্থূল রূপরেখাতেই সেটিকে ভক্তচক্ষে পরিস্ফুট করা হয়েছে, শক্তি এবং শক্তিমানের আধ্যাত্মিক অমূর্ত মিলনের রূপকে চিন্তা করবার,

শুভচিকীর্ষা নাই। এই প্রেমলীলা যে কতদুর অনাবৃত হ'তে পারে তা বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করলেই বোঝা যায়। যা কার্যত নিষিদ্ধ সেই প্রবৃত্তি মার্গীয় বিষয়ে অহরহঃ চিন্তন মনশ্চালন আবশ্যিক হয়ে উঠলে অবাঞ্ছিত বাসনার উদ্রেক হ'য়ে অনর্থের সৃষ্টি হ'তে পারে এমন ভয় বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম বিধায়কদের ছিল না, কারণ এমন চিত্তচাঞ্চল্যকেও এঁরা সাত্ত্বিক ভাব বলে মেনেছেন, যদিও পার্থক্য রাখবার জন্য বলেছেন রুক্ষ সাত্ত্বিক।[১৪৩] যাঁরা নিরামিষ আহার ও একাদশীর উপবাসের বিধান দিয়ে বিধবাদের চরিত্র-রক্ষণ সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত ভাবেই নিঃসন্দিহান হয়েছিলেন, সেই স্মার্তদের মতই বৈষ্ণব ধর্মপ্রণেতারা অনুরূপ বিধান দিয়ে ভক্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁরা মানসনেত্রে অষ্টপ্রহরীয় কেলিবিলাস-দর্শন অনুমোদন করলেও চিত্তচাঞ্চল্যকর চাক্ষুষ দৃশ্য নিষেধ ক'রে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিকের মধ্যে একটা কৃত্রিম বিভাজন রাখবার চেষ্টা করেছেন—

"কন্যাযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নস্ত্রীং প্রকটস্তনীম্
উন্মত্তং পতিতং ক্রুদ্ধং যত্রস্থং নাবলোকয়েৎ"

এ বিষয়ে সহজিয়াদের টিপ্পনি অপ্রযুক্ত নয়—

"পুনঃ কহি বর্তমান সাধন ভজন
নয়নে না দেখি কৈছে করিবে সাধন।
যাহা কোন কালে বস্তু না দেখি নয়নে
তাহাকে কেমন করি আরোপিবে মনে।"[১৪৪]

তাঁদের মতে মধুররসের পূর্ণ উপভোগ শুধু মননে হয় না তার জন্য চাই বাস্তব অভিজ্ঞতা, রমণী-চর্যা। বৈষ্ণবধর্মের এটি একটি অবাঞ্ছনীয় উপসর্গ কিন্তু লীলার মানস-অনুধ্যানের স্বাভাবিক পরবর্তী পদক্ষেপ।

সাধনভক্তির প্রায়িক ক্রম এইরূপঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি। পূর্বে যে শ্রবণ-কীর্তনাদি বলা হয়েছে সেগুলি ভক্তির অঙ্গ, এখন যে শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ বলা হ'ল এগুলি সাধনার stage বা স্তর। আসক্তির পরে উদয় হয় ভাব ও প্রেম, এ দুটি সাধন-ভক্তির চেয়ে উচ্চস্তরের।[১৪৫] রসতত্ত্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাবের ক্রমগুলিতে ভাব ও প্রেম নীচের দিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। তার পরে স্নেহ, মান প্রভৃতি আরও কয়েকটি উচ্চতরস্তর আছে, কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 'প্রেম' পর্যন্ত এসেই থেমে গেলেন।

'প্রেম্ণ এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধকেষ্বপি
অত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য ন হি শংসিতাঃ।'[১৪৬]

যেহেতু (স্নেহাদি) প্রেমের বিলাস (= বিশেষ বিশেষ অবস্থা) সাধকে বিরল, সে কারণে এ স্থলে স্নেহাদি ভেদ বিবেচিত হ'ল না। এ থেকে

নির্ধারিত হয় জাতরতি জীবভক্ত—বৈধী এবং রাগানুগা উভয় মার্গের ভক্ত—সাধনার ফলে মরদেহে প্রেম পর্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারেন, স্নেহ মানাদি স্তর যথাবস্থিত দেহে বিকশিত হয় না। স্নেহ-মানাদি স্তরের আলোচনা আছে উজ্জ্বলনীলমণিতে, এই গ্রন্থের সমস্তটাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেয়সী এবং অন্য পরিকরদের বিষয়ে। লক্ষ্য করবার বিষয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাব ও প্রেমকে যথাক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি বলা হয়েছে কিন্তু উজ্জলনীলমণিতে স্নেহ-মান-প্রণয়াদিকে "ভক্তি" আখ্যা দেওয়া হয় নি। 'ভক্তি' শব্দটি যেন বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে মর্ত্যসাধকের জন্য, যার পক্ষে স্নেহ-মান-প্রণয়াদিতে প্রবেশাধিকার নাই, তার পুরস্কার প্রেম পর্যন্তই সীমায়িত।

একটি মতবাদ এই যে জীবভক্ত অপ্রকটলীলায় সেবাধিকারী হ'য়ে স্নেহ থেকে সুরু ক'রে মহাভাব পর্যন্ত পেতে পারেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এই ভাবশ্রেণীর সবগুলির সম্ভাব্যতা তাঁর আছে কিনা। বলা হয়েছে[১৪৭] শান্তরতি প্রেম পর্যন্ত; দাস্যরতি রাগ পর্যন্ত, সখ্য ও বাৎসল্য রতি অনুরাগ পর্যন্ত এবং মধুরা রতি মহাভাব পর্যন্ত বর্ধিত হ'তে পারে; এ সব প্রযোজ্য পরিকর ভক্তের বেলায়, জীব ভক্তের বেলায় নয়। আমরা দেখেছি রূপ গোস্বামীর মতে সিদ্ধাবস্থাতেও জীবভক্ত আনুগত্যে সেবা করেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-স্থাপনে তাঁর অধিকার নাই। জীব গোস্বামী বলেছেন পার্ষদের ভাব নিয়ে সেবা করা যেতে পারে কিন্তু নিজেকে পার্ষদ কল্পনা করা অপরাধ। এমনটি করলে ভগবানের সঙ্গে বা তাঁর স্বরূপশক্তিভূত পরিকরের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয় এবং অহংগ্রহোপাসনার পর্যায়ে পড়ে, বৈষ্ণব মতে যা অপরাধ।[১৪৮] অতএব জীবভক্ত শুধুই অপরের আনুগত্যে দাস্যভাবে সেবা করতে পারেন, কি সাধক দেহে কি অমূর্ত দেহে জীবভক্ত প্রেমস্তরের অধিক অগ্রসর হ'তে পারেন না। পারেন শুধু তাঁরাই যাঁরা স্বরূপ-শক্তির অংশ, জীব সিদ্ধ অবস্থাতেও তটস্থা শক্তি।

ভক্তের চরম কামনা নিত্যলীলার অর্থাৎ গোলোকে অপ্রকট লীলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিন্তু পার্থিব জীবন থেকে সেখানে সরাসরি উত্তরণের পথ নাই। কৃষ্ণ যখন প্রকটলীলা সংবরণ করেন তখন শুধুই পরিকরদের নয় নদী গিরি বন পশু পাখী অর্থাৎ সমগ্র পরিবেশকে নিয়ে অপ্রকটে প্রবেশ করেন। সুতরাং গোলোকের অপ্রকটলীলায় স্থান পেতে হ'লে জীবভক্তের কোনও প্রকটলীলায় অংশ নেওয়া ছাড়া উপায় নাই, কারণ অপ্রকটে প্রবেশের একমাত্র দ্বার প্রকট থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে। আমরা দেখেছি কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের প্রকটলীলা আজও হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে হচ্ছে; দেহত্যাগের পরে জাতপ্রেম জীবভক্তের জন্ম হয় এমন কোনও প্রকটলীলা স্থলে। এবং যেহেতু লীলাপরিকররা সকলেই গোপী অতএব সাধককে গোপী-

গর্ভে জন্ম নিতে হ'বে। গোপীরা স্বরূপশক্তির অংশ, তাঁরা কি ক'রে জীবশক্তি ভক্তের জননী হ'তে পারেন তা বিশদ নয়। যাই হোক সেখানে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গ-প্রভাবে জীবভক্তের প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করে। স্নেহ-মান-প্রণয়াদি স্তরে এই ভাব পৌঁছায় কিনা সন্দেহ কারণ এ সমস্ত শুধু স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত গোপীদেরই সম্ভবে। লক্ষণীয় যে-দেহে ভক্ত প্রকট লীলায় প্রবেশ করেন সেটি কৃষ্ণলীলায় পরিকরত্বের উপযোগী সিদ্ধ দেহ নয়, প্রকট লীলার উপযোগী গোপিকা-গর্ভজাত দেহ, প্রভেদ এই যে এ ব্রহ্মাণ্ডে জাত না হ'য়ে অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে পুনর্জাত। বৃন্দাবনলীলার সব উপকরণই অপ্রাকৃত এমন কথা শুধু ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে[১৪৯], ভাগবতে এ কথা নাই, সুতরাং বলা যেতে পারে প্রকটলীলায় ভক্তের দেহ প্রাকৃত দেহ। প্রকটলীলার মাধ্যমে অপ্রকটে উত্তীর্ণ হওয়ার পরোক্ষ উপায়ে ভক্তের সাধ পূর্ণ হয়।[১৫০]

ব্রজলীলায় প্রবেশ করতে হ'লে জীবভক্তের পক্ষে কোনও সখীর বা মঞ্জরীর আনুগত্যে সাধন করা বিধেয়; যেহেতু রাধাভাব-বিভাবিত চৈতন্যের পরিকররা সকলেই পূর্বেকার ব্রজলীলার মঞ্জরী, অতএব এঁদের কারও আনুগত্যে কৃষ্ণের মধুর লীলায় প্রবেশ করায় বাধা নাই। কিন্তু দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাবের কৃষ্ণলীলায় অংশ গ্রহণ করতে হ'লে এ প্রকারে সম্ভব নয় কারণ চৈতন্যের সাধনা শুধু মধুর ভাবে এবং নবদ্বীপলীলার পরিকররা সকলেই মঞ্জরী, কৃষ্ণের দাস বা সখা নয়। কিন্তু চৈতন্যই পরম উপাস্য জেনে ভক্ত যদি নবদ্বীপলীলায় অংশ নিতে চান, তাঁকে আনুগত্য স্বীকার করতে হ'বে কোনও মঞ্জরীর নয় পুরুষের, কারণ চৈতন্য-পরিকররা (শচীমাতা ব্যতীত) সকলেই পুরুষ; মানস-অনুধ্যানে ভক্তকে সাধন করতে হবে পুরুষের সিদ্ধদেহে, কল্পিত রমণী-দেহে নয়, কারণ চৈতন্যের অনতিনিকটেও কোনও স্ত্রীলোকের উপস্থিতি অকল্পনীয়। চৈতন্যলীলায়, গোচারণ, রাসলীলা, কুঞ্জরচনা, ইত্যাদি নাই ব'লে ব্রজলীলার তুলনায় এটি রস-সাধনার উপযোগী হ'য়ে ওঠে নি, শাস্ত্রে বা সাহিত্যে জীবভক্তের পক্ষে এমন সাধনার বিধান বা বিবরণ বিরল।

## সাধন-ভক্তি ও সাধ্য-ভক্তি

সাধকের ভক্তির উচ্চতম পর্যায়ে আছে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, সাধন-ভক্তি থেকে পৃথক্ চিহ্নিত করবার জন্য এ দুটিকে বলা হয় সাধ্য-ভক্তি, ভক্তি এখানে সাধন-সোপান নয়, ভক্তিই অম্বিষ্ট বস্তু। ভক্তির এই ত্রিবিধ বিভাগ—সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি—পরিস্ফুট হয়েছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে।[১৫১] সাধন-ভক্তির উদ্দেশ্য কোনও কিছুর প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্য বস্তু ভক্তিতে নিরন্তর

নিমজ্জিত থাকার বাসনা হ'তে পারে কিম্বা মোক্ষাদি অন্য কিছুও হ'তে পারে। সাধন-ভক্তি সিদ্ধিলাভের পথ, সাধনার প্রক্রিয়া, উপায়; কিন্তু সাধ্য-ভক্তি উপায় নয় উপেয়, এইটাই প্রাপ্তব্য বস্তু, ভক্তিই শেষ কথা কারণ এর বিস্তারের অবধি নাই। শুদ্ধ-মাধুর্য-মার্গের ভক্তের কাছে এটি পঞ্চম পুরুষার্থ, আমরা পরে দেখব। কৃষ্ণ সেব্য বা সম্বন্ধ, সাধন-ভক্তি অভিধেয় এবং ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রয়োজন বা পুরুষার্থ। সাধনার "মুখ্য-ফল রতি"[১৫২] রতি এবং ভাব সমার্থক।

সাধন-ভক্তি প্রকারগত কিন্তু ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ধারাবদ্ধ নয়, কূলহীন প্লাবনের মত। প্রেমের অঙ্কুরাবস্থাকে বলে ভাব, অশ্রুপুলকাদি এর বহির্লক্ষণ, অনাসক্তি, ভক্তিবিষয়ে অবিচলতা ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ। প্রেমভক্তির বাহ্যলক্ষণ প্রবলতর—হাস্য, রোদন, নৃত্য, গীত, যখন কোনও লোকাপেক্ষা থাকে না। মানসিক লক্ষণ ভগবানে মমতাবোধ।

এখন প্রশ্ন এই—ভক্তহৃদয়ে সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির উদ্ভব হয় কি ভক্তের নিজের চেষ্টায় না অপরের প্রভাবে অর্থাৎ সাধুজনের সঙ্গলাভে না ভগবৎকৃপায় ?

ভাগবতে আছে[১৫৩] দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, বেদাভ্যাস, ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা এবং অন্যান্য বিবিধ কল্যাণকর উপায়ে ভক্তি উৎপাদন্ করতে হয়। এখানে ভগবৎকৃপার বা সাধুসঙ্গের কথা নাই। প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভক্তি উদ্রেকের নানা প্রসঙ্গ আছে কিন্তু কৃপার বা সাধুসঙ্গের কথা নাই।

ভাগবতে অন্যত্র[১৫৪] আছে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ম্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।"

সাধুসঙ্গ হেতু আমার বীর্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই কথার শ্রবণে শীঘ্র অপবর্গ-পথস্বরূপ শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি ক্রমানুসারে উদিত হয়। সাধন-ভক্তির প্রথম স্তর শ্রদ্ধা, অতএব নির্দ্ধারিত হ'ল সাধন-ভক্তির সুরুতেই সাধুসঙ্গ প্রয়োজন তার ফলে শ্রদ্ধা থেকে আরম্ভ করে রতি বা ভাবভক্তি এবং ভক্তি বা প্রেমভক্তি পর্যন্ত লাভ হ'তে পারে। কৃষ্ণকথার আলোচনার ফলেই শ্রদ্ধা প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভব সেজন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন আলোচনা প্রবর্তনের জন্য। ভগবৎকৃপার কোনও কথা নাই।

আরও আছে, ভ[illegible]ব যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয় তখন ভক্তির উদয় হয়, ফলে সংসার-নিবৃত্তি হয়।[১৫৫] সাধু সঙ্গে প্রাপ্ত ভক্তির দ্বারা ভক্ত কৃষ্ণকে ধ্যান করেন।[১৫৬] এ সব ক্ষেত্রেও ভগবৎকৃপার উল্লেখ নাই।

ভাগবতে অন্য স্থানে আছে[১৫৭] নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পদধূলি না পেলে অর্থাৎ কৃপা না হলে কৃষ্ণভক্তির উদয় হ'তে পারে না। এখানে কৃপার কথা আছে, যদিও ভগবৎকৃপা নয়, মহাজন-কৃপা।

"অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"[১৫৮]

যাঁরা ভগবানকে ভজন করেন তাঁদেরকে মুকুন্দ মুক্তিদান করেন কিন্তু কখনও ভক্তিযোগ দেন না। ভক্তি না হ'লে ভজন হয় না অতএব ভজনকারীর নিশ্চয়ই কোনও প্রকারের ভক্তি আছে, যাকে বলা যেতে পারে সাধন-ভক্তি; এবং যে ভক্তি ভগবানের অনুগ্রহ-নির্ভর, সে ভক্তি ভিন্ন প্রকারের, তা'কে বলা যেতে পারে সাধ্য-ভক্তি।

এই উক্তিগুলির অর্থসঙ্গতি শুধু এইভাবেই হ'তে পারে যে প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ সাধন-ভক্তির বিকাশের অবস্থায় ভক্তের চেষ্টা এবং সাধুসঙ্গ প্রয়োজন, উচ্চ মার্গের ভক্তি ভগবৎকৃপা ভিন্ন হ'তে পারে না।

রূপ গোস্বামী বলেছেন—

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি
হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা।"[১৫৯]

আসঙ্গরহিত (=কৃষ্ণে আসক্তিহীন) সাধনসমূহ দ্বারা দীর্ঘকালেও অলভ্যা এবং হরিকর্তৃক শীঘ্র দেয় নয়—এই দুইরকমে (হরিভক্তি) সুদুর্লভ। প্রথম অংশ থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় যে কৃষ্ণে মমতাহীন হ'য়ে শুধু নিয়মানুষ্ঠানিক ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করলে ভক্তিলাভ হয় না, তারজন্য চাই কৃষ্ণে আসক্তি। এই উক্তিকে ব্যতিরেকমুখে না নিয়ে অন্বয়মুখে নিলে ঐ দাঁড়ায় যে সাসঙ্গ বা সানুরাগ সাধনায় ভক্তি দুর্লভ নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে হরি শীঘ্র কা'কেও ভক্তি দেন না। অতএব এই উক্তির দু রকম অর্থ হ'তে পারে; এক, ভক্তের সাসঙ্গ সাধনা যথেষ্ট নয়, ভক্তি যেহেতু কৃষ্ণের দান অতএব তাঁর ইচ্ছার অপেক্ষা রাখে, এ দুয়ের সংঘটন না হ'লে ভক্তিলাভ সম্ভব নয়। দুই, ভক্তিলাভ প্রকারে দু-রকম, এক ভক্তি কৃষ্ণে আসক্তিপূর্ণ সাধনার দ্বারা লভ্য, অন্য ভক্তিতে ভক্তের কৃতিত্ব নাই, সেটি সম্পূর্ণ ভগবানের দান।

ভক্তিসম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর অন্যান্য উক্তি—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা"[১৬০]

(যা সাধক ভক্তের) চেষ্টায় সিদ্ধ হ'তে পারে এবং যা দ্বারা ভাবরূপা (ভক্তি) লাভ হ'তে পারে তাকে সাধন-ভক্তি বলে। হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ (অর্থাৎ বীজরূপে বিদ্যমান প্রেমাদি) ভাবের প্রাকট্যই সাধ্যতা। অর্থাৎ যে ভক্তির বীজ এখনও অঙ্কুরিত হয় নি তাই 'সাধ্যতা' রূপে

হৃদয়ে অবস্থিত, অতএব পূর্বকৃতির ফলে বীজ হৃদয়ে নিহিত থাকলে সাধনার ফলে অঙ্কুরিত হ'তে পারে।

"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্যসেবনে
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্যসৌ।"[১৬১]

যে কোনও অতিভাগ্যমান ব্যক্তি সেবায় শ্রদ্ধাবান হন্, যিনি অতিশয় আসক্ত নন্ বৈরাগ্যযুক্ত নন্ তিনি (ভক্তির) অধিকারী। এখানে শুধু অধিকারীর কথা বলা হয়েছে উপায়ের কথা নয়। ভাবভক্তি "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা"[১৬২] অতএব উচ্চস্তরের প্রেমভক্তিও নিশ্চয় তাই। রূপ প্রেমভক্তিকে সূর্য ও ভাবভক্তিকে তা'র কিরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ।"[১৬৩]

ভাব দুই প্রকারে আবির্ভূত হয়, সাধনের অভিনিবেশ দ্বারা এবং কৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তজনের প্রসাদে। অতিধন্য ব্যক্তিই এই ভাব লাভ করেন। তার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সাধনাভিনিবেশজাত ভাবই প্রায়শঃ সংঘটিত হয়, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তকৃপাজনিত ভাবোদয় বিরল। অতিধন্য অর্থে ভাগ্যবান; যে কোনও প্রকারের লাভকে আমরা সৌভাগ্যের হেতু মনে করি, এখানেও সেই অর্থেই ভাবভক্তিলাভ ভক্তকে ধন্য করে, যে প্রকারেই অর্জিত হোক না কেন। এর অধিক ব্যঞ্জনা এখানে নাই। মনে হয় রূপ গোস্বামীও "অতিধন্য" অর্থে শুধুই ভাগ্যবান মনে করেছেন কারণ প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত সংখ্যায় অতি অল্প।[১৬৪] অন্যত্র রূপ গোস্বামী বলেছেন[১৬৫] কৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় ভক্তগণের কৃপায় যাঁরা কৃষ্ণরতি লাভ করেন তাঁরা শান্তভাবের ভক্ত। শান্তভাবের ভক্ত বৈধীমার্গ অনুসরণ করেন, তাঁর মধ্যে কৃষ্ণরতি নাই। অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রে রাগমার্গে সাধনার অভিনিবেশ এবং ভগবৎ-এবং-ভক্তের কৃপা—এই দুইয়ের দুর্লভ সংযোগ ঘটে নি, তিনি অতিধন্য নয়।

উপরোক্ত শ্লোকের টীকায় জীবগোস্বামী বলেছেন অতিধন্য অর্থে প্রাথমিক মহৎ-সঙ্গজাত মহাভাগ্যবান, এই অর্থে সাধুসঙ্গই ভাবভক্তি লাভের মূল। কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে সাধুর অনুগ্রহ এখানে কৃষ্ণকথা স্মরণ করানোতেই পর্যবসিত, তার অধিক কিছু নয়, সুতরাং সাধুসঙ্গের ফলে ভক্তির উদয় হ'লেও ভক্তের চেষ্টাই সর্বময়, সাধু শুধু কৃষ্ণকথা শুনিয়ে সাহায্য করেন মাত্র, কৃপার আয়তি শুধু এই পর্যন্ত।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টীকায় বলেছেন ভাবের আবির্ভাব দুই প্রকারে হয়—সাধনাভিনিবেশে অনর্থ-নিবৃত্তি হ'য়ে; এবং কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের প্রসাদধন্য হ'য়ে মহৎসঙ্গজাত মহাভাগ্যফলে। অতএব যে ভক্তি

সাধনলব্ধ তা'তে কারও কৃপার আবশ্যক নাই।

"বৈধরাগানুগ-মার্গভেদেন পরিকীর্তিতঃ
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবিশেজঃ
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিম্
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ।"[১৬৬]

বৈধী ও রাগানুগামার্গভেদে সাধন-অভিনিবেশজাত দ্বিবিধ ভাব হয়। সাধনাভিনিবেশ প্রথমে রুচি উৎপন্ন এবং হরিতে আসক্তি উৎপাদন ক'রে রতির জন্ম দেয়। এখানে সাধনভক্তির কথা বলা হচ্ছে, যার শেষ দুটি স্তর রুচি ও আসক্তি, এবং যার পরে সাধ্যভক্তির প্রথম ক্রম রতি বা ভাব। এখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধনের অভিনিবেশ দ্বারা ভাব বা রতি পর্যন্ত ভক্তিলাভ করা যায়, ব্যঞ্জনা এই যে খুব কম ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের বা ভক্তের কৃপার সাহায্যে হয়। এখানে কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণরতিলাভ অভাবার্থেই অভিপ্রেত এবং অনুক্ত কারণ, "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া / কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।"[১৬৭] অতএব কৃষ্ণকর্তৃক প্রেমদান বিরল শুধু নয়, নাই বললেই হয়, বিশেষতঃ জীবভক্তের বেলায়।

"সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্যতে।"[১৬৮]

সাধনব্যতীত সহসা যে ভাবের আবির্ভাব হয় তা'কে কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তের প্রসাদজ বলা হয়। অতএব অনুমান অসঙ্গত নয় যে সাধনার ফলে যে ভাবের উদ্রেক হয় এমন ভাব প্রসাদজ নয়।

"সাধনেক্ষাং বিনা যস্মিন্নকস্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে
বিঘ্নস্থগিতমত্রোহ্যং প্রাগ্‌ভবীয়ং সুসাধনম্
লোকোত্তরচমৎকারকারকঃ সর্বশক্তিদঃ
যঃ প্রথীয়ান্ ভবেদ্‌ভাবঃ স তু কৃষ্ণপ্রসাদজঃ।"[১৬৯]

সাধন-জ্ঞান ব্যতিরেকেও যেখানে অকস্মাৎ ভাবের (উদয়) দেখা যায় সেখানে পূর্বজন্মের সুসাধনা (কোনও) বিঘ্ন দ্বারা স্থগিত ছিল (বুঝতে হবে)। যে বৃদ্ধিশীল ভাব লোকোত্তর চমৎকারী এবং সর্বশক্তিপ্রদ হয়, সে (ভাব) কৃষ্ণপ্রসাদজ। সাধন ব্যতিরেকেও যেখানে ভাবের উদয় হয় সেখানে পূর্বজন্মের সাধনা ছিল অনুমান করতে হবে, শুধু চমৎকারী ভাবকেই ভগবৎকৃপা বলে মনে করতে হবে। এমন ভাব সংখ্যায় বিরল কিন্তু প্রকারে শ্রেষ্ঠ।

"ভাবোত্থোঽতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি স দ্বিধাঃ
ভাব এবান্তরঙ্গাণামঙ্গানামনুসেবয়া
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ভাবোত্থঃ পরিকীর্তিতঃ।"[১৭০]

সেই (প্রেম) ভাবোত্থ ও হরির প্রসাদোত্থ ভেদে দুই প্রকার। ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গসমূহের সেবা (= পরিশীলন) দ্বারা পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হ'লে তা'কে ভাবোত্থ প্রেম বলে। অতএব প্রেমভক্তির উদয় হয়

ভাবভক্তি থেকে কিম্বা ভগবৎপ্রসাদে। এবং যেহেতু ভাবভক্তি জনিত হ'তে পারে এক উপায়ে অর্থাৎ সাধনের অভিনিবেশ দ্বারা অতএব প্রেমভক্তির উদয় হ'তে পারে সাধনার ফলে, ভগবৎকৃপার আবশ্যক নাই। ভক্তির উদয়ের প্রায়িক ক্রম বিবৃত হয়েছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে[১৭১] শ্রদ্ধা থেকে প্রেম পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে, এখানে ভগবৎপ্রসাদের কোনও প্রসঙ্গ নাই।

কিন্তু রূপ গোস্বামী ভাবভক্তিকে বলেছেন "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা", ঐটি গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ স্বরূপশক্তির বৃত্তি। তা হলে এটি জীবের স্বায়ত্ত নয়, ভগবৎকৃপা-নির্ভর।

"ভাব" কথাটি গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে এমন ব্যাপক ও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে এর যথার্থ অর্থ নির্ণয়ে যথেষ্ট বৈকল্য ঘটে, যার ফলে রূপ গোস্বামীর সব বাক্যের নিশ্চিতার্থ সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় তাঁর সঙ্গতিপূর্ণ বিচারলব্ধ মত এইরূপ ঃ

জীবের পক্ষে সাধনা অপরিহার্য, সাধনার চরম স্তর কৃষ্ণে আসক্তি, এই আসক্তিই সাধ্যভক্তির প্রবেশ-পথ। অনেক সময়ে ভক্তি বীজ-রূপে হৃদয়ে সুপ্ত থাকে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে, সাধনার দ্বারা সেটি পুষ্ট এবং ফলবতী হয়। সাধনালব্ধ ভক্তিঅর্জন নিজের চেষ্টাসাপেক্ষ, ভগবৎকৃপার প্রয়োজন বা সম্পর্ক নাই। এই ভক্তি-উদ্রেকে কৃষ্ণভক্তের কৃপার প্রয়োজন কোথাও বা কথিত হয়েছে, এই কৃপার অর্থসঙ্গতি এই যে কৃষ্ণভক্ত সাধু শ্রবণকীর্তনাদির পথ ব'লে দেন, পঠনপাঠনে সাহায্য করেন, তিনি guidc বা নির্দেশক। তিনি উপায় নির্দেশ করেন মাত্র, তার অধিক কোনও প্রসাদ-দানের ক্ষমতা তাঁর নাই।

ভক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায় কৃষ্ণের কৃপা, যা সহজে বর্ষিত হয় না। ভক্তিলাভ কৃষ্ণপ্রসাদে হয়েছে মনে করা যেতে পারে (১) যেখানে সাধন ব্যতীত ভাবের উদয় দেখা যায় কিম্বা (২) যেখানে লোকোত্তর চমৎকারী ভাবের উদয় হয়; এটি সম্ভব হয় ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সাধ্য-ভক্তির ক্ষেত্রে; অতএব সাধ্য-ভক্তি ঈশ্বরকৃপালভ্য; প্রেমভক্তির ঊর্ধ্বতন আরও স্তর আছে কিন্তু সেসব জীবভক্তের লভ্য নয়।

শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তির বৃত্তি এই তত্ত্বকে প্রাধান্য দিলেন জীবগোস্বামী এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ। রূপ গোস্বামী বলেছেন ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা, পূর্বোক্ত দু জন সকল ভক্তিকেই স্বরূপশক্তির বৃত্তি মেনে স্থাপন করলেন এই মত যে ভক্তি মাত্রই ভগবৎকৃপাসাধ্য।[১৭২] স্বরূপশক্তির যে জ্যোতিকণাটুকু জীবের আছে তা মায়াশক্তির বিরাট মেঘাবরণে আচ্ছন্ন, মায়াশক্তিকে নিবারণ করা জীবের সাধ্য নয়, তজ্জন্য ভগবৎকৃপা আবশ্যক।

কৃপাবাদের প্রবল সমর্থক জীব গোস্বামী ভাগবতের "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"[১৭৩] এই শ্লোকের উপরে নির্ভর ক'রে কৃপাকেই ভক্তি উদ্রেকের একমাত্র কারণ বলেছেন। যেহেতু অন্যের দুঃখ নিজের চিত্তে প্রবেশ করলে তবেই কৃপার উদ্রেক হয় এবং যেহেতু চিরানন্দময় ভগবানের চিত্তে অজ্ঞানময় দুঃখ প্রবেশ করতে পারে না, সেই হেতু ভগবানের নিয়োজিত ভগবদ্ভক্তই কৃপা করেন, ভগবান স্বয়ং নয়। এবং সাধুর কৃপা স্বতঃই বর্ষিত হয়, উপাসনা দ্বারা লাভ করা যায় না। ভগবান শুধু স্ববৃন্দে হ্লাদিনী শক্তি নিক্ষেপ করেন, বোধ হয় হরিরলুঠের মত ছুড়ে দেন ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে। "কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন", ভগবান পরমস্বতন্ত্র, ভক্তই সঙ্গদান এবং কৃপাদান ক'রে মঙ্গলের সূচনা করেন। যে স্থানে সৎসঙ্গের অস্তিত্ব দেখা যায় না, সে স্থানে আধুনিক বা প্রাক্তন বা পারম্পরিক সৎসঙ্গের অনুমান করতে হ'বে। "অন্যথা হি তদসম্ভবঃ"[১৭৪], কৃপা ভিন্ন ভক্তির উদ্রেক অসম্ভব। রূপ গোস্বামীর সাধন-উদ্যম সম্বন্ধে উৎসাহ-উক্তি নিরাকৃত হ'ল।

যেখানে সাধুসঙ্গ প্রতীয়মান নয় সেখানে পূর্বজন্মের সজ্জন-কৃপা মনে করতে হবে, বলেছেন জীব গোস্বামী। এর সঙ্গে তুলনীয় রূপ গোস্বামীর অভিমত—যেখানে ভাবের উদয়ের কোনও কারণ পাওয়া যায় না সেখানে পূর্বজন্মের সাধনা ছিল বুঝতে হ'বে। এখানে সাধুসঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই, বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন বোধেই।

ভক্তির স্বরূপলক্ষণ সেবা বাসনা—কায়মনোবাক্যে। ভক্তিকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় (১) আরোপসিদ্ধ—যেখানে স্বতঃই ভক্তির উদয় নাই কিন্তু ভগবানে সমর্পিত কর্মাদি থেকে ভক্তিভাবের উদয় হয়। (২) সঙ্গসিদ্ধ—এই ভক্তিও স্বতঃউত্থিত নয়, ভক্তের সঙ্গগুণে জ্ঞানকর্মের সহায়তায় ভক্তির সূত্রপাত হয়। (৩) স্বরূপসিদ্ধ—স্বতঃই উত্থিত হয়েছে এমন ভক্তি।[১৭৫] প্রথম দুটি ক্ষেত্রে ভক্তির উদয়ের হেতু পাওয়া যাচ্ছে, অতএব অন্য কোনও অজ্ঞাত হেতু অনুসন্ধানের আবশ্যক নাই, তৃতীয় ক্ষেত্রে ভক্তির উদয় অহেতুক, অতএব শুধু এখানেই ভক্তির উদয় ভগবৎকৃপায় হয়েছে মনে করা উচিৎ।

মায়া সৎ, কারণ ভগবানের শক্তিবিশেষ। ঈশ্বর মায়ার নিয়ন্তা, জীব মায়ার বশ মায়ার দ্বারা সম্মোহিত।[১৭৬] অনাদিকাল হ'তে মায়াসম্পর্ক বশতঃ জীবের স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটেছে, সে যে কৃষ্ণের নিত্যদাস এ ধারণা নষ্ট হ'য়ে সে অনাদিবহির্মুখ। মায়াকে অপসারিত করতে পারেন শুধু ভগবান, সাধন-ভক্তির ফলে ভগবৎকৃপা লাভ করলে তবেই মায়া দূর হ'তে পারে।[১৭৭] অতএব ভক্তচিত্তে ভাগবতী প্রীতির উদয়ের জন্য চাই কৃষ্ণের প্রসাদ। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব

নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীতাখ্যয়া বর্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি; অতএব তৎসুখেন ভক্ত-ভগবতো পরস্পরম আবেশমাহ।"[১৭৮] সেই হ্লাদিনীর কোনও এক অতিশয় আনন্দদায়ক বৃত্তি (কৃষ্ণকর্তৃক) নিত্য ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে ভগবৎ-প্রীতি নামে (ভক্তচিত্তে) বর্তমান থাকে। ফলে ভগবানও সেইভাবে পরম ভক্তকে অতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখেন; অতএব পরস্পরের সুখের জন্য ভক্ত ও ভগবান আবেশযুক্ত থাকেন। হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ যদি নিত্যই সর্বজীবে বর্ষিত হচ্ছে, তা হ'লে ভগবানের বা সাধুর পৃথক প্রাতিস্বিক কৃপার অবকাশ কোথায়?

জীব গোস্বামীর মতে অতিভাগ্য অর্থে মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কার বিশেষ[১৭৯] এবং অতিধন্য তাঁরাই যাঁদের প্রথমেই মহৎসঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় হয়েছে।[১৮০] আরও বলেছেন ভক্তসঙ্গ হ'লে সেই ভক্তের কৃপায় পরমমঙ্গলোদয় অর্থাৎ সৌভাগ্যের উদয় হয়।[১৮১] জীব গোস্বামী প্রাধান্য দিয়েছেন সাধুসঙ্গকে যা ব্যতিরেকে ভগবৎ-ভক্তির বাসনা লোকচিত্তে উদয় হ'তে পারে না। সাধন-ভক্তির প্রায়িক ক্রম প্রথমে শ্রদ্ধা পরে সাধুসঙ্গ, কিন্তু জীব গোস্বামী সাধুসঙ্গকে দ্বিতীয় স্তর নয়, কারণ রূপে প্রারম্ভেই আবশ্যক মনে করেছেন। এতে বোধ্যতার আরও একটি অন্তরায় সৃষ্ট হ'ল।

"পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্যায়া। ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্বদা তিষ্ঠতি।"[১৮২] পরমসারভূতা স্বরূপশক্তির সারভূতা হ্লাদিনী নামে যে বৃত্তি, তারও সারভূত বৃত্তিবিশেষের নাম ভক্তি, যাকে বলে রতি। ভগবান কর্তৃক ভক্তে নিক্ষিপ্ত ভক্তি উভয়কোটি রূপে সর্বদা বিরাজ করে। রূপ গোস্বামী ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিকে শুধুই বলেছেন "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা", যা স্বরূপশক্তির প্রকাশ, জীব গোস্বামী একে তিনবার পরিশুদ্ধ ক'রে আরও খাঁটি আরও উজ্জ্বল সোনায় পরিবর্তিত করলেন। এই শক্তি জীবের যৎসামান্য আছে। কিন্তু রূপ গোস্বামী এমন কথা বলেন নি, তিনি মানুষের চেষ্টাকে অনেক বেশী মর্যাদা দিয়ে তাকে স্বনির্ভর স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে বলেছেন। জীব গোস্বামী কর্তৃক নিরুক্ত "ভক্তি" এতই বিশুদ্ধ বস্তু যে তাকে ভগবানের দান না বললে অসঙ্গতি থেকে যায়, তাই জীব গোস্বামী বলেছেন সর্বক্ষেত্রেই এমন ভক্তি ভগবানের কৃপালব্ধ। তথচ ভগবান নিজে কৃপা করেন না করেন ভক্ত। জীবভক্ত স্বরূপশক্তির এমন সুমহৎ বৃত্তি হয়ত পেতে পারেন কিন্তু দান করতে অর্থাৎ সঞ্চারিত করতে পারেন কি? তা যদি করতে পারেন তা হ'লে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ কি রইল?

ভক্তির উদ্রেকে ভগবদ্ভক্তের কৃপাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বোধ হয় এই কারণে যে ভক্তির উদ্রেক হয় কৃষ্ণকথা শ্রবণ অনুধাবন

করলে, কিন্তু সেকালে গ্রন্থ ছিল অপ্রতুল, গ্রন্থ থেকে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম, অধিকাংশ লোকই ভক্ত কথকের মুখে এ সব শুনতো, শিক্ষিত কথক ছিল সংখ্যায় অল্প। তাই এই মত প্রচার হ'ল যে কৃষ্ণভক্তি-উদয়ে ভক্তের প্রসাদ একান্ত আবশ্যক।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীব গোস্বামীর মতের পোষক, তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন ভগবৎকৃপা এবং সাধুসঙ্গকে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যমান জীব
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
× × × ×
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদিজল ॥
× × × ×
এই ত পরমফল—পরম পুরুষার্থ
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥"[১৮৩]

"সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহো তরে
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসারে ক্ষয়োন্মুখ হয়
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
× × × ×
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়
ভক্তিফল "প্রেম" হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎ-কৃপা বিনে কোন কর্মে ভক্তি নয়
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার না হয় ক্ষয় ॥"[১৮৪]

"কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ।।
রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে "প্রেম" নাম
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দধাম ॥"[১৮৫]

"সাধুভক্ত সঙ্গে কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায় ॥"[১৮৬]

সাধন-ভক্তির আরম্ভ হয় শ্রবণ কীর্তন থেকে, কিন্তু এর বীজ ভক্ত লাভ করে কৃষ্ণের কিম্বা গুরুর প্রসাদে এবং শেষ পর্যন্ত ফলস্বরূপ পায় প্রেম যেটি পরমপুরুষার্থ। সাধন-ভক্তির প্রথম স্তর শ্রদ্ধা, সেটা হয় ভাগ্যের ফলে, শ্রদ্ধার উৎপত্তি হ'লে সাধুসঙ্গে ইচ্ছা জন্মে এবং তার পরে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা রুচি প্রভৃতির লাভে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি অর্জন হয়। ভক্তের চেষ্টার, আত্মনিষ্ঠার, নির্ভরতার কোনও স্বীকৃতি নাই, তিনি ভেলার মত কর্মস্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছেন, কর্মক্ষয় নিজের চেষ্টায় হ'বার নয়, ভাগ্যের কথা। এখানে ভাগ্য এবং সাধুসঙ্গ সমার্থক নয় যদিও জীব গোস্বামী দুটিকে এক মনে করেছেন। কৃষ্ণদাসের মতে ভগবৎকৃপার প্রয়োজন সাধন-ভক্তির সুরুতেই আছে, সাধন-ভক্তিতে কৃষ্ণরতি পর্যন্ত লাভ হ'লে ভাবভক্তি কিম্বা প্রেমভক্তি লাভের জন্য পুনরায় কৃপার প্রয়োজন নাই, জীব গোস্বামীর মতে সর্বস্তরেই হ্লাদিনীর কৃপা অবশ্যক।

রামানন্দ রায় বলেছেন "প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার"[১৮৭] কৃষ্ণদাস বলেছেন

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম "সাধ্য" কভু নয়
শ্রবণাদি-শুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয়।"[১৮৮]

"উদয়" শব্দের সার্থকতা এই যে কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে সৃষ্ট হয় না আবির্ভূত হয় মাত্র, এটি আগন্তুক বস্তু। জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তির বৃত্তি অতি সামান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপশক্তির বা হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি ব'লে ভক্তচিত্তে এর সৃষ্টি হ'তে পারে না, কৃষ্ণ কর্তৃক কৃপা-প্রদত্ত হ'তে পারে মাত্র। রামানন্দ কৃপাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি তিনি শুধুই বলেছেন প্রেমভক্তি সাধ্যভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অর্থৎ চরম প্রাপ্য বস্তু। পরে যখন উপায়ের প্রশ্ন এল তখন সাধ্য-ভক্তিকে উপেয় রূপে দেখে সাধনভক্তিকে উপায়স্বরূপ মনে করা হ'ল। সাধনার প্রয়োজন কৃষ্ণদাস অস্বীকার করেন নি; শ্রবণাদি সাধনার অঙ্গ, সাধনার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়; সাধন-ভক্তি চিত্তকে শুদ্ধ ক'রে কৃষ্ণপ্রেমকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত করে মাত্র, কৃষ্ণপ্রেম জন্য পদার্থ নয় অনাদিকাল হ'তে বিদ্যমান আছে, স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, এটি লভ্য বস্তু। রামানন্দ সূক্ষ্মবিচারে না গিয়ে শুধুই বলেছেন যে-সকল বস্তুর জন্য সাধনার প্রয়োজন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি। ভক্তিতত্ত্বের এই বিবর্তন মনে রাখলে এই দুই উক্তিতে বিরোধ নাই।

চৈতন্য যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করেছিলেন তখন ভক্তির উদ্রেকে ভগবৎকৃপার প্রয়োজন ছিল না—

"প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে "শ্রবণ কীর্তন
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন ॥
শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা
সেই পরমপুরুষার্থ পুরুষার্থ-সীমা ॥"[১৮৯]

কিন্তু পরে এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে যে চৈতন্য ভক্তের মনে প্রেম উদ্বুদ্ধ করেন নি " প্রেমদান" করেছিলেন, চৈতন্যকে ঈশ্বর প্রতিপাদন করার পরেই স্থির হ'ল প্রেমভক্তি সাধনলভ্য নয় ভগবৎ-কৃপালভ্য।

## ঐশ্বর্য ও মাধুর্য

বৈধী ভক্তিতে ভক্তের মনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাব প্রবল, রাগানুগা ভক্তিমার্গে মাধুর্য ভাব প্রবল। ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্তিতে কৃষ্ণের স্পৃহা নাই, তিনি চান মানবিক ঘরোয়া সম্পর্ক।

"ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে
তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥
× × × ×
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
তুমি কোন্ বড়লোক ? তুমি আমি সম ॥"[১৯০]

কৃষ্ণ অসমোর্ধমাধুর্য, মাধুর্যে তাঁর সমান বা উর্ধ্বে কেউ নাই, অতএব এই শ্লোকে বড় অর্থে বয়স, ক্ষমতা, বিদ্যাবুদ্ধি, সব বিষয়েই কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা সঙ্গত, একমাত্র মাধুর্যে সঙ্গত নয়। পাছে কেউ মনে করেন এমন হীনমন্য ঈশ্বরকল্পনা আর কোনও ধর্মে নাই, সেজন্য স্মরণ রাখা উচিৎ যে এই বিচিত্র অভিলাষ শুধু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—পরের পংক্তিতে যাদের "শুদ্ধভক্ত" বলা হয়েছে—কোনও সাধক জীবভক্তের অধিকার নাই যে কল্পনাতেও নিজেকে বড় মনে ক'রে ভগবানকে হীন মনে করে বা তাঁর কাঁধে চড়ে, বা তাঁকে পুত্র সখা প্রাণপতি ব'লে ডাকে। অনেক ভক্ত ঈশ্বরকে এ ভাবে ডেকেছেন কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের এ অধিকার নাই, তাঁর ক্ষেত্রে দাস্যই অবধি।

শুধু কৃষ্ণ নয় কৃষ্ণের পরিকররাও ঐশ্বর্যভাবে প্রীত নয়।

দ্বারকাধিপ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব দর্শনে রাধার আক্ষেপ এবং গোপকৃষ্ণের জন্য আকুতি ব্যক্ত হয়েছে রূপ গোস্বামীর শ্লোকে।[১৯১] এই ভাবের অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"রাজবেশ হাতীঘোড়া মনুষ্যগহন
কাহাঁ গোপবেশ—কাহাঁ নির্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥[১৯২]

গৌড়ীয় মতের বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির সঙ্গে রূপ গোস্বামী তুলনা করেছেন যথাক্রমে মর্যাদা ও পুষ্টিমার্গের দ্বিবিধ সাধনার, যা বল্লভাচার্য প্রবর্তিত।[১৯৩] চৈতন্য ও বল্লভাচার্য সমসাময়িক, উভয়ে মিলিত হয়েছিলেন প্রয়াগের নিকটে আড়াইল গ্রামে, ভক্তির প্রকার সম্বন্ধে পরস্পর-প্রভাবিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। উভয়ের মধ্যে যদি কিছু আলোচনা হয়ে থাকে দুঃখের বিষয় যে তার কোনও বিবরণ কোনও চরিতকার লিপিবদ্ধ করেন নি। তুলনাত্মক ধর্মবিচারের একটা দিক আলোকহীন রয়ে গেল।

বল্লভাচার্যের মতে ভগবানকে পতিভাবে পাবার কোনও প্রতিবন্ধক নাই।"শ্রীভগবান স্বরূপতঃ সকল জীবের প্রভু হইলেও যাঁহাকে স্বীয়ত্ত্বে বরণ করেন, তাঁহার (সেই জীবরূপা প্রকৃতির) বিবাহিত পতির ন্যায় ভর্তা হইয়া বরণজ স্নেহাতিশয্যে ভক্তের পোষ্য বা পাল্য হ'ন।"[১৯৪] ভগবান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তকে এ অধিকার দেন নি।

## দৈব, ভাগ্য, পুরুষকার

সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রে ভগবৎকৃপার স্থান অতি উচ্চে, মাহাত্ম্য সর্বোত্তম। এর আরম্ভ হয়েছে উপনিষদের যুগ থেকে।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত-
-সৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"[১৯৫]

ইনি যাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন তিনিই এঁকে লাভ করেন তাঁর কাছে এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই বেদবাক্যের অনুসরণে বলা হয় মুক্তি প্রভৃতি ভক্তের সমুদয় প্রাপ্তি ভগবানের কৃপানির্ভর। এমন কথাও শোনা যায় যে ভক্তির উদ্রেকও ভগবৎকৃপা ভিন্ন হয় না, সাধনায় চিত্তশুদ্ধি হয় শাস্ত্রজ্ঞান জন্মায়, কিন্তু পরাবিদ্যা লাভ বা ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি হয় ভক্তির সহায়ে, যে ভক্তি ভগবানের ইচ্ছা-নির্ভর, স্বতঃই হৃদয়ে উত্থিত হয় না। ভক্তি প্রসাদ-পূর্বিকা অর্থাৎ ভক্তির উদয়ের আগে ভগবৎ প্রসাদ আবশ্যক।

এমন একটা কাল ছিল সর্বদেশে, যখন মনে করা হ'ত এক বা একাধিক দেবতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কার্যকলাপের

নিয়ন্ত্রণে উৎসাহী এবং কিভাবে দেবতার হস্তক্ষেপ বা ব্যতিচার আসবে সেটা সম্পূর্ণ অজানা। এই থেকেই দৈব কথাটার সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক সব কিছুকেই দৈবকার্য মনে করা হ'ত এবং ছিল দেবতার ইচ্ছা বা খেয়ালের অধীন; সে কালে দৈব ছিল একটি প্রবল উপাদান। ইন্দ্র প্রীত না হ'লে সুবৃষ্টি হবে না, বৃষ্টি না হ'লে চাষী যতই লাঙ্গল দিক সার দিক শস্য হ'বে না, সুতরাং এখানে দৈব প্রবল, চাষীর চেষ্টা নগণ্য। তার পরের যুগে এই ধারণা প্রবল হ'ল যে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি হয় অনাচার বৃদ্ধি হ'লে, যার জন্য রাজার কুশাসন দায়ী, সুতরাং সব অনর্থের মূল হ'লেন রাজা। আজ রাজা নাই কিন্তু রাজকর্মচারী আছে এবং লোক দেখছে যে কর্মচারীর অপ্রমিত ত্রুটি জুলুম সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সুবৃষ্টি সুফলন হচ্ছে, অতএব লোকমন আবার বিশ্বাসী হয়েছে দৈবের উপরে। আজও অনাবৃষ্টি হ'লে যাগযজ্ঞ এবং নানাবিধ গ্রাম্য প্রক্রিয়ায় দেবতার তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষিত মানুষ আজ জানে এগুলি প্রকৃতিক প্রক্রিয়া, প্রকৃতির সব নিয়ম আমাদের জানা নাই ব'লে খামখেয়ালের ধারণা সম্পূর্ণ বর্জিত হয় নি, যদিও দৈব শব্দটি দেবতার অভিরুচি হিসাবে আজ ব্যবহৃত হয় না, দৈবাৎ বলতে আমরা আকস্মিক অপ্রত্যাশিত অর্থেই নিই, দেবতার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নাই। দৈবের প্রতিকার আমরা কিছুটা করতে পারি পুরুষকার দিয়ে, সুবৃষ্টির বৎসরে ফালতু জলকে বাঁধ দিয়ে ধ'রে রেখে, সুপুষ্ট নদী থেকে খাল কেটে নিয়ে বা গভীর নলকূপ বসিয়ে অনুর্বর জমিকে উর্বর ক'রে খরাত্রাণ করতে পারি আংশিক ভাবে। অতএব কার্যসাফল্যের জন্য দৈব ও পুরুষকার উভয়ই আবশ্যক।

এ বিষয়ে গীতা কি বলেন দেখা যাক। যেখানে এমন উক্তি পাওয়া যায় যে জীব নিজেকে কর্তা মনে করে অথচ সে প্রকৃতির নিয়োজনেই কর্ম করে (যেমন গীতা ৩/২৭), কিম্বা কর্ম করব না বললেও প্রকৃতি কর্ম করায় (যেমন গীতা ১৮/৫৯) সেখানে জীবাত্মা প্রকৃতি-সহায়েই অর্থাৎ মনবুদ্ধিইন্দ্রিয়-সমন্বিত হ'য়ে কর্ম করবার বাসনা বা শক্তি পায় এইটাই বুঝে নিতে হবে, এখানে দৈব-পুরুষকার দ্বন্দ্ব বা স্বাধীন ইচ্ছা বা frcc-will এর প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এমন উক্তি পাওয়া যায় (যেমন গীতা ১৮/৬১) যেখানে বলা হয়েছে যে জীব ঈশ্বরের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তিনি যে ভাবে জীবকে চালনা করেন সে সেই ভাবেই চলে যেন খেলাড়ীর হাতে কাঁঠপুতুল। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি গীতাতেই পাওয়া যায় (৬/৫) মানুষ নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে, কখনও অবসাদগ্রস্ত হবে না। এখানে ভগবানের দ্বারা চালিত হবার কোনও প্রশ্ন নাই।

গীতার ১৮/১৪ শ্লোকে দৈব-পুরুষকার দ্বন্দ্ব নিরশন ক'রে

উভয়কেই ন্যায্যমূল্য দেওয়া হয়েছে, মানুষের চেষ্টা-প্রযত্ন এখানে স্বীকৃত। মহাভারতে আছে[১৯৬] "দৈবে চ মানষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্" দৈব এবং পৌরুষ সংযুক্ত হ'লেই লোকের (অভীষ্ট ফল লাভের) কারণ হয়।

প্রহ্লাদ বলেছেন

"সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম।"[১৯৭]

কল্পতরুর ন্যায় তোমার প্রসাদ সম্যক সেবার দ্বারাই লাভ হয়। সেই প্রসাদ সেবার অনুরূপে (=অনুপাতে) উদয় হয়, কোনও ভেদের বিচার নাই। প্রসাদ যদি সেবার অনুপাতে হয় তা হলে যোগ্যতার বিচারেই হয়, অহেতুক কৃপার স্থান নাই।

ভগবানের ইচ্ছাকে যদৃচ্ছা মনে করলে ভক্তের সাধন-প্রয়াসকে কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ভগবানের চিত্ত বিগলিত হ'লে তবে কৃপা খেয়াল খুসীমত প্রবাহিত ও বিতরিত হয় এই ধারণা পরিত্যাগ ক'রে আমাদের বুঝতে হ'বে কৃপা অর্থে যোগ্যতার পরীক্ষা। ভগবান যখন বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে পার্ষদরূপে ভক্তকে স্থান দেবেন তখন যোগ্যতা বিচার করেই দেবেন, এরই নামান্তর কৃপা। ভগবান সহজে প্রেম দিতে চান না[১৯৮]—এর অর্থ তা হলে এই যে পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সাধনার প্রারম্ভেই যদি কৃপার প্রয়োজন হয় তা হলে একে যোগ্যতা-নির্ধারণ ব'লে অভিহিত করা যায় না, কারণ তখন ভক্তি বা সাধনা সুরুই হয় নি অতএব পরীক্ষা কিসের? ভক্তির ক্লাসে পরীক্ষা শুধু উত্তীর্ণ হবার সময়ে, প্রবেশের সময়ে পরীক্ষা নাই, কারণ ক্লাসে স্থানাভাব নাই, জাতিকুলাদি বিচার নাই[১৯৯], যে কেউ ভর্ত্তি হ'তে পারে। সাধনভক্তি শুদ্ধস্বরূপ নয় জীবভক্তের আয়ত্ত, এখানে কৃপার আবশ্যক নাই, জীবের ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায়কে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ভক্তির পথে জীবকে অগ্রসর হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াই সঙ্গত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেওয়ার সময়ে the Chancellor is pleased to award the degree. এই ডিগ্রিলাভ ছাত্রের পরীক্ষায় কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে, Chancellor-এর কৃপার উপরে নয়, এখানে শুধু একটা আনুষ্ঠানিক রূপ বজায় রাখা হয়েছে।

ঈশ্বরকে বলা হয়েছে ভক্তির বশ। তা যদি হয় তা হ'লে তাঁকে ভক্তির অনুপাতেই কৃপা দিতে হবে, অন্যথায় তাঁর ভক্তিবশ্যতা থাকে না। বৈদিক যুগে দেখা যায় যজ্ঞ বা তপস্যা যদি যথারীতি করা হয় তা হ'লে প্রার্থিত ফল যাজ্ঞিক বা তাপস পাবেই, এর কোনও বিকল্প নাই। ভক্তিশাস্ত্রের বেলায় এর কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

চৈতন্যের সাধ্য ছিল না বা ইচ্ছা ছিল না অপরাধীকে কৃপা করা বা প্রেমভক্তি দান করা যতক্ষণ না সে অপরাধমুক্ত হয়েছে ক্ষমালাভ করেছে কৃতাপরাধ ব্যক্তির কাছ থেকে।[২০০] নিত্যানন্দ মাধাইকে ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু পাপমুক্তি তিনি বা চৈতন্য কেউই দিতে পারেন নি, তাঁরা শুধু উপদেশ দিয়েছিলেন কীর্তনের, যার ফলে মাধাইয়ের পাপমুক্তি হ'ল।[২০০ক] পাপক্ষয় হ'ল পুণ্যকর্মের ফলে।

অতএব বহুমতকে বিচার ক'রে যদি একটি অর্থপূর্ণ সামঞ্জস্যে না আসা যায় তা হলে সেইটুকুই গ্রহণ করতে হ'বে যা ঈশ্বরের চরমকর্তৃত্ব অব্যহত রেখে মানুষের উদ্যমকে মর্যাদা দেয়। এবং মনে হয় বৈষ্ণব তত্ত্ববেত্তারা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা'তে এইটাই সূচিত হয়েছে যে সাধন ভক্তির সর্বস্তরই জীবভক্তের আয়ত্তের মধ্যে, সাধুসঙ্গ তার একটি স্তর কিন্তু হেতু নয়; ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি, যা'কে বলা হয় সাধ্য-ভক্তি, এ দুটি ভগবানের দান, অর্জন করতে হ'লে জীবভক্তকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে,—সাধন-ভক্তির সর্বস্তর উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা। রূপ গোস্বামী গুরুত্ব দিয়েছেন সাধন-ভক্তিকে, তাঁর মতে যেখানে লোকোত্তর-চমৎকার ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণের প্রসাদ ব'লে মানতে হ'বে, বাকি সমুদয় ভক্তের সাধনালব্ধ। জীব গোস্বামী বলেছেন[২০১] সাধন-ভক্তি অনুষ্ঠান ও উপদেশের অপেক্ষা রাখে কিন্তু প্রেমভক্তি ভগবৎপ্রসাদ নির্ভর। সাধন-ভক্তি সংসারের সকল অনর্থ বা অশুভতত্ত্ব সাক্ষাৎ ভাবে উপশমন করে, অর্থাৎ অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে করে। কিন্তু এর ফলস্বরূপ যে প্রেমভক্তি শুধু তদ্দ্বারাই মায়ামোহ নিবারণ হ'তে পারে।

প্রেমভক্তি প্রয়োজন-তত্ত্ব, পরমপুরুষার্থ। দুঃখনাশ প্রয়োজন নয়, যদিও মানুষ মাত্রেই দুঃখের নিরসন চায় এবং অনেক ধর্মে এইটাই চরম প্রাপ্তব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মতে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি মাত্রই ভক্তের দুঃখবোধ থাকে না, দুঃখ থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য হয়।

অতএব মনে করা যেতে পারে যে ভগবৎকৃপা যোগ্যতা অনুসারেই বিতরিত হয়, এ কৃপা অহেতুক নয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায় কৃষ্ণের সঙ্গে যেকোনও রূপ সম্বন্ধ থাকলেই মানুষ শুভফল প্রাপ্ত হয়, ভক্ত না হ'লেও। কৃষ্ণের হাতে শত্রু রূপে নিহত হ'লে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, কৃষ্ণের নিন্দা বা বিরোধিতা করলেও তাঁর কৃপা লাভ হয়; শুধু এই জাতীয় কৃপাকে অহৈতুকী কৃপা বলা যেতে পারে।

আরও একটি দ্বন্দ্ব আছে ভাগ্যপুরুষকারের দ্বন্দ্ব, এটি দৈব-পুরুষকারের দ্বন্দ্বের চেয়ে জটিল। ভাগ্যগণনায় যে অর্থে ভাগ্যকে নেওয়া হয়, যার ওপর গ্রহের প্রভাব আছে, জন্মলগ্নে অষ্টোত্তরী বিংশোত্তরী দশায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় অথচ বিশেষ রত্ন ধারণ করলে সে প্রভাব কেটে যায়, এখানে তার প্রসঙ্গ হচ্ছে না,

স্বকীয় কর্মের ফলে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ এই অর্থেই নেওয়া হচ্ছে। এখানে গ্রহের দুর্গ্রহের আকস্মিক যোগাযোগের পরিবর্তে আছে এক অনড় নিয়ম, যাকে চেষ্টার দ্বারা পুরুষকারের সাহায্যে অপসারিত বা পরিবর্তিত করা যায় কিনা সেইটাই প্রশ্ন। ভাগ্য অদৃষ্ট, তাকে দেখা বা জানা যায় না কিন্তু তার ফল অবশ্যম্ভাবী, যাকে বর্তমান বিজ্ঞানী heredity বলেন, যেটা পৈতৃক-মাতৃক-সূত্রে প্রাপ্ত, তাকেই বোঝাতে ভারতীয়রা ভাগ্য বা প্রাক্তন বা প্রারব্ধ কর্ম, বা সংস্কার বলেছেন। ভারতীয় মতে জাতকের দৈহিক মানসিক সম্পদ এবং এ সবের সীমা সবই তার পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল, বর্তমানে বিজ্ঞানী বলেন এগুলি বংশানুসরণে পাওয়া। এবং heredity যেমন মানুষের বৃত্তির উৎকর্ষের একটা সীমারেখা টেনে দেয়, তার বাইরে যাওয়ার বাধা নাই কিন্তু সামর্থ্য নাই, আমাদের ভাগ্যও তাই। এবং এইখানেই নিজের চেষ্টার বা পুরুষকারের ফলোদয়। আমি ম্যাট্রিক পাস করতে পারি যদিও সেটা আমার চেষ্টাসাপেক্ষ, কিন্তু শতচেষ্টাতেও এম-এ পাশ করতে পারবো না, সে কৃতিত্ব আমার নাই। বিজ্ঞানী এবং ভাগ্যবাদী দুজনেই এ বিষয়ে একমত, কিন্তু যেখানে ভাগ্যবাদী বলবে আগে থেকেই জানা আছে তুমি এম-এ পাশ করতে পারবে না, বিজ্ঞানী বলবে তোমার পারদর্শিতার সীমা আমরা মোটামুটি জানি কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ বলতে পারি না।

প্রশ্নটা আরও জটিল হয় যখন কর্মবাদ-পুরুষকার দ্বন্দ্বের উপরে আরোপিত হয় ভগবৎকৃপা, ভারতীয় সনাতন কর্মবাদের প্রতিকূলে প্রবাহিত ভক্তি-ধারা-সিক্ত মন বলে মানুষের ভাগ্য তার চেষ্টার উপরে নির্ভরশীল নয়, ভগবৎ-অনুগ্রহের উপরে। অর্থাৎ কর্মফল খণ্ডিত হয় না জীবের অধ্যবসায়ে, অবিদ্যানাশে, সৎ কর্মের দ্বারা, স্বোপার্জিত ভক্তির প্রাধান্যে, অপসারিত হয় একমাত্র ভগবৎকৃপায়, সে কৃপা জীবের কৃতিত্বের দ্বারা অর্জিত নয়, ঈশ্বরের খুসীমত বর্ষিত।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র অন্য কথা বলে। "জীবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী অদৃষ্ট বোধশক্তিরহিত, সে কাজ করে ঈশ্বরের নির্দেশে, ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেন না বা তার অবশ্যম্ভাবিত্বে হস্তক্ষেপ করেন না, শুধু এর নির্বাহন সম্ভব করেন। অতএব ঈশ্বর কর্মফলপ্রদঃ।"[২০২] কর্মফল ঈশ্বর প্রদান করেন নিরূপন করেন না। "কর্মের অধিনিয়ম প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করলে দেখা যায় স্বাধীন চেষ্টার সঙ্গে এর অসঙ্গতি নাই।"[২০৩] "এ নিষ্পত্তি হয় না যে আমরা প্রাক্তন কর্মের সূত্র দ্বারা আক্ষিপ্ত পুতুলের মত চালিত হচ্ছি। পূর্বে বলা হয়েছে সকল ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য নিজে দায়ী, ঈশ্বর সাহায্য করেন মাত্র, জীব ফলভোগ করে নিজের কর্মের। ঈশ্বর কাকেও বাধ্য করেন না কোনও বিশেষ কাজ করতে। জন্মার্জিত সংস্কারকে আমরা

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পরাস্ত করতে পারি। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ রামকে বলেছেন বন্ধন-শৃঙ্খলকে স্বাধীন শক্তির দ্বারা ভাঙতে।"[২০৪] উপরোক্ত তিনটি উদ্ধৃতি ন্যায়, পূর্বমীমাংসা এবং অদ্বৈত-বেদান্তের কর্মবাদ সম্বন্ধে। ভক্তিশাস্ত্রের কর্মবাদ এ থেকে পৃথক নয়।

অপরদিকে ভক্তসুলভ এমন উক্তি আছে যে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা নিরর্থক, কারণ ভগবানের ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট পথে বৈয়ক্তিক জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, তার কোনও পরিবর্তন মানুষের আয়ত্তির ও আওতার বাইরে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিমত ঃ "সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেতি জানন্। .....ময়ি তদ্ভক্তে নাস্তি কালকর্মাদীনাং কেষামপ্যধিকারঃ ইতি স এব কৃপয়া সুখদুঃখে ভোজয়তি চ।"[২০৫] কালক্রমে প্রাপ্ত ঐ সুখদুঃখকে ভগবৎ-কৃপাফল-স্বরূপেই জানিবে। তাঁর ভক্ত আমাতে কাল-কর্মাদির কোনই অধিকার নাই, তিনিই কৃপা দ্বারা আমাকে সুখদুঃখ ভোগ করান। এখানে কর্মফল সম্পূর্ণ ব্যতিরিক্ত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।"[২০৬]

যদি ভেবে দেখা যায় যে এক বিরাট নিয়মে আব্রহ্মস্তম্ব চলছে তার একচুল ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না, তা হলে "যারে যৈছে নাচায়" বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, সকলেই এক নিয়মে নাচছে মনে করতে হবে।

পণ্ডিতরা পুরাতন বচন উদ্ধৃত করেছেন "এষ হ্যেব সাধুকর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত, এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষত"[২০৭] ইনি তা'কে দিয়ে সাধুকর্ম করান যাকে তিনি উত্তম লোকে নিয়ে যেতে চান; তাকে দিয়ে অসাধু কর্ম করান যাকে অধোগামী করতে চান। শরণাগতির চরম প্রয়াসে এবং আত্ম-অবলুপ্তির দীনতায় ভক্ত এখানে এমন কথা বলেছেন যা কর্মবাদের বিরুদ্ধে এবং যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব সমর্থন করে না।

## মুক্তি

মোক্ষ বা মুক্তির প্রকৃত অর্থ বা অবস্থা নিয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে, একি নির্বাণ বা জীবের নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ, না পৃথক-অস্তিত্বহীন হ'য়ে ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, না দেহবিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার বিশেষ অবস্থিতি? কিন্তু এক বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই, মুক্তি অর্থে অনাবৃত্তি, অনুৎপত্তি বা জন্মান্তর-রাহিত্য, অপবর্গ অর্থে সমাপ্তি বা সংসার চক্রের অবসান, এটা হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ ধর্মের সব সম্প্রদায় স্বীকার করেন। মুক্তিকামী চায় দুঃখের অবসান, এবং যেহেতু

সংসার-চক্র দুঃখের কারণ, অতএব এ থেকে অব্যাহতি পেলেই দুঃখের নিবৃত্তি হতে পারে। বৈষ্ণব যদি সংসারের মায়াবন্ধন থেকে, জন্মমৃত্যুচক্র থেকে অব্যাহতি চান, তা হলে তিনি মুক্তির বা অপবর্গের পরিপন্থি নয়। তিনি জানেন যে কৃষ্ণকে আশ্রয় করলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, পুনর্জন্ম হয় না।[২০৮]

অতএব মুক্তি একটা ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়, কর্মফলের ন্যায় ভক্তিরও একটা ফল আছে এবং সেটা এড়ানো বা পরিবর্তিত করা কারও সাধ্য নয়, ভক্তি অনুসারে মানুষকে মুক্তি পেতেই হবে। মুক্তির প্রাপ্তি যেমন ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, প্রত্যাখ্যানও সেইরূপ ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, কর্মফলের মত এটা ভাগ্যের অপরিবর্তনীয় অঙ্গ। মুক্তি ভক্তি-সম্পত্তির অনুচরী।[২০৯] এর ব্যঞ্জনা এই যে যেমন অনুচরী অধীশ্বরীর অনুগমন করে সেইরূপ যিনি ভক্তিলাভ করেন তিনি না চাইলেও মুক্তি স্বতঃই তাঁর লাভ হয়।

পুনর্জন্ম-রাহিত্যই মুক্তি, বৈষ্ণব মত এ থেকে কিছু পৃথক নয়। "অত্রাবৃত্তিরাহিত্যং চাঙ্গীকৃতম। অনাবৃত্তি শব্দাদিত্যনেন ন স পুনরাবর্তত ইতি শ্রুতেঃ।"[২১০]

"কেবল" শব্দের একটা অর্থ একান্ত বা একলা। সাংখ্যদর্শনে মুক্তিকে বলা হয় কৈবল্য, অর্থাৎ পুরুষ যে প্রকৃতি হতে পৃথক এই লব্ধ জ্ঞানই মুক্তির স্বরূপ। জৈনদর্শনে বলে যিনি জীব ও অজীবের পার্থক্য উপলব্ধি করেছেন, যাঁর আত্মা আস্রব-মুক্ত তিনি কেবলজ্ঞান লাভ করেছেন। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতে কেবলী অর্থে মুক্ত পুরুষকে বোঝায় যিনি পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। অতএব কৈবল্য-মুক্তি জ্ঞানার্জিত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে এর স্থান নাই। কালক্রমে মুক্তির সাধারণ অর্থে কৈবল্য শব্দ প্রচলিত হয়েছে।

মুক্তির সংজ্ঞা ভাগবতে[২১১] এইরূপ—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ", অন্যথারূপ ত্যাগ করে স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, ভক্তিমার্গের সাধকের মতে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস সুতরাং কৃষ্ণের পার্ষদরূপে অবস্থিতি জীবের স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ মুক্তি। "বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ"[২১২] মনীষিগণ বিষ্ণুর অনুচরত্বকেই মোক্ষ বলে থাকেন। এ মুক্তি কি ভক্তের কাম্য নয়?

ভক্তিযোগে "স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম" লাভ করা যায়।[২১৩] বেদান্তমতে স্বর্গলাভ মুক্তি নয় কারণ স্বর্গবাসীকেও পুনরায় জন্ম নিতে হয়, অতএব মুক্তি অর্থে রইল অপবর্গ ও কৃষ্ণের ধামে স্থিতি। অপবর্গ সংসার-চক্র হ'তে মুক্তি; কৃষ্ণের ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে নিত্য স্থিতি বৈষ্ণবের কাম্য মুক্তি। ভক্তিদ্বারা লভ্য এ দুয়ে কি পরস্পর-বিরোধ আছে? কি কারণে এ দুটি বৈষ্ণব ভক্তের পরিত্যজ্য?

বৈষ্ণব মতে মুক্ত জীবের অবস্থান ভেদে মুক্তি পাঁচ প্রকার—সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য। সাযুজ্য মুক্তির অর্থ ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়া, এটি অদ্বৈতবাদীর বা জ্ঞানমার্গের সাধকের কাম্য, ভক্তের নয়; কারণ এতে সাধকের পৃথক সত্ত্বার জ্ঞান থাকে না, ভগবৎ-সান্নিধ্যে থেকে তাঁর মাধুর্য উপলব্ধি ক'রে সেবার সুযোগ থাকে না। উপরোক্ত অপবর্গ কি এই অর্থে প্রযুক্ত হ'য়ে ভক্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে?

"তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো।"[২১৪]

হে জগদ্‌গুরু, তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে আমি মগ্ন, আমার কাছে ব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখও গোষ্পদবৎ মনে হয়। যেসব বৈরীভাবাপন্ন লোক কৃষ্ণের হাতে নিহত হ'ন কৃষ্ণ তাদের সিদ্ধলোকে পাঠিয়ে ব্রহ্ম-সাযুজ্য-রূপ শাস্তির ব্যবস্থা করেন।[২১৫] অন্য চার রকম মুক্তিতে ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব থাকে।

সালোক্য—ভগবানের সঙ্গে একলোকে বা একধামে বাস।

সার্ষ্টি—সমান ঋষ্টি যার। ঋষ্টি অর্থে গতি কিম্বা ঐশ্বর্য। অবশ্য ভগবানের সমান ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি ভক্তের পক্ষে অসম্ভব, অতএব সামান্য ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি বুঝতে হবে।

সারূপ্য—ভক্ত কর্তৃক ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তি।

সামীপ্য—ভগবানের সমীপে বাস।

এই চতুর্বিধ মুক্তিতে ভক্ত পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে পার্ষদত্ব লাভ করেন, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে পার্শ্বর্দরূপে অবস্থান করেন। সাযুজ্য-মুক্তির আনন্দ নির্বিশেষ বা বৈচিত্র্যহীন, বাকি চারটির আনন্দ সবিশেষ বা বৈচিত্র্যময়। সামীপ্যের বেলায় ভগবানের নিকট-সান্নিধ্যে থাকবার যে স্ফুট অর্থ আছে অন্য তিনটিতে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্যে—সে অভিধার্থ নাই, ভগবানের নিকট-সান্নিধ্যে বাস পরিব্যক্ত নয়।

মুক্তি সম্বন্ধে ভক্তি-শাস্ত্রে কি উক্তি আছে দেখা যাক।

"ন কাময়ে নাথ! তদপ্যহং ক্কচি-
-ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।"[২১৬]

হে নাথ, যা'তে আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ (পান করবার) সম্ভাবনা নাই আমি তা কামনা করি না, (শুধু) প্রার্থনা করি অযুত কর্ণ, যার দ্বারা মহত্তমগণের অন্তর্হৃদয় (হ'তে উদ্বিত এবং তাঁদের) মুখনিঃসৃত (আপনার) গুণকথা শুনতে পাই। এখানে স্পষ্টতঃ মুক্তির কথা নাই কিন্তু সংশ্লেষার্থ এই যে ভগবৎ-সেবা-বর্জিত কোনও স্থিতিই ভক্তের কাম্য নয়।

"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাৎ-
-অকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো !
আবাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে !
বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥"[২১৭]

হে প্রভু ! নিরভিমান ভক্তের পরম প্রার্থনীয় তোমার চরণসেবা ব্যতীত অন্য বর আমি প্রার্থনা করি না, হে হরি ! কোন্ বিবেকী ব্যক্তি মোক্ষপ্রদাতা তোমাকে আরাধনা ক'রে এমন বর প্রার্থনা করে যাতে ভ-পবন্ধন ঘটে ? এখানে স্পষ্টতঃ মুক্তির কথা আছে এবং ভগবৎ-সেবার সঙ্গে তার কোনও বিরোধ নাই ।

"ন বয়ং সাধ্বি ! সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢুং গদাভৃতঃ ।"[২১৮]

হে সাধ্বী ! আমরা সার্বভৌমপদ, ইন্দ্রপদ, এই পাদদ্বয়ের ভোগের অধিকার, সিদ্ধি, পরমপদ, কিম্বা ভগবৎ-পদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষও কামনা করি না, কিন্তু লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমের গন্ধযুক্ত গদাধরের শ্রীসম্পন্ন পদধূলিই মস্তকে ধারণ করতে ইচ্ছা করি ।

"ভগবন্ যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ।
× × × ×
ত্বদ্‌ভক্তিপ্রবণং হ্যেতৎ পরমেশ্বর মে মনঃ
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে ।"[২১৯]

হে ভগবন ! যদি আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন তবে আমাকে এই বর দিন যে আমি যেন আপনার স্তব করতে ইচ্ছা করি । পরমেশ্বর ! আপনার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ আমার এই মন আপনার পদযুগলের স্তব করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন ।

"অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ।"[২২০]

ভগবান মুকুন্দ তোমাদের প্রতি এইরূপ যে তিনি ভজনকারীকে মুক্তিদান করেন কিন্তু কখনও ভক্তিযোগ বা প্রেমদান করেন না ।

"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ।"[২২১]

নারায়ণ পরায়ণ লোকেরা কাকেও ভয় করেন না, তাঁরা স্বর্গ মুক্তি ও নরকে তুল্যপ্রয়োজন দেখে থাকেন ।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ।"[২২২]

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য একত্ব—এই সবের (কোনও মুক্তি)

দিতে চাইলেও ভক্ত গ্রহণ করেন না যদি তাতে আমার সেবা না থাকে।

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।[২২৩]

আমার সেবায় (ভক্ত এমন) পরিপূর্ণ অর্থাৎ পরিতৃপ্ত থাকেন (যে) সেই সেবার দ্বারা প্রাপ্ত সালোক্যাদি (মুক্তি) চতুষ্টয়কে ইচ্ছা করেন না, কালের অধীন অন্য (অভিলাষের) আর কথা কি!

"দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
-শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ।"[২২৪]

হে ভগবান, দুর্বোধ্য নিজতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত মূর্তি প্রকটনকারী তোমার চরিতকথারূপ মহামৃতসাগরে অবগাহন হেতু শ্রমরহিত কোনও কোনও ভক্ত মোক্ষ অভিলাষ করেন না, তোমার পাদপদ্মের মাধুর্য আস্বাদনকারী পরমহংসগণের সঙ্গলাভে গৃহসুখ ত্যাগ করেন।

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমনুব্রজেত।"[২২৫]

সেই পরমদেব স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরকে মুক্তিকামী ব্যক্তি নিশ্চিত শরণ নেবে।

"ভক্তিস্ত্বয়ী স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
-দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবেতঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।"[২২৬]

হে ভগবান, তোমাতে (আমাদের) ভক্তি যদি স্থিরতা লাভ করে তবে তোমার দিব্যকিশোরমূর্তি দৃষ্ট হবে; স্বয়ং মুক্তি তখন কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সেবা করবেন এবং ধর্ম-অর্থ-কাম আদেশ-প্রতীক্ষা করবেন।

"মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদির্নান্যথা"[২২৭]

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত অথচ সুদৃঢ় এবং সর্বাধিক স্নেহকে ভক্তি বলা হয়, যার ফলে সার্ষ্টি আদি (মুক্তি) হয়, অন্য কিছুর দ্বারা নয়।

"মম নাম-সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন।"[২২৮]

(যে জন) সর্বদাই আমার নাম গ্রহণ করেন এবং আমার সেবাতেই প্রীতিমান আমি তাঁকে ভক্তি দান করি কদাচ মুক্তি দান করি না।

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দন
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে।"[২২৯]

হে জনার্দন, আপনাতে নিশ্চলা ভক্তি তা-ই মুক্তি, কারণ বিষ্ণুর ভক্তসকল নিশ্চয়ই মুক্ত। এখানে ভক্তি ও মুক্তির মধ্যে কোন ভেদ

বা দ্বন্দ্ব নাই।

"অহো নাথ শুশ্রূষতাং তে মুক্তিস্তেষাং নহি বহুমতা"[২৩০]
হে নাথ, যারা আপনার সেবা করে তারা মুক্তিকেও বহুমূল্য ব'লে বিচার করে না।

"নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যত
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে।"[২৩১]
এই ব্রহ্মর্ষি ভগবান অব্যয় পুরুষে পরাভক্তি লাভ করেছেন, ইনি কোন ফলসিদ্ধি এমন কি মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করেন না।

"অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী"[২৩২]
অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি সিদ্ধি বা মুক্তি হওে শ্রেষ্ঠ।

মনে হয় ভক্তি বনাম মুক্তি সম্বন্ধে যে বিবিধ প্রণিধান গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের ভিত্তি, উপরের উক্তিগুলি তার প্রতিনিধি-স্বরূপ, অতএব তাদের অনুধাবন করলে এ সম্বন্ধে একটা একমেটে ধারণা করা সম্ভব। বিভিন্ন মনোভাব এই—

(১) ঈশ্বরভক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল মুক্তি, অতএব যদি যথার্থ ভক্তির উদয় হয় তা হলে মুক্তি অনিবার্য, এর বিকল্প নাই। অতএব মুক্তির জন্য পৃথক প্রযত্ন বা স্পৃহা নাই।

(২) ভক্তের কামনা শুধু ভগবৎ-সেবার বা স্তবের, এবং এ বিষয়ে তিনি এমনই অধিকৃত-চিত্ত যে মুক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোনও আগ্রহ উৎসাহ নাই, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুক্তি হেয় বা বর্জনীয় নয়, মুক্তি ও ভক্তিসেবায় কোনও বিরোধভাব নাই কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে ভক্ত ততটাই অমনোযোগী যতটা স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে। অর্থাৎ সেবাকাঙ্ক্ষারূপ ভক্তিই ভক্তের মন অধিকার করে আছে, সেখানে অন্য চিন্তার স্থান নাই।

(৩) মুক্তি সম্বন্ধে ভক্ত অবহিত কিন্তু যে মুক্তিতে ভগবৎ-সেবা নাই সে মুক্তিতে ভক্তের স্পৃহা নাই। সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য এই চারপ্রকার মুক্তিতে সেবার সুযোগ আছে কিনা তা স্পষ্ট নয় অতএব এ সবে ভক্তের অনীহা।

(৪) ভক্তের ধারণা যে ভগবান মুক্তি সহজেই দেন কিন্তু ভক্তিদানে কার্পণ্য করেন, কারণ দেখা যায় প্রকৃত ভক্ত বিরল। অতএব এ দুইয়ে বিরোধ না থাকলেও মূল্যবোধে তারতম্য আছে। ভক্তির মহার্ঘতার এবং দুর্লভতার তুলনায় মুক্তি তুচ্ছ বস্তু সুতরাং ভক্তির তুলনায় ঈপ্সিত বা অর্জনীয় নয়।

এই বিভাগগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত ভক্তের চরম কাম্য ভগবৎ-সেবা, তার তুলনায় অন্য যা কিছু সব তুচ্ছ; ভক্তি ও মুক্তির মধ্যে আদর্শগত কোনও বিরোধ নাই, একটির বর্তমানতা অন্যটির বাধাস্বরূপ নয়; মুক্তি অস্পৃহনীয় অবাঞ্ছিত বস্তু নয়, কারও কাছে তুচ্ছ হ'তে পারে অবশ্য। যদি না স্পষ্টতঃ বলা হয়ে থাকে যে

ভক্ত অপুনর্ভব বা পুনর্জন্মরোধ চান না, তা হলে বুঝে নিতে হবে তিনি মুক্তির পরিপন্থি নয়, যে ভক্তি সাধনার উপায় শুধু নয় চরম সাধ্যবস্তু অর্থাৎ পুরুষার্থ, সেই ভক্তি যদি মোক্ষলাভের পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি সেবাত্মক কার্যে তিনি লিপ্ত থাকতে পারেন, তা হলে মোক্ষ তাঁর অকাম্য নয়।

কিন্তু সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি ভক্ত নিতে চান না কেন ? এই মুক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র বৈকুণ্ঠ, যেখানে সেবার সুযোগ থাকলেও ভগবানের ঐশ্বর্যই তাঁর প্রধান প্রকাশ, মাধুর্য ভাব সামান্য। যেখানে ঐশ্বর্য সেখানে রক্ষা ত্রান প্রভৃতির জন্য কৃতজ্ঞতা, সেখানে আশ্রিত-মনোবৃত্তির প্রভাবে সেবার প্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত না হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময় সেবাবাসনা থেকে মুক্তিবাসনা প্রাধান্য লাভ করে ব'লে শুদ্ধভক্তির উপাসক একে উপেক্ষা করেন।

পদ্মপুরাণের কতকগুলি শ্লোক আহৃত হয়েছে ভগবৎসন্দর্ভে, [২৩৩] তার কিছু অংশ এই–

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে
তস্মিন্ বন্ধবিনির্মুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে স্বসুখংপদম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ।"[২৩৪]

সেই বিষ্ণুর পরমধাম "মোক্ষ" নামে অভিহিত; সেখানে মায়াবন্ধন-মুক্ত হ'য়ে (জ্ঞানীবিপ্রগণ) আত্মসুখময় স্থান পেয়ে থাকেন, যা প্রাপ্ত হ'লে আর পুনরাবর্তন হয় না, সেই কারণে এর "মোক্ষ" নাম। এখানে আত্মসুখের কথা আছে, ভগবৎ-সেবার ইঙ্গিত নাই। বোধ হয় সে কারণে বৈকুণ্ঠে সালোক্যাদি মুক্তি ভক্তের কাম্য নয়।

যে মুক্তি গোলোকে হয় সেখানে ভগবান্‌কে প্রেমসেবা করবার অধিকার অব্যাহত, এবং এইটাই রাগানুগামার্গের সাধকের কাম্য। এখানে মুক্তি সেবাসুযোগের আনুষঙ্গিক ভাবেই আসে এবং এ মুক্তি ভক্তের অকাম্য নয়। যদি এ মুক্তিকেও ভক্তপরিহার করেন তা হ'লে নিজগুণেই করেন, নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য, কোনও সঙ্গত কারণে নয়।

এবারে গোড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের বিশিষ্ট প্রবক্তা রূপ গোস্বামীর মন্তব্য আলোচনা করা যেতে পারে।

"অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চাবিধাপি চেৎ
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে।
সুখৈশ্বর্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি
সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা।
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্যজুষ একান্তিনো হরৌ
নৈবাঙ্গীকুর্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি।
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনোহর্তুং ন শক্নুয়াৎ।"[২৩৫]

যদিও এই পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যজ্য ব'লে এখানে উক্ত হ'ল তবুও সালোক্যাদি (চতুর্বিধ মুক্তি) ভক্তের পক্ষে অতিশয় বিরুদ্ধ নয় (সাযুজ্যমুক্তি সকল স্থলেই পরিত্যজ্য এই অর্থ) সালোক্যাদি মুক্তি দুই প্রকার, সুখৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং প্রেমসেবাসম্পন্ন, তার মধ্যে প্রথমটি সেবাপরায়ণগণের বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু একমাত্র প্রেমসেবার মাধুর্যপিপাসু এবং হরিতে একান্ত অনুরক্ত (ভক্তগণ) কখনও পঞ্চবিধা মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না। এই একান্তীদের মধ্যে গোবিন্দের দ্বারা হৃতচিত্ত (ভক্তই) শ্রেষ্ঠ, কারণ নারায়ণের অনুগ্রহও তাঁদের মন হরণ করতে পারে নি।

"উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগ্যসৌ যেন নেষ্যতে
হরিণা দীয়মনোঽপি সার্ষ্ট্যাদিস্তুষ্যতা বরঃ।"[২৩৬]

তুষ্ট হয়ে হরি সার্ষ্টি প্রভৃতি বর দিতে চাইলেও যিনি গ্রহণ করেন না তাঁকে উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগী বলা হয়।

"শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাম্
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।"[২৩৭]

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবায় নিমগ্নচিত্ত এই ভক্তগণের কখনও মোক্ষবাঞ্ছা হয় না।

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ?
তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমণ্বীমনিচ্ছতঃ
ভক্তির্হৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্ "[২৩৮]

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাস্বরূপ পিশাচী যতক্ষণ হৃদয়ে থাকে ততক্ষণ সেই (হৃদয়ে) ভক্তিসুখের অভ্যুদয় কি ক'রে হ'তে পারে? তার মধ্যেও বিশেষ এই যে যাঁরা মুক্তি-স্পৃহা-রহিত সেই জনগণের মনঃপ্রাণ ভক্তি হরণ করেন প্রেম দ্বারা। প্রথম শ্লোকটি পদ্ম পুরাণেও পাওয়া যায়।[২৩৯]

রূপ গোস্বামী বলেছেন ভগবানের প্রসাদও প্রকৃত ভক্তের মন হরণ করতে পারে না, এর প্রকৃত অর্থ প্রসঙ্গ আলোচনায় বুঝে নিতে হ'বে, যেখানে প্রসাদের ফল সুখৈশ্বর্য শুধু সেখানেই ভক্ত প্রসাদ-প্রত্যাখ্যায়ী। তার পরে যে বিশেষণ ব্যবহার করলেন—পিশাচী—সেটা পদ্মপুরাণের বা তাঁর নিজের উদ্ভাবনী কিনা জানা নাই, কিন্তু বিশেষণটি তীক্ষ্ম এবং তিরস্কারাত্মক। এর এই অর্থ করতে ইচ্ছা করে যে মুক্তি পিশাচী নয় মুক্তি-স্পৃহাটাই পিশাচী, অকাম্য। সংসার চালাতে রাজ্য চালাতে অর্থের প্রয়োজন, টাকা জিনিষটা দূষ্য নয় অর্থলোলুপতা সমাজে দুষণীয়, যাকে বলে টাকার খাঁই। মুক্তির বাসনাটাই কলঙ্কিত, মুক্তি শুদ্ধবস্তু—আশা করি রূপ গোস্বামীর উক্তির এইটাই ধার্য মর্ম।

সাযুজ্য মুক্তি ছাড়া সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি ভক্তের অগ্রাহ্য

নয়। কিন্তু যেহেতু সালোক্যাদি মুক্তি ঐশ্বর্যপ্রধান এবং বৈকুণ্ঠে লভ্য, সেহেতু যে ভক্ত সেবা ছাড়া আর কিছু চান না তিনি এমন মুক্তিকেও অঙ্গীকার করেন না পাছে শুদ্ধ সেবা বাসনায় বাধা পড়ে। বৈকুণ্ঠে থেকেও জয় বিজয় শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছিল, অতএব বৈকুণ্ঠবাস হ'লেও পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না। অতএব বৈকুণ্ঠবাসে পুনর্জন্ম-রাহিত্য হয় না, সেবাসুযোগ পাওয়া যায় না। প্রেমসেবাপ্রধান মুক্তিতে রূপ গোস্বামীর অনীহা নাই, গোলোকে কৃষ্ণের সেবাপরায়ণ হ'য়ে বাস করায় বোধ হয় তাঁর আপত্তি নাই। ভাগবত রচনার সময়ে গোলোকের কল্পনা ছিল না ব'লে বোধ হয় গোলোকে মুক্তির কথা বলা হয় নি, এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা।

সর্বশেষ উদ্ধৃতির অন্য একটি ব্যখ্যা সম্ভব কিনা পন্ডিতরা বিবেচনা করবেন। ভুক্তি এবং মুক্তি পৃথক শব্দ হ'লে দুটি পিশাচীর দরকার হয়, এক পিশাচী ভুক্তি বা ভোগরূপা অন্য পিশাচী মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ মুক্তি পৃথক শব্দ হ'লে দ্বিতীয় শ্লোকে পুনরায় মুক্তির প্রসঙ্গ আনার কোনও সার্থকতা থাকে না। অতএব মনে কারা যেতে পারে ভুক্তিমুক্তি এমন একটি যুগ্ম বা সম্বন্ধিত শব্দ (মধ্যপদলোপী সমাস) যার অর্থ "ভোগ-সংযুক্ত-মুক্তি" বা "ভোগ-প্রধান মুক্তি"। এ মুক্তি বৈকুণ্ঠে মুক্তি, সুখ-ঐশ্বর্য প্রধান, সে কারণে সেবা-ইচ্ছু-জনের পরিত্যজ্য, তাঁর কাছে পিশাচীর তুল্য, পিশাচীর মত সাধক-জীবন নষ্ট করতে পারে। সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি যা বৈকুণ্ঠধামে লভ্য সেগুলি যে ভোগদায়িনী এর সমর্থন পাই গোপালতাপনী উপনিষদে[৪০] এবং ভাগবতে।[৪১]

পদ্ম পুরাণে[৪২] প্রয়াগ সম্বন্ধে আছে—

"স্থানমেতদপি শ্রেষ্টং পৃথিব্যাং পুণ্যবর্ধনম্
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঞ্চাস্তু প্রসাদত্তবতঃ সদা।"

ভগবৎপ্রসাদে এই স্থান পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ট পুণ্যবর্ধন ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ হোক্। দেবগণের এই প্রার্থনায় বিষ্ণু বললেন এখানে এসে যাঁরা পিতৃশ্রাদ্ধ করবেন তাঁদের পিতৃগণ সালোক্য প্রাপ্ত হবেন, মাঘমাসে যাঁরা এখানে তীর্থস্নান করেন তাঁদের আমি সালোকত্ব, সরূপত্ব, সমীপত্ব, মুক্তিত্রয় ক্রমান্বয়ে প্রদান করি। অতএব ভুক্তিমুক্তি সালোক্যাদি মুক্তির সমার্থক। বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণুলোক "ষড়ৈশ্বর্য ভান্ডার"।[৪৩]

কি পরিপ্রেক্ষিতে রূপ গোস্বামীর শ্লোক দুটি আছে সেটা বিচার্য। ঠিক পূর্বের দুটি শ্লোকে গীতার (৭/১৬) চতুর্বিধ ভজনকারীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে আর্ত, জিজ্ঞাষু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী যখন ভগবানের বা তাঁর কোনও ভক্তের কৃপা প্রাপ্ত হ'ন তখন আর্তভাব জিজ্ঞাসা প্রভৃতি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়ে এঁরা শুদ্ধভক্তির অধিকারী হন। ব্যঞ্জনা এই

যে গীতায় ভক্তরূপে অভিহিত হ'লেও এঁরা শুদ্ধভক্তির অধিকারী নয় অর্থাৎ এঁরা অভিলাষশূন্য নয়। কিন্তু এঁদের কি অভিলাস হতে পারে ? শ্লোকগুলির সংযোগ উপযোগিতা ও পারম্পর্য বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হয় যে এই অভিলাষ ভুক্তিমুক্তির স্পৃহা, এটি যতক্ষণ আর্ত জিজ্ঞাসু প্রভৃতিতে বর্তমান থাকে ততক্ষণ শুদ্ধভক্তির উদয় হতে পারে না। এখন দেখতে হয় গীতায় এঁদের কি অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদের কথা বলা হয় নি জ্ঞানীর বিষয়ে বলা হয়েছে তিনি ভগবানকে আশ্রয় ক'রে থাকেন (৭/১৮) এবং তিনি ভগবানের আত্মস্বরূপ; তা হলে মেনে নিতে হয় যে অন্ততঃ যিনি জ্ঞানী তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে বৈকুণ্ঠে নিত্য-ভগবৎ-সংসর্গ চান, আর কিছু চান না; অতএব ভুক্তিমুক্তি এবং ভগবৎ-সংসর্গে বৈকুণ্ঠ-বাস সমার্থক, এই মুক্তিতে ভগবৎ-সেবার চেয়ে ঐশ্বর্যময় ভগবানের নিকটে থেকে ঐশ্বর্যের অংশীদার হ'বার সম্ভাবনা বেশী, অতএব এটি ভোগ-সংযুক্ত মুক্তি। ভুক্তিমুক্তিকে ভোগ এবং মুক্তি দুটি পৃথক শব্দের সংবলিত অর্থে নিলে শ্লোকের অর্থগরিমার হ্রাস হয়; কারণ ভোগ যে শুদ্ধভক্তিসুখের অন্তরায় এই সহজ কথাটা জোর গলায় বলবার আবশ্যক নাই প্রকৃত ভক্ত কখনই সংসার-ভোগ বা স্বর্গভোগ চান না। তিনি বৈকুণ্ঠে যে মুক্তি চান শুদ্ধভক্তের কাছে সেটিও পরিত্যজ্য, কারণ সেখানে সেবার অধিকার অক্ষুন্ন হ'বার সম্ভাবনা আছে—এই কথাটাই এখানে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে।

যে ভক্তের ভুক্তি-সম্পৃক্ত-মুক্তির স্পৃহা নাই তিনি ভক্তিসুখ লাভ করেন কিন্তু যিনি কোনও রূপ মুক্তি চান না তিনি বিশেষ ক'রে প্রেমভক্তির উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু মুক্তিস্পৃহা না থাকলেও ভগবানের প্রতি ভক্তি থাকলেই তিনি মুক্তদান করেন।[২৪৪] এই মুক্তি পার্ষদ রূপে স্থিতি। তা'হলে কি ক'রে বলা যায় মুক্তি ভক্তের কাম্য নয়। মুক্তি শুদ্ধভক্তের কাম্য নয় শুধু সেই অবস্থায় যেখানে ভগবৎ-সেবার সুযোগ নাই।

এই আকারেই ভুক্তিমুক্তি পুনর্বার দেখা দিয়েছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১/৩/২৩ শ্লোকে এবং চৈতন্যচরিতামৃতের ১/৮/১৮; ২/১৯/১৪৯, ১৫৮, ১৭৫; ২/২২/৩৫ শ্লোকে। যেখানে "ভুক্তি এবং মুক্তি" এই অর্থে প্রয়োগ করতে হবে সেখানে স্পষ্টতঃই তা করা হয়েছে—ভুক্তিং মুক্তিং।[২৪৫]

নাম রূপ গুণ লীলা প্রভৃতির শ্রবণ কীর্তন করলে সর্বপাপ নাশ এবং মোক্ষপ্রাপ্তি হ'তে পারে কিন্তু প্রকৃত ভক্ত চান সেবা সুতরাং প্রত্যক্ষানুভূতি বা দর্শন। এই ভাবটি চরমচর্চিত শিলীভূত হয়েছে বৈষ্ণবধর্মের এই তত্ত্বে যে শুধু ভগবৎ-অনুভূতি যথেষ্ট নয়, ভগবানের দর্শন আবশ্যক, কারণ সেবাই যাঁদের পরম কামনা তাঁদের পক্ষে

ভগবৎ-চিন্তা চরম-কাম্য নয় ভগবৎ-সান্নিধ্য আবশ্যক। বৈষ্ণবধর্মে ভগবানের আর্বিভাবের ওপর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাই বিষ্ণুর এতগুলি অবতার।

"সত্ত্বাং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ।[২৪৬]

হে ধাতা! আপনার শুদ্ধসত্ত্ব (মূর্তরূপে) যদি জগতে প্রকাশিত না হয় তা হলে অজ্ঞান-নিবৃত্তি-কারী বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় না (অর্থাৎ আপনাকে প্রত্যক্ষ না করলে অজ্ঞান দূর হয় না)। আপনার গুণপ্রকাশক (বস্তুর) জ্ঞানে আপনার যেটুকু প্রকাশ হয় সে টুকু অনুমান মাত্র।

জীব গোস্বামী বলেছেন "তস্মাৎ স্বচ্ছচিত্তানামেব সাক্ষাৎকারঃ, স এব চ মুক্তিসংজ্ঞ ইতি স্থিতম্"[২৪৭] সুতরাং স্বচ্ছচিত্তগণের যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটে তাহারই নাম মুক্তি, ইহা স্থির হ'ল। "অথৈতস্যাং ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণায়াং মুক্তৌ জীবদস্থামাহ"[২৪৮] অনন্তর এই ভগবৎ-সাক্ষাৎ-লক্ষণা মুক্ত জীবদবস্থা সম্বন্ধে . . . . । ভগবৎ-সাক্ষাৎকার যদি মুক্তি হয় তা'হলে মুক্তির চেয়ে ভগবৎ-প্রীতি শ্রেষ্ঠ হয় কেন? কৈবল্য সমন্ধে জীব গোস্বামী বলেছেন "কেবলস্য নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যং "[২৪৯] কেবল অর্থে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, শুদ্ধ জীবের সহিত তা'র অভেদজ্ঞানকে কৈবল্য বলে। এই অর্থেই জীব গোস্বামী মুক্তিকে নিয়েছেন এবং ভগবৎপ্রীতি-অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলেছেন "অতএব কৈবল্যাৎ মোক্ষাদপ্যেকঃ শ্রেষ্ঠো যো ভগবৎপ্রীতি লক্ষণোঽর্থঃ"[২৫০] ভগবৎপ্রীতি কৈবল্য বা মোক্ষ হ'তেও শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মুক্তি ও মোক্ষকে একাধিক অর্থে নিয়েছেন, কখনও বা অপুনর্ভবের প্রসারিত প্রসিদ্ধ অর্থে, কখনও বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সঙ্কীর্ণ অর্থে, এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধিক্কার দিয়েছেন মোক্ষ-কামীকে।

"ঐশ্বর্য-জ্ঞানে বিধি-মার্গে ভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥"[২৫১]

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা বিনে
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে।"[২৫২]

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।"[২৫৩]
"ভক্তি বিনু মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।"[২৫৪]

"পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ।"[২৫৫]
"মুক্তি, কর্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ"[২৫৬]
"স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে ।"[২৫৭]

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মোক্ষকামীকে অসম্মতদৃষ্টিতে দেখেছেন, বলেছেন[২৫৮] মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষে আসক্তি ক্রমশঃ ঈশ্বরের সহিত অভেদকল্পনামূলক অহংগ্রহ উপাসনায় পর্যবসিত হয় । এখানে স্পষ্টতঃই মোক্ষ বাক্যে অদ্বৈতবেদান্তের সাযুজ্যমুক্তি আভাসিত হয়েছে ।

মোক্ষ বা মুক্তির অর্থ সংসারমুক্তি নিলে ভগবৎ-সেবার সঙ্গে এর সংযুক্তি তিন প্রকারের হতে পারে—জীব যুগপৎ সংসারমুক্ত এবং ভগবৎসেবক, জীব সংসারমুক্ত অথচ ভগবৎসেবক নয়, জীব সংসারমুক্ত না হয়েও ভগবৎসেবক । প্রথমটিতে কোনও ভক্তের আপত্তি হওয়া উচিৎ নয়, বিশেষতঃ যদি তাঁর জীবনের শুদ্ধ উদ্দেশ্য হয় সেবাধিকার প্রাপ্তি এবং তিনি আনুষঙ্গিক ভাবে সংসার-মুক্তিও লাভ করেন । দ্বিতীয় সম্ভাবনা বৈষ্ণব ভক্তের পরিত্যজ্য, এমন ভক্তিহীন মুক্তি অভেদপন্থী বেদান্তীরই হ'তে পারে এবং এই আতঙ্কে বৈষ্ণব এমন কাতর যে "মুক্তি" বা "মোক্ষ"কে অদ্বৈতবাদীর সাযুজ্য মুক্তি অর্থেই এঁরা বুঝে থাকেন এবং সেই হেতু সাধারণ ভাবে বলেন যে মুক্তিবাঞ্ছা গর্হিত । তৃতীয় পর্যায়ে পড়েন এমন ভক্ত যিনি সম্পূর্ণ ভগবন্নিষ্ঠ ও সেবার্পিত প্রাণ অথচ এখনও নশ্বর জীবনে আবদ্ধ । এর মধ্যেই কিছু আছেন যাঁরা সংসারচক্র থেকে অব্যাহতি চান না, আমরা পরে দেখব ।

নামকীর্তন বৈষ্ণব-সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ । নামকীর্তনের বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে "পাপ-সংসার-নাশ" একটি—

"নামসঙ্কীর্তন হইতে সর্বানর্থনাশ
সর্বশুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥
সঙ্কীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন
চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ।"[২৫৯]

অতএব নামকীর্তনের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল সংসার নাশ বা মুক্তি এবং এ মুক্তি ভক্তের অকাম্য নয় ।

যাঁরা বৈধী ভক্তির অনুসরণ করেন যাঁরা শান্তরসের ভক্ত, যাঁদের মনে ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রধান তাঁরা সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের পার্ষদ রূপে বৈকুণ্ঠবাস করেন । এঁরাও পরম বৈষ্ণব, সর্বসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার্হ কিন্তু এঁদের মমত্ববুদ্ধি থাকে না, সেবা-বাসনা সম্যক বিকশিত হয় না । গৌড়ীয় সম্প্রদায় বলেন না যে সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তির পারমার্থিক মূল্য নাই বা এ রকম মুক্তি অযথেষ্ট

আপেক্ষিক বা গৌণ। তাঁরা বলেন সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-মুক্তি আদরণীয় নয় কারণ ভগবৎ-সান্নিধ্যে থাকার ইঙ্গিত নাই; সামীপ্যের বেলায় সে অবকাশ আছে কিন্তু বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যজ্ঞান আছে, কৃষ্ণের মাধুর্য-লীলা নাই, সেব্যকে ঈশ্বর মনে করা হয়। প্রেমসেবাকামী ভক্তের মনে মুক্তিকামনার চেয়ে সেবাকামনা প্রবল, তাঁর শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির বাসনা, নিজের কোনও কামনা প্রার্থনা নাই, তাই এমন ভক্ত এই চতুর্বিধ মুক্তি চান না।

এমন ভক্তের কাছে ভগবৎ-প্রেম-সেবাই পুরুষার্থ, বলা যেতে পারে পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ। বিশেষত্ব এই যে ধর্ম-অর্থ-কাম যেমন মোক্ষের অন্তরায়, এই পরমপুরুষার্থের সঙ্গে মোক্ষের বা মুক্তির কোনও বিরোধ নাই। এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-মর্মী প্রেমে মগ্ন হয়ে ভক্ত চান—এবং চরম দশায় লাভ করেন—অপ্রকটলীলায় চিরকাল সেবাধিকারী হ'য়ে থাকা। মুক্তির সংজ্ঞার্থ যদি পুনর্জন্ম-রাহিত্য হয় তা হলে এই পরমস্থিতিও মুক্তি বা মোক্ষ, এবং এ মুক্তি রাগানুগামার্গের ভক্তের অপ্রীতিকর বা পরিহার্য নয়। মুক্তি এখানে ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বা ফল না হ'তে পারে কিন্তু গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল নিশ্চয়ই।

"কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥"[২৬০]

অতএব কৃষ্ণভক্ত মুক্তজীবের মধ্যেই পরিগণিত, তার বাইরে নয়।

অদ্বৈতবাদীর সাযুজ্যমুক্তি ভক্তের কাম্য নয় কারণ এই ব্রহ্মবিলয়ে ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব লোপ হয়, ভক্তির বা সেবার অবকাশ থাকে না। বৈষ্ণব মতে জীব ব্রহ্ম নয় ভগবানের দাস। সেজন্য মনে হয় যখনই মুক্তি বা মোক্ষের প্রতি তিরস্কারী ভাষা প্রযুক্ত হয়েছে তখনই মুক্তি বা মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য মনে করা হয়েছে। জীব গোস্বামী বলেছেন "অত্র ভগবদ্ধর্মে মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবম"[২৬১] এই ভগবৎধর্মে মোক্ষের অভিলাসমাত্রই কপটতা। মোক্ষকামনা যখন ভক্তিধর্মমাত্রেই প্রবল পরিপন্থিভাবে গণ্য, তখন নিশ্চয়ই ভক্তিধর্মের একটি মূল তত্ত্বের খন্ডনকারী রূপে বোধব্য, অতএব অধিকসম্ভব এই যে মোক্ষ অর্থে ব্রহ্মসাযুজ্য মনে করা হয়েছে। এই বিরোধাভাসের কারণ সম্বন্ধে কোনও স্পষ্টোক্তি নাই কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে মনে হয় এর সূত্রপাত ঘটেছে বাসুদের সার্বভৌমের ব্যাখ্যা থেকে; তিনি প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, বোধ হয় অভ্যাসবশে মোক্ষ বা মুক্তিকে ব্রহ্মবিলয় মনে করেছেন।

"ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পঢ়িলা
শ্লোক শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা ॥
প্রভু কহে—"মুক্তিপদে" ইহা পাঠ হয়

"ভক্তিপদে" কেনে পঢ়, কি তোমার আশয় ?
ভট্টাচার্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিফল
ভগবদ্বিমুখের হয় দন্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তার সনে ॥
সেই দুইয়ের দন্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি
তার মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চপরকার
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
"সাযুজ্য" শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥

× × × ×

প্রভুকহে × × কেনে পাঠ ফিরি ?
সার্বভৌম কহে—ও শব্দ কহিতে না পারি ॥

× × × ×

যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের পঞ্চমুখ্য বৃত্তি
রূঢ়ি বৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্য প্রতীতি ॥
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।"[২৬২]

রূঢ়িবৃত্তির অছিলায় সার্বভৌম মুক্তি অর্থে ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তি মেনে নিয়ে "মুক্তি" কথাটাকেই ভ্রান্তকারণে ধিক্কার দিয়েছেন এবং এই বিকৃত অর্থই বৈষ্ণব বিদ্বৎ-সমাজে থেকে গেছে।

মুক্তির প্রতি প্রকৃত ভক্তের অসহন বিরাগের আর একটি কারণ এই হতে পারেঃ যেখানে হেলায় অশ্রদ্ধায় উপহাসে এমন কি গালিসংযোগেও নাম নিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, এমন অকিঞ্চিৎকর মুক্তি উচিৎ কারণেই ভক্তের পক্ষে অ-গ্রহীতব্য, মুক্তি নামেই তাঁরা কন্টকিত হন।

তখনই বলা যেতে পারে ভক্তের কোনও প্রকারের মুক্তি-কামনা নাই যখন কেবলাভক্তির প্রান্তিক ভক্ত সংসারাবর্তন-রোধ অর্থাৎ জন্ম-পরাবৃত্তি-রোধ চান না, আবশ্যক হ'লে সেবার জন্য পুনঃপুনঃ ব্রহ্মাণ্ডে জন্ম নিতে রাজি, শুধু জন্মজন্মান্তরে ভক্তি চান। এমন কামনা বিরল নয়।

"যাবৎ তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ।"[২৬৩]

তোমার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে কর্মবশতঃ যতদিন এ (সংসারে) ভ্রমণ করব ততদিন যেন জন্মে জন্মে তোমার সঙ্গী (ভক্তদের) সঙ্গ হয়। ভগবৎসঙ্গীদের সঙ্গলাভের সঙ্গে স্বর্গ ও মুক্তিরও তুলনা করি না, মর্ত্যলোকে (অন্য প্রার্থনীয়) বিষয়ের কথা কি ?

"জন্মান্তরে হি সা ভক্তির্মামকী যৎ করোতি হি"[২৬৪] জন্মান্তরেও যেন আমার ভক্তি অটল থাকে।

"অর্থিনাং কল্পবৃক্ষোঽসি দাতা সর্বস্য সর্বদা
যত্র যত্র ভবেজ্জন্ম তত্র তত্র ভবান্ হৃদি
বর্ততাং মম দেবেশ প্রার্থনৈষা মমাপরা ।"[২৬৫]

আপনি যাচকগণের কল্পবৃক্ষ, সদা সকলের দাতা। দেবেশ্বর ! যেখানে যেখানে আমার জন্ম হবে সেই সেই স্থানেই আপনি আমার হৃদয়ে বিরাজমান থাকবেন, এই আমার অপর প্রার্থনা।

"স্বকর্মফলানি দৃষ্টাঃ যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্
তস্যাং তস্যাং হৃষিকেশ ত্বয়ী ভক্তির্দৃঢ়াস্তুমে ।"[২৬৬]

নিজের কর্মফলে যেসকল যোনিতে আমার ভ্রমণ হোক্ না কেন, হে হৃষিকেশ ! সর্বত্রই যেন তোমার প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ় থাকে।

"কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েসু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত ।"[২৬৭]

যদি আমাদের চিত্ত তোমার চরণাবিন্দে ভ্রমরসদৃশ হয়ে রমণ করে, তা হলে আমাদের নরকপ্রাপ্তি হলেও ক্ষতি নাই।

"যাবচ্ছশাঙ্কশকলামলবদ্ধমৌলি-
র্ন প্রীয়তে পশুপতির্ভগবান্মমেশঃ ।
তাবজ্জারামরণজন্ম-শতাভিঘাতৈ
র্দুঃখানি দেহ বিহিতানি সমুদ্বহামি ।"[২৬৮]

যে ভগবান পশুপতির মস্তকে নির্মল চন্দ্রকলা দীপ্তি পাচ্ছে, সেই ঈশ্বর যতদিন না আমার প্রতি প্রীত হন, ততদিন জরামরণ জন্মজনিত দেহ-পরিস্থিত দুঃখাভিঘাত আমি বহন করব।

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ ।"[২৬৯]

আমাতে অর্পিতচিত্ত (ভক্ত) কি পরমপদ, কি ইন্দ্রত্ব, কি সার্বভৌমত্ব (=সমস্ত জগতের আধিপত্য), কি রসাতলের (=পাতালের) আধিপত্য, কি যোগসিদ্ধি, কি অপুনর্ভব (=পুনর্জন্মরাহিত্য)—আমাভিন্ন এ-সমস্তের কোনটির ইচ্ছা করেন না।

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ।"[২৭০]

আমার সাধু ধীর ও একান্তী ভক্তগণ আমাকর্তৃক প্রদত্ত কৈবল্য বা পুনর্জন্ম-রাহিত্য কামনা করেন না ।

"নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্ ।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ।"[২৭১]

ধর্মে ধনে অথবা কামোপভোগে আমার আস্থা নাই, হে ভগবান, পূর্বকর্ম-অনুসারে যা হবার তাই হোক । জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণকমলযুগলে নিশ্চলা ভক্তি থাকে এ-ই আমার একান্ত প্রার্থনা ।

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্
রম্যারামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ।"[২৭২]

দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য তোমার চরণ-বন্দনা করি না, হে হরি ! কুম্ভীপাক নরক হ'তে অব্যাহতির জন্য নয়, কোমল তনুলতাসম্পন্ন রমণীর সহিত রমণের জন্যও নয়, জন্মে জন্মে যেন আমার হৃদয়-ভবনে তোমার বিষয়ে এইরূপ ভাব থাকে ।

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ।"[২৭৩]

হে নাথ অচ্যুত, সহস্র জন্মের যে যে জন্মেই আমি পরিভ্রমণ করি সে সে জন্মে সর্বদা তোমার প্রতি যেন অচলা ভক্তি থাকে । অবিবেকী ব্যক্তির (ভোগ্য-) বিষয়ে যেমন অবিচ্ছিন্ন প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হ'তে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হোক ।

"মহতাঃ মধুদ্বিট্-
- সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ।"[২৭৪]

মধুরিপুর সেবাতে অনুরক্তচিত্ত মহাপুরুষদের নিকটে আজন্মও অকিঞ্চিৎকর ।

নিচের শ্লোকটি চৈতন্যরচিত শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ।"[২৭৫]

হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন সুন্দরী স্ত্রী বা কবিতা কিছুই কামনা করি না, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ।

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্ ।
অবধীরিত—শারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥"[২৭৬]

হে নরকারি, স্বর্গে মর্ত্যে বা নরকে যেখানেই বাস করি না কেন, (সর্বত্রই) যেন তোমার শারদীয়-অরবিন্দনিভ চরণ-যুগলের চিন্তা আমরণ করতে পারি ।

"ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ।"[২৭৭]

সংসারবন্ধননাশন সেই মুক্তিতে আমার স্পৃহা নাই, যা'তে "আপনি প্রভু আমি দাস" এই (সম্বন্ধ) লুপ্ত হ'য়ে যায় ।

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ।"[২৭৮] মুক্ত জীগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ বা দেহধারণ ক'রে ভগবানের ভজনা করেন । বাঞ্ছিত দেহ, চিন্ময় সিদ্ধদেহ, না পার্থিব প্রাকৃত দেহ, তা বিশদ নয় । যদি এর অর্থ হয় মনুষ্যজন্ম স্বীকারপূর্বক ভজনরত থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই এঁদের কাছে মুক্তি কাম্য নয় ।

"কিয়ে মানুষ পশু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ।"[২৭৯]

কর্মের ফলে মানুষ পশু পাখী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি বহুপ্রকার জীব রূপে বারবার জন্মাতে পারি, কিন্তু সতত যেন তোমার প্রসঙ্গে মতি থাকে । ভাগবতেও এই মর্মের উক্তি আছে, ১০/১৪/৩০, ১০/৪৭/৬৭, ১০/৭৩/১৫ ।

"সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি
জন্ম জন্ম যেন প্রভু তোমা না পাসরি ।
কি মনুষ্য পশু পক্ষী হই যথা তথা
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্বথা ।"[২৮০]

"স্থাবর জঙ্গম মধ্যে যত জীব জাতি
নিজ কর্মফলে যদি হয় গতাগতি ॥
সে সকল যোনি মধ্যে জনম লভিঞা
তোমা না পাসরি যেন মায়ামুগ্ধ হঞা ॥
দৃঢ় ভক্তি হয় যেন তোমার চরণে ।"[২৮১]

বন্ধনের বিপরীত শব্দ মুক্তি, অতএব মুক্তির অর্থ বন্ধনের অবসান —সংসার বন্ধনের অবসান—কারণ সংসারই সকল দুঃখের মূল । একশ্রেণীর ভক্ত জীবৎকালে দুঃখকে উপেক্ষা করেন, সাধনার ফলে পরলোকে যখন কৃষ্ণসেবার অধিকারী হ'ন তখন দুঃখ তিরোহিত

হ'য়ে শুধু থাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ। ভক্ত মুক্তি বাঞ্ছা না করতে পারেন কিন্তু পার্ষদ রূপে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মক্ষয় হয়, দুঃখের অবসান অর্থাৎ মুক্তি হয়। অদ্বৈতবাদীর বা নৈয়ায়িকের উদ্দিষ্ট মুক্তিতে কেবল-আনন্দস্বরূপে স্থিতি, কিন্তু ভক্তিবাদীর মুক্তি সক্রিয় সংবেদ্য উল্লাসকর সুখ, যার উদ্ভব হয় ভগবৎ-সেবা থেকে। অন্য এক শ্রেণীর ভক্ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহী নয় কারণ সেটা অনির্দেশ্য, এ জগতের স্থিরসত্য জন্মজরামরণ, তিনি এ সবকে স্বীকার ক'রে অবশ্যম্ভাবী দুঃখকে বরণ ক'রে জন্মজন্মান্তরে আবর্তিত থাকতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রার্থনা করেন ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তি। এ ভক্ত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার চান না, তিনি চান যেন ভগবৎ-বিস্মরণ না ঘটে, অন্তঃস্থিত ঈশ্বরে যেন সর্বদাই মতি থাকে। এ ভক্তিও অহৈতুকী, কিন্তু এঁদের মধ্যেই এমন ভক্ত আছেন যাঁদের পুনর্জন্মত্যাগের অনিচ্ছা হেতুভূত, ভক্তিশাস্ত্রের মহত্তম আদর্শ স্থাপন ক'রে তাঁরা বলেছেন অন্যরা যতক্ষণ মুক্তিপ্রাপ্ত না হচ্ছেন ততক্ষণ নিজের মুক্তির চেষ্টা স্বার্থপরতার লক্ষণ। মনে হয় এই মহিমময় সংকল্প মহাযান-বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত কারণ এমন অভিব্যক্তি হিন্দুধর্মে বিরল।

"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।"[২৮২]

এই সব দীনজনকে পরিত্যাগ ক'রে একা আমি মুক্তি চাই না, (সংসারে) ভ্রাম্যমাণ জীবদের তুমি বিনা শরণ দেখি না।

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ
পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা –
মনঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।"[২৮৩]

আমি ঈশ্বরের নিকটে অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত পরাগতি কিম্বা অপুনর্জন্ম কামনা করি না, আমি নিখিল দেহধারীগণের অন্তঃকরণে স্থিত থেকে তাদের দুঃখ (সহন করতে) চাই, যা'তে তারা দুঃখরহিত হয়।

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে
সব জীবের পাপ প্রভু! দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ
সকল জীবের প্রভু! ঘুচাও ভব-রোগ।"[২৮৪]

## জীবন্মুক্তি

অজ্ঞান দূরীভূত হ'য়ে যাঁর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়েছে এবং সঞ্চিত কর্ম ধ্বংশ হয়েছে, অদ্বৈতবেদান্ত মতে এমন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। প্রারব্ধ কর্মক্ষয় হ'লে তাঁর বিদেহমুক্তি তার পরে আর পুনর্জন্ম নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জ্ঞান ও কর্মের কোনও প্রয়োজন

নাই, সৎকর্মদ্বারা কর্মক্ষয়ের কোনও প্রসঙ্গ নাই, জীবভক্তের এ জীবনে ভগবৎ-দর্শন হবে কিম্বা কত জন্ম পরে হবে তার স্থিরতা নাই, ভগবৎকৃপা লাভ করলেও মৃত্যুর পরে অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে পুনর্জন্ম আছে কারণ কোনও প্রকটলীলায় তাঁকে জন্ম নিতে হবে অপ্রকটে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। সুতরাং বৈষ্ণব ভক্তের জীবন্মুক্তি নাই। মায়াবন্ধন হ'তে মুক্তিকে তখনই জীবন্মুক্তি বলা যেতে পারে যখন দেহাবসানের পরে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যেসব লক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ব্রাহ্মীস্থিতি ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা'তে ভক্তের শান্তভাবের প্রতিষ্ঠা; যদি জীবন্মুক্তের বেলাতেও এই লক্ষণগুলি চিহ্নস্বরূপ হয় তা হ'লে গৌড়ীয় মতে জীবন্মুক্তির অস্তিত্ব থাকে না, কারণ যে রাগানুগা ভক্তি ভক্তের সাধন তা'তে শান্তরসের স্থান নাই।

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" [২৮৫]

অনথ্যারূপ পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপে অবস্থিতি মুক্তি। জীব তটস্থা শক্তি, অর্থাৎ সে স্বরূপ-শক্তির এবং মায়াশক্তির তটদেশে বা মধ্যস্থলে, তার চিৎ-রূপ আত্মা স্বরূপশক্তির প্রতিমুখ উর্ধ্বমুখ, পঞ্চভূতের প্রকরণ জড়দেহ মায়াশক্তির প্রভাবান্বিত, নিম্নগামী। দেহ নশ্বর সুতরাং দেহ দ্বারা পরিমিত বশীভূত হওয়া জীবের পক্ষে অন্যথা রূপ, জীবাত্মার স্বরূপ হ'ল নিত্যবস্তু-মুখিত্ব বা ভগবৎ-প্রাপ্তি। যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ মায়াশক্তির কার্য আছে সুতরাং ততক্ষণ স্বরূপশক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠ নয়, ততক্ষণ মুক্তি নাই। অতএব এ জীবনে স্বরূপে অবস্থিতি হ'তে পারে না ব'লে জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়। রামানুজ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নি। জীব গোস্বামী জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের ৩/২৮/৩৫-৩৮ শ্লোকের নজির দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে যোগীকে ধ্যান করতে বলা হয়েছে, ধ্যান পরমাত্মাকে নয় চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে, তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গকে যথাক্রমে। এই প্রকারে যোগীর মন নির্বিষয় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বাণ লাভ করে, অবশ্য প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জীবিত থাকতে হয়। ভাগবতে বর্ণিত কপিল কথিত এই পদ্ধতি ধ্যান-জ্ঞানের পথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভক্তির পথ এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুতরাং এ নজির নিষ্ফল।

জীব গোস্বামীর মতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হ'লেই মুক্তি হয়, যা এ জীবনেই সম্ভব। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ—অন্তরাবির্ভাব ও বহিরাবির্ভাব, তার মধ্যে দ্বিতীয়টিই শ্রেষ্ঠ।[২৮৬] কিন্তু অন্য বিধানকর্তারা এমন আশান্বিত বা আশাপ্রদ নয়। এক চৈতন্য ছাড়া আর কারও যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়েছিল তার কোনও উল্লেখ নাই। যদি বলা যায় চৈতন্যই স্বয়ং ভগবান অতএব তাঁকে দেখাই ভগবৎসাক্ষাৎকার, তাহলে বলতে হয় জীব গোস্বামী প্রমুখ বহু

চৈতন্য-ভক্ত যাঁরা চৈতন্যকে দেখেন নি, তাঁদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের কোনও প্রসঙ্গ কোথাও নাই।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি আত্মারাম, বৈষ্ণব ভক্ত আত্মারাম নয়। "আত্মারাম" শব্দের ব্যুৎপত্তি আত্মনি আ রমতে, নিজের আত্মাতেই যাঁর রতি। কিন্তু ভক্তের রতি আত্মাতে নয়, কৃষ্ণে। "ভক্তের পক্ষে এই আত্মারামত্ব অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থাও গ্রাহ্য নহে, কেননা ইহা প্রেমবিরোধী—তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেমবিরোধিত্বাৎ (বৃহদ্ ভাগবতামৃত)। আত্মারাম কৃতকৃত্যতা আনে, এই অবস্থায় সাধক নিষ্ক্রিয় হ'ন।...যে হৃদয়ে চরিতার্থতা আসিয়াছে তাহাতে ভক্ত প্রবেশ করে না।"[২৮৭]

## জীবভক্তের দুরাশা

ব্রহ্ম-নির্ণয় প্রসঙ্গে কথিত হয়েছে যে ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ নাই, অপ্রাকৃত গুণ আছে। এবং কৃষ্ণই ব্রহ্ম। ভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মমত্ববোধ। পরিকর ভক্তদের বেলায় মমত্ববোধ অপ্রাকৃত গুণ থেকে উদ্ভূত হলেও হ'তে পারে কিন্তু যে ভক্ত জীবতত্ত্ব তার মমত্ববোধ প্রাকৃত গুণ থেকে উদ্ভূত হওয়া ছাড়া উপায় নাই। যেসব গুণের জন্য ভগবানকে ভক্তের প্রিয় মনে হয় সেসব গুণকে প্রাকৃত গুণের সার বলেই আমরা ধরে নিই কারণ অপ্রাকৃত গুণের ধারণা আমাদের নাই। প্রাকৃত গুণের বেলায় মমত্ববোধ উভয়মুখী, মাতাপুত্র, প্রেমিক-প্রেষ্ঠ সখা-সখার সম্পর্ক এমন যে আচরণ ও আকর্ষণ উভয়পক্ষীয়, কিন্তু ভগবান ও জীবভক্তের মধ্যে সম্পর্ক একতরফা, কারণ ভগবানের প্রতি জীবের যে প্রাকৃত মমত্ববোধ সেটা আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত কিন্তু ভক্তের প্রতি ভগবানের অপ্রাকৃত মনোভাব আমাদের বুদ্ধির অগম্য হেতু নিস্পৃহতার শামিল।

যেহেতু কৃষ্ণ আত্মারাম তাঁর আনন্দপ্রাপ্তি আপনা থেকেই হ'তে পারে অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে হ'তে পারে, কোনও বহির্বিষয়ের দ্বারা তা সম্ভব নয়। যেহেতু জীব কৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত নয় অতএব জীব কৃষ্ণের আনন্দআস্বাদনের হেতু হ'তে পারে না, জীবভক্তের ভক্তি বা আত্মসমর্পণ তাঁর আস্বাদ্য নয়। "শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম আপ্তকাম, এবং স্বরাট (একমাত্র স্বীয় শক্তির সহায়ে বিরাজিত) বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই তাঁহাকে আনন্দিত করতে পারে না।"[২৮৮] "যাঁহারা এই উভয় লীলার নিত্যপরিকর তাঁহারাই এই সেবা দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না; কেননা, সেবার মুখ্য অধিকার একমাত্র নিত্যপরিকরদের; কৃপা করিয়া তাঁহারা যাঁহাকে সেবায় নিয়োজিত করিবেন তিনিই সেবা পাইতে পারেন।"[২৮৯] জীব যদি স্বরূপ শক্তির

কৃপালাভ করে' অন্তরঙ্গ পরিকরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ন তখন কৃষ্ণের আনন্দাস্বাদনের আনুকূল্য করতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণ তার অপেক্ষা রাখেন না, তিনি আপন স্বরূপ-শক্তি সহায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। "কৃষ্ণ স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়; স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ পরিকরগণ ব্যতীত অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না।"[২৯০] তিনি যে জীবভক্তের কাছ থেকে আনন্দ পাবার জন্য উদ্গ্রীব নয়, ভগবৎ-এষণায় এটি ভক্তের পক্ষে নিরাশার কারণ। অবশ্য যদিও আনন্দ-আস্বাদক রূপে তিনি জীবভক্তের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা বা গ্রহণ করেন না, আনন্দদাতা রূপে তিনি ভক্তের প্রতি বদান্য। এখানে আনন্দ-বিনিময়তা নাই, দেবার বেলায় অকৃপণ হলেও নেবার জন্য তিনি হাত পাতেন নি, এতে ভক্ত ক্ষুণ্ন হ'তে পারেন।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।"[২৯১]

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। (সাধুরা) আমাকে ব্যতীত আর কিছু জানেন না, আমিও আর কিছুই মনে স্থান দিই না।

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।"[২৯২]

হে দ্বিজ! ভক্তজনপ্রিয় আমি অস্বতন্ত্রের মত ভক্ত-পরাধীন; সাধুভক্তগণকর্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়, অর্থাৎ তাঁরা আমার হৃদয় অধিকার ক'রে আছেন।

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।"[২৯৩]

হে ব্রাহ্মণ! আমি যাঁদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত আমি নিজের আত্মাকে এবং নিজের আত্যন্তিকী শ্রীকেও (= সম্পদকেও) অভিলাষ করি না। অর্থাৎ আত্মারাম হওয়ার চেয়ে ভক্তের প্রেমের বশ হওয়াই ভগবানের অধিক কাম্য।

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শিনম্
তনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।"[২৯৪]

আমি শান্ত নিরপেক্ষ বৈরীহীন সমদর্শী মুনির অনুগমন করি তাঁদের পবিত্র চরণরেণুর আশায়।

"ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনাঃ
বশেকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।"[২৯৫]

আমাতে আবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণ ভক্তি প্রভাবে আমাকে বশ করেন যেমন করেন সতী স্ত্রী সৎপতিকে।

"ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাংস্তথা।"[২৯৬]

কৃষ্ণ ভক্তগতপ্রাণ এবং বৈষ্ণবগণও কৃষ্ণগতপ্রাণ হ'ন। বৈষ্ণবগণ

কৃষ্ণকে ধ্যান করেন, কৃষ্ণও বৈষ্ণবদের ধ্যান করেন। ভাগবতের এবং নারদপঞ্চরাত্রের উক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেকার, এ জাতীয় উক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শোনা যায় না, কৃষ্ণ সেখানে স্বরূপ-শক্তির নিত্যপরিকরদের নিয়ে আনন্দ-মগ্ন, সাধুভক্তদের জন্য তাঁর আগ্রহ নাই, তাদের সাহচর্য না পেলে তিনি কোনও অভাব বোধ করেন না।

ভক্তবৎসল হরি একটিমাত্র তুলসীদলের বা একগণ্ডুষ জলের বিনিময়ে ভক্তগণের কাছে নিজের আত্মাও বিক্রয় করেন।[২৯৭] এ রকম উক্তিতে ভক্ত কি তৃপ্তি পান জানি না, কারণ ভগবানকে ক্রীতদাস রূপে পাওয়ার বাঞ্ছা কারও নাই।

"ভক্তি বা প্রেমভক্তি বা প্রেম যখন রস রূপে পরিণত হইয়া পরম আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে, তখন তাহা হয় রসিকশেখর ভগবানের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। এই প্রেম থাকে পরিকর ভক্তের চিত্তে। লীলার ব্যপদেশে রস রূপে তাহা উৎসারিত হইয়া রসস্বরূপ ভগবানের উপভোগ্য হয়। ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনেই তাঁহার সমধিক আনন্দ।"[২৯৮] যে ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনে কৃষ্ণের পরম আনন্দ, সে মর্ত্যের সাধক নয়, অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্ত, রাগাত্মিকা সেবা শুধু তাঁরাই করতে পারেন।

"ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে হইলেও তদুদ্দেশ্যে যেসকল শাস্ত্রীয় বিধি আছে তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে। রাগমার্গের শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া নিজের মনগড়া উপায় অবলম্বন করিলে ভজন হইবে না, হইবে একটি উৎপাত বিশেষ।"[২৯৯] রাগমার্গে সাধনার মূল কথা ভগবানে মমত্ববোধ, "তিনি আমার" এই ভাব। সাংসারিক ক্ষেত্রে এই ভাবকে কোনও সংজ্ঞায় বা নিয়ম-নিগড়ে বদ্ধ করা যায় না, ভাবটি সখ্যই হোক বা বাৎসল্যই হোক বা দাম্পত্যই হোক। স্বতঃস্ফূর্ত বৈয়ক্তিক না হ'লে এ সব মনোভাবের সত্যতা নাই, সত্য হ'লে এগুলি নিয়ম-বহির্ভূতই হয়ে থাকে। ভাব-প্রকাশের নিয়ম-শৃঙ্খল ও শিক্ষা-তরিবৎ থাকে শুধু অভিনয়ের বেলায়, সেখানে কায়দা-দুরস্ত ভাবে ভাব-প্রকাশের নিয়ম, কারণ ব্যাপারটি অনুকরণ-মূলক এবং কৃত্রিম। রাগানুগা ভক্তির বেলায় শাস্ত্রবিধি-সম্মত ভাবে ভাব-প্রকাশ করার আজ্ঞায় ভক্তের সহজ-প্রবণতাকে রুদ্ধ ক'রে কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সখ্য, বাৎসল্য, কান্তাপ্রেম শ্রেষ্ঠসাধ্য হ'লেও এর কোনও একটি ভাবে বিভাবিত হ'য়ে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-স্থাপন জীবভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভক্ত নিজেকে সখা বা সখী কল্পনাও করতে পারেন না কারণ এঁরা নিত্যসিদ্ধ এবং স্বরূপ-শক্তির বিকাশ সুতরাং ভগবৎ-তত্ত্ব; জীবের ভগবৎ-বুদ্ধি অপরাধজনক। কৃষ্ণের সখা বা সখীরা, যাঁরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা লাভ করেছেন তাঁরা অনাদিকাল থেকেই কৃষ্ণের সঙ্গে

বিহার ক'রে আসছেন, বস্তুতঃ রসাস্বাদনের জন্য কৃষ্ণই বিচিত্র পরিকর সৃষ্টি করেছেন।

এঁদের ন্যস্ত-কার্য নির্ধারিত, স্নেহ-প্রেম-ভক্তি প্রাক্-নির্দিষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত নয়, এঁদের যা ব্যবহার তার চেয়ে পৃথক্ কিছু অসম্ভব। অপরদিকে এঁদের প্রতি কৃষ্ণের কৃপাও অবশ্যম্ভাবী ব'লে মূল্যহীন। মানুষের বেলায় এমন কোনও বাধ্যতা নাই, তার ভক্তি তার সেবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সে ভক্ত হ'তেও পারে না হ'তেও পারে। সুতরাং সে যদি ভক্ত হয় তার স্বেচ্ছাধীন ভক্তিই বেশী মূল্যবান মনে করা উচিৎ ছিল, কিন্তু করা হয় নি।

এক বারনারী ভক্তিধর্মের সংস্পর্শে এসে তার পাপজীবন পরিত্যাগ ক'রে এই সংকল্প করেছিল

"সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা।
× × × × ×
সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্ যথালোভেন জীবতী
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ।" ৩০০

(নারায়ণ) সুহৃৎ প্রিয়তম নাথ এবং সমস্ত শরীরির আত্মা। তাঁকে আত্মবিক্রয় ক'রে রমার মত আমিও (তৎসহ) রমণ করবো। আমি এই বিশ্বাস নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে অনায়াসলভ্য দ্রব্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে' রমণস্বরূপ ইঁহার সহিত আত্মার দ্বারা বিহার করব। ইয়োরোপীয় এবং ইস্‌লামী মিস্টিকরা এই ভাবে বিভাবিত, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ভক্তকে এ রকম ভাবে ভাববার অধিকার দেওয়া হয় নি, কৃষ্ণের সহিত বিহারের মানস-চিন্তা ভজন-বিরোধী। এমন কি কোনও পরিকর ভক্তের সহিত অভেদ কল্পনা ক'রে তাঁর ভাবে বিভাবিত হয়ে সেবা অনুমোদিত নয়।৩০১ মিস্টিকধর্মের মূলতত্ত্ব যদি হয় ঈশ্বরের অপরোক্ষ অনুভূতি বা সান্নিধ্য-বোধ বা অঙ্গাঙ্গী মানস-মিলন তা হলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে মিস্টিকধর্ম বলা যায় না।

ভগবান কৃপাপূর্বক সাধককে উচ্চপর্যায়ের ভক্তি দেন, তাঁকে মায়ামুক্ত ক'রে ত্রাণ করেন, ব্যবধায়ক বহিরঙ্গ সেবার অধিকার দেন। ভগবানের মনোভাব শুধু দেওয়ার শুধু করুণার, তাঁর দিক থেকে কোনও কামনা বাঞ্ছা নাই, তিনি প্রাপক নয় শুধু অনুগ্রাহক; এ শুধু একতরফা সম্বাদ, দেওয়া-নেওয়ার অর্থাৎ communion-এর সম্পর্ক নাই।

"নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ।"৩০২

হে সখীগণ! ধ্যানের অবিচ্ছেদ-রক্ষণ হেতু আমি ভজনাকারীদের

ভজনা করি না, যেমন ধনহীন ব্যক্তি লব্ধ-ধন নষ্ট হ'লে সেই ধনেরই চিন্তা করে অন্য কিছু জানে না। কৃষ্ণ যা বললেন তার ভাবার্থ এই যে কেউ ভজনা করুক আর না করুক তিনি কারও ভজনা করেন না, কারণ তিনি ঔদাসিন্য না দেখালে ভক্তের ধ্যান তাঁর প্রতি অবিচ্ছিন্ন থাকবে না; ধনলাভের একাগ্র চিন্তা টুটে যায় যদি চিন্তক-ধনলাভ করে। এই ভাবটি যে গোপীদের প্রতি প্রযোজ্য নয় তা রাসলীলায় কৃষ্ণের আচরণ থেকেই বোঝা যায়, প্রথমেই তিনি নিজে বংশীধ্বনি ক'রে তাদের সমবেত করেছেন এবং কিছু কাল অদর্শনের পরে গোপীদের প্রার্থনার ফলে পুনরুপস্থিত হয়েছেন, বলেছেন তিনি গোপীদের ভজনা করেন।৩০৩ তিনি গোপীদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।৩০৪ সুতরাং তিনি গোপীদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নি, তাঁর নিরুত্তাপ উদাসীন উক্তি শুধু জীবভক্তের প্রতিই প্রযোজ্য জীবভক্তের ডাকে সাড়া দিলে তার স্বার্থ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কারণ সে নিশ্চয়ই কোনও উপকারের প্রত্যাশায় ভজনা করে, তার প্রতি প্রতিবেদনশীল হ'লে অহেতুক কারুণ্য দেখানো হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সমর্থিত ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক বিষয়ে ভগবানের এই ঔদাসিন্যের ভাবটির প্রাধান্য দেখা যায়।

জীবের সাংসারিক সন্তাপ দেখে ভগবানের কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্তিত হয় না, কারণ নিত্য আনন্দৈকস্বরূপ ভগবানের চিত্তে কোনও দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না অতএব দুঃখানুভূতি-জনিত কৃপার উদ্রেক হ'তে পারে না।৩০৫ যেখানে ভগবৎকৃপার উল্লেখ আছে সেখানে ভক্তজনের কৃপাই বোধব্য। এই উক্তিকে বিশেষিত করা হয়েছে এই ব'লে যে উদ্দিষ্ট জীব ভগবদ্-বহির্মুখ জীব, কিন্তু আনন্দময় পরমপুরুষের যদি দুঃখবোধ অসম্ভব হয় তা হলে জীবমাত্রেরই দুঃখে তিনি অবিচলিত, কি বহির্মুখ কি ভগবদ্ভক্ত—সকল জীবের প্রতি। ভগবান কারও দুঃখ দুর করেন না, ভক্তিদানেও তিনি কৃপণ।৩০৬

জীব গোস্বামী বলেছেন "ভগবান সর্বতোভাবে সর্বদোষ-বর্জিত। যাঁহার সামান্য ঐশ্বর্য থাকে তিনিও দুঃখীর প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, আর পরম-সমর্থ ভগবান অভক্তগণকে নরকাদি দুঃখ ও সংসার-দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন না ইহাতে তাঁহার যে দয়ার বৈপরীত্য অনুমিত হয় তাহার কারণ প্রাকৃত দুঃখ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না।"৩০৭ এর টীকায় বলা হয়েছে "অভক্তগণের দুঃথ মায়াসম্ভূত, তাহা মায়ার অতীত ভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে না ব'লে তাদের দুঃখে তাঁর সহানুভূতি জন্মে না।...ভক্তের দুঃখ অপ্রাকৃত তাহা ভগবৎ-বিচ্ছেদজনিত, সেই দুঃখ ভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করে।.....কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তা দূর করেন না, তার উদ্দেশ্য ভক্তিরস পোষণ করা।...যখন ভক্তিরস পুষ্টতা লাভ করে তখন তিনি

অবিচ্ছেদ-দুঃখ দুর করেন"। অতএব ঈশ্বর-বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ ছাড়া ভক্তের শারীরিক মানসিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক কোনও দুঃখই ঈশ্বরের মনকে টলাতে পারে না।

কৃষ্ণ জগৎ পালন করেন না, কাকেও ত্রাণ করেন না, দুর্বৃত্ত বিনাশ করেন না, কিন্তু জীবভক্তকে কল্পনায়-সেবার সুখ দেন। কিন্তু নির্বিবাদে এই সুখভোগও ভক্তের ভাগ্যে নাই। ভগবৎ-সেবারূপ অত্যধিক সুখে ভক্তের অঙ্গশৈথিল্যরূপ গাফিলতি হ'লে পাছে সেবার বিঘ্ন হয় সেজন্য প্রকৃত ভক্তের উচিৎ প্রেমানন্দকে ক্রোধভরে বর্জন ক'রে আজ্ঞাপালনকেই আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করা। রূপ গোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই রকমই বলেছেন।[৩০৮]

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া।"[৩০৯]

অতএব জীব কৃপাপ্রাপ্ত হ'ন ভগবানের কাছ থেকে নয় সাধুগণের কাছ থেকে। ভগবান "সদনুগ্রহ" তিনি অনুগ্রহ করেন সাধুর মাধ্যমে।[৩১০] জীবগণের দুরবস্থা দর্শনমাত্রেই সাধুগণের কৃপা হয়, তাঁরা নিজেদের উপাসনার অপেক্ষা রাখেন না।[৩১১] সাধুগণ যদিও নিজের দুঃখে উদাসীন, তাঁরা অন্যের দুঃখে দরদী। আগে দেখেছি ভগবানের আচরণ অনুকরণীয় নয় সাধুর আচরণ অনুকরণীয়, এখন দেখলাম কৃপাবর্ষণেও ভগবানের চেয়ে সাধুর শ্রেষ্ঠ হৃদয়বত্তা।

যখনই এমন কথা শোনা যায়—

"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়
আপনে নাচয়ে — তিনে নাচে একঠাঁয়।"[৩১২]

তখনই মনে রাখতে হবে এই ভক্ত তাঁর পরিকর ভক্ত, কারণ জীবভক্তের পক্ষে কৃষ্ণের সহিত এবং মূর্তিমতী প্রেমস্বরূপা রাধার সহিত একত্রে নৃত্য অকল্পনীয়, জীবভক্তের এ অধিকার নাই। এই প্রেম স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বলেই কৃষ্ণের উপরে প্রভাব বিস্তার ক'রে তাঁকে বশীভূত করতে পারে, এবং সে শক্তি মানুষের নাই, উচ্চাঙ্গের ভক্তি যা স্বরূপ-শক্তির-বৃত্তি তা মানুষ পেতে পারে ভগবৎকৃপায়, কিন্তু এই ভক্তিতে যদি ভগবান সাধকের প্রতি প্রীত হ'ন তা হলেও ভক্তকে নিকট-সেবার অধিকার দেন না। কৃষ্ণ সর্বদাই রসাস্বাদে বিভোর বিশেষতঃ রতিরসে, পরিকর ভক্ত এ সবের অংশগ্রহণকারী, কৃষ্ণ প্রীত হন পরিকর ভক্তদের প্রেমরস আস্বাদন ক'রে এবং নিজের মাধুর্য রস আস্বাদন করিয়ে ভক্তের আনন্দবিধান ক'রে। রসাস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণ পরিকর ভক্তদের সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তাঁদের স্বাতন্ত্র্য নাই বিশেষত্ব নাই, তাঁরা পুতুলনাচের পুতুল মাত্র, সূত্র-ধরে আছেন যোগমায়া। কৃষ্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ, সাধক ভক্তের প্রয়োজন তাঁর নাই।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন।"[৩১৩]

জীবভক্তের বেদস্তুতির চেয়েও প্রিয়ার কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভগবানের কাম্য। এই কারণে স্তবস্তুতির চেয়ে এমন প্রিয়াসক্ত দেবতার প্রেমবিলাসের মানসধ্যানই ভক্তের চরম সাধনা ব'লে নির্ধারিত হয়েছে, ভক্ত লীলা-আস্বাদনের দিবাস্বপ্নে মগ্ন। কিন্তু স্বপ্নেও তিনি দেবতার সন্নিধানে যেতে পারেন না। অনাদি পরিকরদের আনুগত্যে দূর থেকে সেবার উপকরণ যোগাতে পারেন মাত্র। ভক্ত গৃহ-বিগ্রহকে স্নান-ভোজনাদি যে পরিচর্যা করেন সেও দাসেরই কাজ।

"ব্রজে……পরিকরগণের রাগাত্মিকা ভক্তি; রাগাত্মিকা ভক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী, এই ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই। সুতরাং যেসকল পরিকরের রাগাত্মিকা ভক্তি, তাঁহাদের মধ্যে মুক্ত জীবও থাকিতে পারেন না; তাই রাগাত্মিকা ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে জীব-শক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয় না।

"জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার বলিয়া রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগা ভক্তিতেই জীবের অধিকার।……রাগানুগা ভক্তিতেও তাঁহার (= কৃষ্ণের) পক্ষে জীবশক্তির—মুক্তজীবের—অপেক্ষা রাখিতে হয় না। তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের সেবা না পাইলে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নির্বাহিত হয় না, তাহা নয়।"[৩১৪]

কয়েক শত বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে বাঙালী প্রাণময় আশাময় উক্তি শুনলো—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম যে হত মিছে।"

একদিকে এই আশ্বাসবাণী পাই যে এই জন্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটতে পারে।[৩১৫] অন্যদিকে দেখি ভগবানের পরম দান যে ভক্তি সেটা পেতে হ'লে ভক্তকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয়, পাবার কোনও স্থিরতা নাই, ভরসা নাই। বিশ্বাস হারান না এমন ভক্ত যে আছেন সেইটাই আশ্চর্য।

"জন্মান্তরসহস্রেষু তপোধ্যান-সমাধিভিঃ
নরাণাং ক্ষীণপাপাণাং কৃষ্ণে ভক্তি প্রজায়তে।"[৩১৬]

সহস্র জন্মের তপস্যা যোগসমাধি দ্বারা নরের পাপক্ষয় হলে হরিভক্তি লাভ হয়।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ
সেয়ং সাধনসহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা।"[৩১৭]

জ্ঞানমার্গে (লভ্য) মুক্তি এবং যজ্ঞাদির পুণ্যফলে (লভ্য স্বর্গ-)-ভোগ সুলভ, কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র (বর্ষের) সাধনাতেও (লাভ করা) সুদুর্লভ।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।"[৩১৮]

কৃষ্ণভক্তিরসভাবনাযুক্ত মন যদি কোথাও লাভ করা যায়, তার একমাত্র ক্রয়মূল্য সে বিষয়ে (= কৃষ্ণের প্রতি) লালসা, যা কোটিজন্মের পুণ্য দ্বারাও পাওয়া যায় না।

"জন্মকোটি সহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জিতম্
তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দন।"[৩১৯]

যাঁরা কোটি কোটি জন্মে পুণ্য উপার্জন করেছেন তাঁদের দেবদেব জনার্দনে শ্রদ্ধাভক্তি হয়।

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।"[৩২০]

"মানবেরর চরম ও পরম কাম্য প্রেম। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু ইহা সাধ্যসাধনায় পাওয়া যায় না। নবাঙ্গ ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানে বহু জন্মজন্মান্তরে সৌভাগ্যে অকস্মাৎ কোন নিত্যসিদ্ধ ভক্তের অহৈতুকী কৃপালাভ ঘটে। সেই পুণ্যেই হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়।"[৩২১] এমন দুরাশ সম্ভাবনা ভক্তকে ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত অনুপ্রাণিত করার পক্ষে অনুকূল নয়।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ নাই। বৈষ্ণব বেদান্তগুলি অদ্বৈতবাদের পরিপন্থি এবং এদের চেষ্টা অদ্বৈতমত খন্ডন ক'রে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও দূরত্ব প্রতিপাদন করা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই দূরত্ব চরমে পৌছে ভক্তকে শেষ নিম্নসীমায় নামিয়েছে। ভক্ত যদি জ্ঞানের সহযোগে ব্রহ্মবিচার করে ভগবদানুরক্ত হন গৌড়ীয় মতে সেটি শ্লাঘার বিষয় নয়, নির্জ্ঞান বিচারহীন সাধনা শ্রেষ্ঠতর। কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে কর্মকরবার অবকাশ নাই। অনেক ধর্মে ও মতবাদে ভক্তকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে দেহান্তে বা এই জন্মেই তাঁর মুক্তি সম্ভব কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তদ্বিপরীতে বলা হয়েছে এ জন্মে তাঁর মুক্তি হবে না এটা স্থিরনির্ধারিত, তাঁকে অন্য কোনও ব্রহ্মান্ডে প্রকটলীলায় জন্ম নিতে হবে। কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করলেও দাস্যভাবে ছাড়া তাঁর সেবার অধিকার নাই। সেবার গুণে অনেক দাস প্রভুর অন্তরঙ্গ বিশ্রব্ধ হয় কিন্তু জীবভক্তের সেবা দূর থেকে, তিনি কোনক্রমেই ভগবানের পার্শ্বচর হ'তে পারেন না, ভগবান তাঁর প্রতি উদাসীন। শ্রেষ্ঠ ভক্তিলাভ ভক্ত-কৃপা-সাপেক্ষ এবং এ ভক্তি যে কত জন্মজন্মান্তরে পাওয়া যাবে তার কোনও স্থিরতা নাই।

## অনাচারের প্রতিকার

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এক শ্রেণীর পরিকর ভক্ত সৃষ্টি ক'রে তাদেরকে সর্বমান্যতা দিয়ে, জীবভক্তকে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানে দূরে সরিয়ে রেখে তা'কে এমন লঘুমর্যাদাবান করা হ'ল কেন ? এ কৃতিত্ব কার তা নিরূপণ করা আজ দুঃসাধ্য কিন্তু নিশ্চয়ই সমাজ-প্রয়োজন-বোধে করা হয়েছিল। সহজিয়া মতে ভক্তরা যখন রাধা ও কৃষ্ণ ভাবে নিজেরা বিভাবিত হ'ন, তখন যে মিলনসুখ অনুভব করেন সেটা পার্থিব-পর্যায়-উত্তরিত হয়ে ভাগবতী সুখের পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং পরস্পরের সুখানুভুতি তখন রাধাকৃষ্ণের অন্তরে সুখোৎপত্তির সমান; যেহেতু রাধাকৃষ্ণের সুখবিধান করাই তাঁ'দের সেবা এবং এই সেবাই ভক্তের পুরুষার্থ অতএব স্ত্রীপুরুষের দেহমিলনই ধর্মের চরম নিদর্শন হ'য়ে দাঁড়ালো; "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা" এবং "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা"য় কোনও প্রভেদ রইল না। কৃষ্ণকে উপপতি-ভাবে দেখে[৩২২] ও তাঁর প্রেমে মগ্ন হ'য়ে গোপীরা মুক্ত হয়েছিলেন, সহজিয়ারা এর বিপরীতটাকে প্রযোজ্য মনে করলেন অর্থাৎ উপপতিকে কৃষ্ণভাবে দেখে মনে করলেন যে ধর্মাচরণ হ'ল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এই দুষিত প্রথায় আন্‌লো সংস্কার, নিষেধিত হ'ল ভক্তের রাধা বা কৃষ্ণ ভাবে বিভাবন, প্রভৃত সর্তকতায় নিয়মিত হ'ল ভক্ত সখীভাবেও সেবা করতে পারবেন না, শুধু সখীর আনুগত্যে লীলা দর্শন করবেন, ক্রমে মিলন-লীলার সাহায্যকারিণী হ'তে পারেন অন্তরঙ্গ না হ'য়ে। চৈতন্যের অনুকরণে রাধাভাবে সাধনায় সহজিয়াতত্ত্বের সুযোগ নিয়ে পাছে অনাচার প্রবেশ করে তাই নিয়ম হ'ল এমন আচরণ কেউ করতে পারবেন না। মনে হ'তে পারে ভক্তকে ভগবানের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হ'ল কিন্তু ধর্মের নামে সামাজিক অনাচার নিবারণ করতে এমন বিধানের নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

ধর্মের অবনতি যে যে কারণে হয় তার মধ্যে তিনটি প্রধান। যে ধর্মে ঈশ্বর-মানুষের প্রেম-সম্বন্ধ-ব্যঞ্জনায় বা কোনও সংযোগ-নিয়মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে বা শক্তিসাধনার বিষয়ে নরনারীর মিলন প্রাসঙ্গিক হয়েছে প্রতীকার্থে বা রূপকার্থে, সেখানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে এমন রূপক ভক্ত-নরনারীর দেহের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হ'য়ে যৌন অনাচার সৃষ্টি করবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে অবশ্য পরকীয়াতত্ত্ব রূপকার্থে প্রযুক্ত হয় নি, এমন প্রেম সত্যই ঘটেছিল কৃষ্ণলীলায়, যদিও একমতে পরকীয়া-সম্বন্ধ লীলাকরদের ভান মাত্র। কিন্তু এ ধর্মেও কোথাও কোথাও অনাচার প্রবেশ করেছে পরকীয়াবাদের সুযোগ নিয়ে। মানস-সাধনার পরিবর্তে স্থূলদেহ-আশ্রিত সাধনার বশবর্তী হ'য়ে কিছু লোক পরকীয়া রমণী অপরিহার্য মনে করেছে,

এমন রমণীকে গোপীভাবে দেখে তার সাহচর্যে প্রেমচর্চাকে প্রকৃত সাধন ব'লে প্রচার করেছে। কেউ বা গোপীভাবে সাধনাকে মানসিক স্তরে না রেখে পুরুষ হয়েও স্ত্রীবেশ ধারণ করেছে। এমন আচরণ ধর্মানুমোদিত নয় এবং ধর্মনেতারা সংশোধনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পাপবোধ সব ধর্মেই আছে কিন্তু যেখানে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান পুরোহিতের হাতে, সেখানে পুরোহিত-সম্প্রদায় তার সুযোগ নিয়ে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা এনেছে, এক পাপ কাটাতে উদ্ভব হয়েছে অন্য পাপ। গৌড়ীয় সম্প্রদায় এ অভিযোগ থেকে মুক্ত কারণ এখানে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত নামকীর্তন বা নামস্মরণ, যা ভক্তের নিজের হাতে।

তৃতীয় কারণ ঃ যেখানে আচার বিধিবৎ পালনীয় সেখানে কালক্রমে সেসব যন্ত্রবৎ হ'য়ে ওঠে যদি না নিহিতার্থ সম্বন্ধে নিত্যই আচার-পালককে সচেতন করা হয়। ভক্তিধর্মের কিছু সম্প্রদায়ের সাধনা যন্ত্রবৎ আচার পালনে পর্যবসিত হয়েছিল, নিষ্ঠার সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক ছিল না; এই পরিস্থিতির বীজ উপ্ত হয়েছিল ধর্মের ক্ষেত্র-প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে।

"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"[৩২৩]

সঙ্কেতে কি পরিহাসে, কি গীতালাপে কিম্বা হেলার সহিতই হোক, কোনও ভাবে ভগবানের নাম নিলেই অশেষ পাপ দূরীত হয়।

"কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ।"[৩২৪]

একমতে অসংখ্যাত জপ, অর্থাৎ যে জপে সংখ্যাগণনা নাই, এমন জপ নিষ্ফল। অতএব নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করা আবশ্যক। মৃত্যুকালে অজামিল ভগবানকে স্মরণ করেন নি পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিলেন[৩২৫] ভক্তির লেশ না থাকলেও দৈবাৎ নাম-উচ্চারণের জন্য তিনি নরক থেকে অব্যাহতি পেলেন। এই সব দৃষ্টান্ত এবং সিদ্ধান্তের ফলে সৃষ্ট হয়েছে এমন মনোভাব যাতে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ও সৎকর্ম ব্যতিরেকেও শুষ্ক আচারের পৌনঃপুনিক অনুবর্তন করায়, শুধু সংখ্যাপূরণের জন্য যন্ত্রবৎ নামজপ করায়, মূঢ়বৎ বিধিপালন করায় ভক্তের কোনও দ্বিধা রইল না, তিনি জানলেন তাঁর পুণ্য অব্যাহতরূপে নিশ্চিত।

## উল্লেখপঞ্জী

১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, বিভাব ১৩৭, ১৪১-১৪৫
২। শ্বেতাশ্বতর ৬/২৩

৩। গীতা ১২/৫
৪। ভাগবত ৭/৬/১৯
৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভক্তিসামান্য, ধৃত নারদপঞ্চরাত্র বচন
৬। নারদীয় ভক্তিসূত্র, প্রথম অধ্যায়, সূত্র ১৯
৭। নারদ পঞ্চরাত্র, প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ টীকা
৮। গোপালতাপনী, পূর্বভাগ ১৫
৮ক। বিবেকচূড়ামণি ৩১ শ্লোক
৯। ভাগবত ১১/২০/৮
১০। ভাগবত ১১/২৫/৩৫
১১। ভাগবত ৭/৭/৫৫
১২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভক্তিসামান্য ১১
১৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১/৯৪
১৪। ভাগবত ১০/১৪/৩
১৫। ভাগবত ১০/২৯/১২
১৬। ভাগবত ১১/১২/১৩
১৭। ভাগবত ১১/১১/৩৩
১৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/৯৩-১০২
১৯। ভাগবত ১১/২০/৩১
২০। ভাগবত ১০/১৪/৩
২১। ভাগবত ১০/১৪/৪
২২। পদ্যাবলী, ৩৯ শ্লোক
২৩। নীরদপ্রসাদ নাথের নরোত্তম দাস, পৃঃ ৪২৬
২৪। হরিভক্তিবিলাস, প্রথম বিলাস ৭১, ৭২, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের মত উদ্বৃত
২৫। ভাগবত ১১/২৫/২৪
২৬। ভাগবত ১১/২৫/৩৩
২৭। ভক্তিসন্দর্ভ ১৩৮
২৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০
২৯। গীতা ১১/৫৫
৩০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি, ৫৬ টীকা
৩১। ভাগবত ৬/১৪/২, ৫
৩২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৫৭ জীব গোস্বামীর টীকা
৩৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১৪৫
৩৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৬৬, ভাগবত ১/৬/৩৫, চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১৪৫
৩৫। ভক্তিসন্দর্ভ ৫৭, ৬০, ৮১; ভাগবত ১১/২০/২৭, ২৮
৩৬। ভাগবত ১/২/৭, ৩/৩২/১৮, ১১/২/৪৩

৩৭। ভাগবত ৩/৫/৪৫
৩৮। ভাগবত ১১/১০/৪
৩৯। ভাগবত ১/৫/৩৫
৪০। ভাগবত ১১/২০/৯
৪১। ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৩
৪২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/২৬৩
৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/৬০
৪৪। ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬
৪৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/৫৯, ৬০; ভক্তিসন্দর্ভ ১০১
৪৬। ভাগবত ৩/২৯/৯
৪৭। ভাগবত ৩/২৯/১২
৪৮। ভাগবত ৩/২৯/২৮; ১১/১১/২১, ২২; ১১/২৯/৯
৪৯। ভাগবত ৫/১৯/২৮
৫০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৬৬-১৬৮
৫১। মনুসংহিতা ২/৪
৫২। ভাগবত ১১/৮/৪৪
৫৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ৬
৫৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৯৩, ২০৩
৫৫। ভাগবত ৩/২৯/১০-১২
৫৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১ জীব গোস্বামীর টীকা
৫৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ২
৫৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি, ৪, ৫
৫৯। ভাগবত ৭/৫/২৩
৬০। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৪/৭১
৬১। ভক্তিসন্দর্ভ বৈধীভক্তিভেদরূপা শরণাপত্তি ও গুরুসেবা ২৩৫, ২৩৬
৬২। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৩/১৭, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি, দ্বিতীয় লহরী ২৮
৬৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/২৫৬, ২/২২/৯৩; ভাগবত ১১/৫/৪১; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, দ্বিতীয় লহরী ১১৮
৬৪। ভাগবত ১১/১৪/২৯, ১১/২৬/২৪; চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/৮৭
৬৫। রাধাগোবিন্দ নাথের চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা. পৃঃ ১০৫০
৬৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ২৩, ২৪ টীকা
৬৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ২৫
৬৮। ভাগবত ৪/২৯/৪৭

৬৯। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২৪৫
৭০। ভাগবত ১১/১০/১, ৭; ১১/১৭/৩৮
৭১। ভাগবত ৩/৩১/৩৫; ১১/১৪/২৯; ১১/২৬/২২
৭২। ভাগবত ৩/২৯/২০
৭৩। ভক্তিসন্দর্ভ ১০৬
৭৪। চৈতন্যভাগবত ১/১৬/৩৫, ১৪৫, ১৭৩
৭৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৩৩
৭৬। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১৭/১২২, চৈতন্যভাগবত ২/১/৪০৭
৭৭। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৭/৯২
৭৮। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৭/৭৬, ২/৬/২৪২ উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণ বচন ৩৮/১২৬
৭৯। ভাগবত ৪/৯/১০
৮০। ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৯ পদ্ম পুরাণ হ'তে উদ্ধৃত
৮১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৫/১০৪
৮২। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৩/১৭৭, ১৭৮, ১৮০
৮৩। ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩
৮৪। ভাগবত ১২/৩/৫১, ৫২
৮৫। ভাগবত ১১/২/৪০
৮৬। নারদীয় ভক্তিসূত্র, প্রথম পরিচ্ছেদ, সূত্র ৬
৮৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৬/২৩৮, ২৩৯
৮৮। ঈষোপনিষদ ১
৮৯। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৮/২৬, ৩০
৯০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ২৮ (নামাপরাধ) উদ্ধৃত পদ্ম পুরাণ বচন
৯১। ভাগবত ১১/৫/৪২
৯২। ভাগবত ১১/৩/৫৪, ১১/২৭/২৪, ১২/৫/১১
৯৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/১২৮
৯৪। Early History of the Vishnava Faith and Movcment by S. K De, p. 452
৯৫। ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭
৯৬। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৪/৬৭
৯৭। ভাগবত ১১/২৯/৩১
৯৮। ভাগবত ৭/১৩/৭
৯৯। গীতা ১২/১৬
১০০। ভাগবত ৩/২৯/১৪
১০১। ভাগবত ৭/৭/৫৩
১০২। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২০/২১

১০৩। ভাগবত ১০/১৬/৩৫
১০৪। ভাগবত ১১/১১/৩১
১০৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৩/২৬
১০৬। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২০/২৫
১০৭। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৬/২৩৭
১০৮। ভাগবত ১২/৬/৩৪
১০৯। চৈতন্যভাগবত ৩/৩/২৮, ভাগবত ১১/২৯/১৬
১১০। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৬/২৩৬
১১১। ভাগবত ৩/২৭/৭
১১২। ভাগবত ৩/২৮/৪
১১৩। ভাগবত ২/২/৩
১১৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১২৮
১১৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১২৫
১১৬। প্রীতিসন্দর্ভ ৮
১১৭। ভাগবত ১১/২/৪৫-৪৭
১১৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/৬৫
১১৯। ভক্তিসন্দর্ভ ৩১১, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৮৭, ৯০ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা
১২০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/২৬১
১২১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৭১
১২২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৮৯ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা; পূর্ব, সাধনভক্তি ৯৭ জীব গোস্বামীর টীকা
১২৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২২১, ২২২, ২২৯
১২৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৪/৮৫, ৮৭
১২৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১৫৯
১২৬। ভাগবত ৭/৫/২৩, ২৪
১২৭। ভাগবত ১১/১১/৩২
১২৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৮৯
১২৯। পদ্ম পুরাণ, পাতাল খণ্ড ৫১/৪৯
১৩০। পদ্ম পুরাণ, পাতাল খণ্ড ৫২/৭-১১
১৩১। ভক্তিসন্দর্ভ ৩১১
১৩২। রূপ গোস্বামী, স্তবমালা, গান্ধর্বাসম্প্রার্থনাষ্টক ৪
১৩৩। রূপ গোস্বামী, স্তবমালা, উৎকলিকাবল্লরী ৫২
১৩৪। রঘুনাথ দাস, স্তবাবলী, ব্রজবিলাসস্তব ৬৮
১৩৪ক। Indian Philosophy by Radhakrishnan, Vol. II. p. 689
১৩৫। রূপ গোস্বামী, উপদেশামৃত, অষ্টম শ্লোক
১৩৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/২০১-২০৫, ২২০, ২২৮, ২৩০

১৩৭। নীরদপ্রসাদ নাথের নরোত্তম দাস পৃঃ ৩১২
১৩৮। নীরদপ্রসাদ নাথের নরোত্তম দাস পৃঃ ৩৩৬
১৩৯। নীরদপ্রসাদ নাথের নরোত্তম দাস পৃঃ ৫৮০
১৪০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ৭
১৪১। রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন III, পৃঃ ২১৯৯
১৪২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৪/১৩৪
১৪৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ, সাত্ত্বিক ১০
১৪৪। বিবর্তবিলাস পৃঃ ১৫৭
১৪৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ৮, ৯
১৪৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ১১
১৪৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৪/৩২-৩৪
১৪৮। ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৫
১৪৯। ব্রহ্মসংহিতা ২৯ এবং জীব গোস্বামীর টীকা
১৫০। (১) উজ্জ্বলনীলমণি কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণের "তদ্‌ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ" ইত্যাদি ৩১ শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক আনন্দচন্দ্রিকা টীকা
(২)রাধাবিনোদ গোস্বামীর ভাগবতের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৭৫৬
(৩)রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূমিকা পৃঃ ১৪৮, ২০৬; I ৫০০; III ২২২৬-২৭; IV নিবেদন পৃঃ II/- ২৬৭৬; V ৩৪৯৬, ৩৫০২, ৩৫৮২
১৫১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১ এবং টীকা
১৫২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৫৪
১৫৩। ভাগবত ১০/৪৭/২৪
১৫৪। ভাগবত ৩/২৫/২২
১৫৫। ভাগবত ১০/৫১/৫৩, ৫/১৯/২০
১৫৬। ভাগবত ১১/১১/২৫, ৪৮
১৫৭। ভাগবত ৭/৫/৩২
১৫৮। ভাগবত ৫/৬/১৮
১৫৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভক্তিসামান্য ২০
১৬০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১/২/২
১৬১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৭
১৬২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ১
১৬৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ৪
১৬৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৪৮, কৃষ্ণসন্দর্ভ ১০৬
১৬৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, শান্তভক্তি ১০
১৬৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ৫-৬
১৬৭। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৮/১৮
১৬৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ৯

১৬৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ৩৭, ৩৮
১৭০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ৩, ৪
১৭১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ৮, ৯
১৭২। Early History of Vaishnava Faith and Movement by S. K De, p. 355
১৭৩। ভাগবত ৫/৬/১৮
১৭৪। ভক্তিসন্দর্ভ ১৪০, ১৪২, ১৭২, ১৭৯, ১৮৩
১৭৫। ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬
১৭৬। তত্ত্বসন্দর্ভ ৩৪, ৪৪
১৭৭। তত্ত্বসন্দর্ভ ৪৬
১৭৮। প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫
১৭৯। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৭, টীকা
১৮০। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ৪, টীকা
১৮১। ভাগবত ১১/২০/৮ টীকা
১৮২। পরমাত্মসন্দর্ভ ৯২
১৮৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৬৪
১৮৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫১
১৮৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৩/৯-১৩
১৮৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৪/৯৭
১৮৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৮/৬৮
১৮৮। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২২/১০৭
১৮৯। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/২৫৮, ২৫৯
১৯০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/১৭-১৯, ২১, ২২, ২৫
১৯১। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/৭৬
১৯২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১/৭৯, ৮০
১৯৩। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৬৮, ৯৯
১৯৪। অনুভাষ্য ৪/৪/১৫, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের অচিন্ত্যভেদাভেদে উদ্ধৃত পৃঃ ১৫৪-১৫৫
১৯৫। কঠ ১/২/২৩, মুণ্ডক ৩/২/৩
১৯৬। উদ্যোগপর্ব ৭৭/৪
১৯৭। ভাগবত ৭/৯/২৭
১৯৮। ভাগবত ৫/৬/১৮, চৈতন্যচরিতামৃত ১/৮/১৮
১৯৯। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৪/৬৭
২০০। চৈতন্যভাগবত ২/১৩/২১৭, ২/২২/৩২-৩৩
২০০ক। চৈতন্যভাগবত ২/১৩/৩০২
২০১। তত্ত্বসন্দর্ভ ৪৬
২০২। Indian Philosophy by Radhakrishnan Vol. II, p. 167

২০৩। Indian Philosophy by Radhakrishnan Vol. II, p. 419
২০৪। Indian Philosophy by Radhakrishnan Vol. II, p. 635
২০৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৩৭ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা
২০৬। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৫/১৪২
২০৭। কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ ৩/৮
২০৮। গীতা ৮/১৬
২০৯। প্রীতিসন্দর্ভ ১৯
২১০। প্রীতিসন্দর্ভ ১০
২১১। ভাগবত ২/১০/৬
২১২। প্রীতিসন্দর্ভ ৪৫
২১৩। ভাগবত ১১/২০/৩২, ৩৩
২১৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভক্তিসামান্য ২১ উদ্ধৃত হরিভক্তিসুখোদয় বচন
২১৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৭৬ উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বচন; দক্ষিণ, বিভাব ১০০; চৈতন্যচরিতামৃত ১/৫/৩২
২১৬। ভাগবত ৪/২০/২১
২১৭। ভাগবত ১০/৫১/৫৫
২১৮। ভাগবত ১০/৮৩/৪১, ৪২
২১৯। বিষ্ণু পুরাণ ১/১২/৪৮, ৫০
২২০। ভাগবত ৫/৬/১৮
২২১। ভাগবত ৬/১৭/২৮
২২২। ভাগবত ৩/২৯/১১
২২৩। ভাগবত ৯/৪/৬৭
২২৪। ভাগবত ১০/৮৭/২১
২২৫। গোপালতাপনী, পূর্ববিভাগ ২৪
২২৬। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, প্রথম শতক ১০৭
২২৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, প্রেমভক্তি ৬ উদ্ধৃত পঞ্চরাত্র বচন
২২৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি, ৫০ উদ্ধৃত আদি পুরাণ বচন
২২৯। ভগবৎসন্দর্ভ ১০০ অনুচ্ছেদের টিপ্পনীতে উদ্ধৃত স্কন্দ পুরাণ রেবাখণ্ডের বচন
২৩০। ভাগবত ৭/৮/৪২
২৩১। ভাগবত ১২/১০/৬
২৩২। ভাগবত ৩/২৫/২৯

২৩৩। ভগবৎসন্দর্ভ ৭২ অনুচ্ছেদ
২৩৪। পদ্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড ২২৭, অধ্যায় ৭৭-৭৮
২৩৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১৭-২০
২৩৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর, বীরভক্তি ২৪
২৩৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১৬
২৩৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১৪,১৫
২৩৯। পদ্ম পুরাণ, পাতালখণ্ড ৪৬/৬২
২৪০। গোপালতাপনী, উত্তরবিভাগ ২৯ বিশ্বনাথের টীকা
২৪১। ভাগবত ২/৯/১২, ১৩; ৩/২৫/৩৪, ৩৫
২৪২। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৯১/১৪, ২২
২৪৩। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২১/৪৭, ৪৮
২৪৪। ভাগবত ৩/২৫/৩৬ জীব গোস্বামীর টীকা; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১৫; ১/২/১৪ জীব গোস্বামীর টীকা
২৪৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৫০ উদ্ধৃত পদ্ম পুরাণ বচন
২৪৬। ভাগবত ১০/২/৩৫
২৪৭। প্রীতিসন্দর্ভ ৭
২৪৮। প্রীতিসন্দর্ভ ৯
২৪৯। ভক্তিসন্দর্ভ ১৩৪
২৫০। প্রীতিসন্দর্ভ ১৬
২৫১। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৩/১৭
২৫২। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২০৪
২৫৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/১/৯২
২৫৪। চৈতন্যচরিতামৃত ২/২৪/১৩৯
২৫৫। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/২৬৭
২৫৬। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৯/২৭১
২৫৭। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/২১৫
২৫৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভাবভক্তি ৩৫ টীকা
২৫৯। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২০/১১, ১৩
২৬০। চৈতন্যচরিতামৃত ২/১৯/১৪৮
২৬১। প্রীতিসন্দর্ভ ১৬
২৬২। চৈতন্যচরিতামৃত ২/৬/২৬০-২৬৯, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬
২৬৩। ভাগবত ৪/৩০/৩২, ৩৩
২৬৪। পদ্ম পুরাণ, উত্তরখণ্ড ১৩২/৩২
২৬৫। হরিবংশ ৩/৮০/৬৩
২৬৭। ভাগবত ৩/১৬/৪৯
২৬৮। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪/৯৭

২৬৯। ভাগবত ১১/১৪/১৪। ভাগবত ৬/১১/২৫ এবং ১০/১৬/৩৭ (ইহার বাক্যান্তর)
২৭০। ভাগবত ১১/২০/৩৪
২৭১। কুলশেখর, সদুক্তিকর্ণামৃত ১/৬৪/২ (৩১৭)
২৭২। কুলশেখর, সদুক্তিকর্ণামৃত ১/৬৪/৪ (৩১৯)
২৭৩। বিষ্ণু পুরাণ ১/২০/১৮
২৭৪। ভাগবত ৫/১৪/৪৩
২৭৫। পদ্যাবলী ৯৪; চৈতন্যচরিতামৃত ৩/২০/২৯
২৭৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, দক্ষিণ স্থায়িভাব ২২ উদ্ধৃত মুকুন্দমালা বচন
২৭৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ১৬ উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ হনুমদ্বাক্য
২৭৮। নৃসিংহতাপনীর ভাষ্য ২/৫/১৬—উদ্ধৃত ভক্তিসন্দর্ভে ১১২, ভগবৎসন্দর্ভে ৭৯, চৈতন্যচরিতামৃতে ২/২৪/১১২
২৭৯। বিদ্যাপতি, পদকল্পতরু ৩০১৭
২৮০। চৈতন্যভাগবত ৩/৮/৯৩, ৯৪
২৮১। নীরদপ্রসাদ নাথের নরোত্তম দাস, পৃঃ ৫৫১
২৮২। ভাগবত ৭/৯/৪৪
২৮৩। ভাগবত ৯/২১/১২
২৮৪। চৈতনচরিতামৃত ২/১৫/১৬২, ১৬৩
২৮৫। ভাগবত ২/১০/৩
২৮৬। প্রীতিসন্দর্ভ ১, ৩, ৫, ৭, ৮
২৮৭। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণব দর্শন পৃঃ ১৬
২৮৮। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা পৃঃ ৩৯১
২৮৯। রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন III পৃঃ ১৮৭৪
২৯০। রাধাগোবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন III পৃঃ ২০৮৪
২৯১। ভাগবত ৯/৪/৬৮
২৯২। ভাগবত ৯/৪/৬৩
২৯৩। ভাগবত ৯/৪/৬৪
২৯৪। ভাগবত ১১/১৪/১৬
২৯৫। ভাগবত ৯/৪/৬৬
২৯৬। নারদপঞ্চরাত্র ২/৩৬
২৯৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ ৭৯, বিষ্ণুধর্ম হ'তে উদ্ধৃত
২৯৮। রাধাগেবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন III পৃঃ ১৯২৬
২৯৯। রাধাগেবিন্দ নাথ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন III পৃঃ ২০৮৯; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/৪৬
৩০০। ভাগবত ১১/৮/৩৫, ৪০

৩০১। ভক্তিসন্দর্ভ ৩১১
৩০২। ভাগবত ১০/৩২/২০
৩০৩। ভাগবত ১০/৩২/২১
৩০৪। ভাগবত ১০/৩২/২২
৩০৫। ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯
৩০৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, সাধনভক্তি ৫০ উদ্ধৃত পদ্ম পুরাণ বচন
৩০৭। প্রীতিসন্দর্ভ ১২১
৩০৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম, ৩/২/৬২; চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২০১
৩০৯। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৮/১৮
৩১০। ভক্তিসন্দর্ভ, ১৮০
৩১১। ভক্তিসন্দর্ভ ১৮৩
৩১২। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/১৮/১৮
৩১৩। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৪/২৬
৩১৪। রাধাগোবিন্দ নাথের চৈতন্যচরিতামৃত, ভূমিকা পৃঃ ৯৫
৩১৫। ভাগবত ১১/২৯/২২
৩১৬। ভাগবতের ১০/২৩/৪৩ শ্লোকের বল্লভাচার্য কৃত সুবোধিনী টীকায় উদ্ধৃত পদ্ম পুরাণ বচন
৩১৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব, ভক্তিসামান্য ২০ উদ্ধৃত
৩১৮। পদ্যাবলী ১৪; চৈতন্যচরিতামৃতে ২/৮/৫৯ উদ্ধৃত
৩১৯। ভক্তিসন্দর্ভে ৯৫ উদ্ধৃত বৃহৎ নারদীয় পুরাণ বচন
৩২০। চৈতন্যচরিতামৃত ১/৮/১৬
৩২১। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, পৃঃ ১৭০
৩২২। ভাগবত ১০/২৯/১১
৩২৩। ভাগবত ৬/২/১৪
৩২৪। চৈতন্যচরিতামৃত ৩/৫/১৫৫
৩২৫। ভাগবত ৬/১/২৮-৩০